সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—সং ৭৪

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

গিজো-লিখিত

(সাহিত্য-সভা-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত)

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

অনূদিত

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৩৩

মূল্য—সদস্যপক্ষে ১৲; শাখাপরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।; সাধারণের পক্ষে—১।৹।

প্রিণ্টার—শ্রীচুণীলাল দাস।

এরিয়ান প্রেস

১২।১ বলাই সিংহ লেন, কলিকাতা।

মুখবন্ধ

গত ১৩১৮ বঙ্গাব্দে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় ইউরোপীয় সাহিত্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহ আহরণ-পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনকল্পে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করেন, যাহার সাহায্যে ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ রচিত ও মুদ্রিত হইতে পারে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে দুইখানি গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণের ভার দেন ও তদুপযুক্ত অর্থ প্রদান করেন। তাঁহার নির্ব্বাচিত প্রথম গ্রন্থ গিজো-প্রণীত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস। শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় প্রথমে এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার ভার গ্রহণ করেন। তিনি কার্য্য আরম্ভও করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা বিঘ্নের দরুন তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া কার্য্যভার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আমার বিশ্বাস, তাহার ন্যায় ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতের রচনানিপুণ লেখনী হইতে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া বাহির হইত। তিনি কার্য্যভার ত্যাগ করিলে পরমশ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় আমাকে এই ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এ কার্য্যের জন্য নিজের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি নাই। গ্রন্থ রচনাকালে পদে পদে এই অনধিকার চর্চ্চার জন্য অনুতাপ বোধ করিয়াছি। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট ভাষায় অনুবাদ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য

হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তথাপি আশা করি, মূল গ্রন্থের বিষয়-গৌরব, পাণ্ডিত্য ও রচনা-কৌশলের গুণে অনুবাদখানি নানা দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও বাঙ্গালী পাঠকের নিকট অনাদর লাভ করিবে না।

অনুবাদের প্রত্যেক অধ্যায় ধারাবাহিক ভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত ও 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়ে যাঁহারা উপদেশ ও উৎসাহদানে আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার কৃতজ্ঞতার ভাজন।

এতদিনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ আকারে মুদ্রিত হইতে চলিল, কিন্তু যাঁহার আদেশ ও উৎসাহে এই গ্রন্থের সূচনা, সেই পরমস্নেহশীল আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের হস্তে ইহা তুলিয়া দিতে পারিলাম না, ইহাই একান্ত আক্ষেপের বিষয়।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

ভূমিকা

যে সকল মনস্বী ইউরোপীয় ইতিহাসের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তস্তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ফরাসী ঐতিহাসিক গিজোর নাম সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীভুক্ত। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে পারী নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার আকারে গ্রন্থখানি রচিত হয়। তাহার পর কত ঐতিহাসিক গবেষণা হইয়াছে, কত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, কত নূতন নূতন ঘটনা পুরাতন ঘটনার উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে, কত নূতন দিক্ দিয়া মানবজীবন ও মানবসভ্যতার সর্ব্বাঙ্গীন বিচার হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, এই প্রাচীন মনস্বীর অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তাশীলতা, সত্যানুরাগ ও তত্ত্বগ্রাহিতার গুণে তাঁহার গ্রন্থে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় সভ্যতার যে সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়, এখন পর্য্যন্ত কোন একখানি গ্রন্থে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি ইতিহাস রচনার একটি বিশেষ ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে একদল ঐতিহাসিক কবিসুলভ কল্পনা ও কলাকৌশলের সহিত ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ব্যক্তিচরিত্রের নানা বৈচিত্র্য ও চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীর সমাবেশ করিয়া অতীতকে জীবন্ত বর্ণে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গিজো ইহার বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি অতীতকে দেখিয়াছেন বৈজ্ঞানিকের চক্ষু লইয়া, কবি বা ঔপন্যাসিকের চক্ষু লইয়া নহে। তিনি ইতিহাসের বিচিত্র মালমসলা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন তাহার গঠনতত্ত্ব, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থান ও

পরস্পর সম্বন্ধ, তাহার জীবন-লীলার ধারা ও প্রণালী। তিনি আবিষ্কার করিতে চাহেন বৈচিত্র্যের মধ্যে নিয়মের তত্ত্ব, চাঞ্চল্যের মধ্যে পরিণতির আভাস, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন তথ্যের মধ্যে কার্য্যকারণের যোগসূত্র। ফলে তাঁহার রচিত ইতিহাস উপন্যাসের ন্যায় মনোহারী হইয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের ন্যায় বুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়াছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সত্য আবিষ্কারের পক্ষে বিচার বিশ্লেষণই একমাত্র প্রকৃষ্ট প্রণালী নহে। বিজ্ঞানের সাধারণ দৃষ্টিতে জীবন্ত সত্যের বিচিত্র প্রাণলীলা তেমন করিয়া ধরা পড়ে না। কবির অন্তর্দৃষ্টি সেখানে অনেক বেশী কার্য্যকরী। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের সুবিধা এই যে, তাহা সহজে কাজে লাগান যায়। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে চাহেন, মানবের অতীত অভিজ্ঞতা হইতে উপদেশ লাভ করিয়া, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাঁহারা ইতিহাসকে বিজ্ঞানের চক্ষেই দেখিবেন।

গিজো যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় ইউরোপের ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ। যে ফরাসী বিপ্লব উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজকে একেবারে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে, সেই মহাবিপ্লবের ক্রোড়ে তাঁহার জন্ম, যৌবনকাল পর্য্যন্ত সেই বিপ্লবের আবহাওয়ার মধ্যেই তাঁহার বৃদ্ধি ও পরিণতি। ওয়াটারলু-যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাভব হইল এবং বুর্বোঁ-রাজবংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু বিপ্লবের আন্দোলন নিরস্ত হইল না। ১৮৩০, ১৮৪৮ ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীবিপ্লব নূতন নূতন আকার গ্রহণ করিয়া ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইহা ফরাসী-জীবন চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। এই দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনের মধ্যে গিজো কখনও রাজমন্ত্রী, কখনও অধ্যাপক, কখনও সাহিত্যিকরূপে

জাতীয় জীবনে নেতৃত্ব করিয়াছেন। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ মহাসাগরে কর্ণধারের ন্যায় তিনি অবিচলিত নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের সহিত জাতীয় জীবনের ধারা নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চ্চার মধ্যে কোন সৌখীনতা ছিল না। বর্ত্তমান প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি অতীতের চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে দেখিতে পাই, একাধারে বৈজ্ঞানিকের স্বচ্ছদৃষ্টি ও প্রচারকের উদ্দীপনা।

গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে—ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস। যাহারা কিন্তু গ্রন্থমধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বতোমুখী বিকাশের সমগ্র সম্পূর্ণ চিত্র প্রত্যাশা করিবেন, তাঁহারা ভুল করিবেন। গিজো প্রথম অধ্যায়েই বলিয়াছেন, সভ্যতার দুই অঙ্গ—(১) মানুষের অন্তরাত্মার বিকাশ—যাহার ফলে ধর্ম্ম, শিল্পসাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞানাদির উদ্ভব ; (২) মানুষের সামাজিক জীবনের পুষ্টি ও পরিণতি—যাহার পরিচয় পাওয়া যায় রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির মধ্যে। তিনি কিন্তু এই শেষোক্ত অঙ্গেরই ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, ইউরোপীয় সভ্যতার ব্যাপক পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন নাই। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের দিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়াছেন—ধর্ম্মসমাজ, অভিজাতসমাজ ও পৌরসমাজ সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এই সকল সমাজের রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাবের দিক্ দিয়াই করিয়াছেন। মধ্যযুগের গিল্ড্ (Guild), মঠ ও পল্লীসমাজ, রিনাসেন্সযুগের বিদ্যাপরিষদ্ (Academy), রাজসভা ও অভিজাতসমাজ প্রভৃতি সামাজিক জীবনের নানা বিচিত্র বিকাশ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহার চক্ষে রাষ্ট্রের ইতিহাস, রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিহাসই বিশেষ করিয়া

সমাজের ইতিহাস। কারণ, তিনি যে আন্দোলনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান সমস্যা ছিল রাষ্ট্রীয় সমস্যা। রিনাসেন্সযুগের পর হইতে রাষ্ট্র বা ষ্টেট্ই সমাজের একমাত্র কেন্দ্রশক্তি হইয়া উঠে। প্রাচীন খণ্ডসমাজ ও প্রাদেশিক সমাজের সমস্ত ক্ষমতা ধীরে ধীরে ষ্টেটের হস্তে আসিয়া পড়ে। ষ্টেটের সাহায্যেই সমাজের সমস্ত কল্যাণ সাধন করিতে হইবে, এই ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের মূলে এই ধারণারই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ষ্টেটের মধ্যে রাজার ও অভিজাতবর্গের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া, সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের প্রভাব বৃদ্ধি করিতে হইবে—ইহাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের লক্ষ্য। কিন্তু ষ্টেট্ই যে সমাজের একমাত্র কর্তৃশক্তি, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং গিজো যে ষ্টেটের ইতিহাসকেই সমাজের ইতিহাস বলিয়াছেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয় সমাজে ষ্টেটের আধিপত্য সমানভাবেই চলিয়াছে সত্য, কিন্তু ষ্টেটের সমস্যাই এখন প্রধান সমস্যা নহে। ফরাসী বিপ্লব প্রজাকে রাজমহিমায় মণ্ডিত ও রাজশক্তির অংশী করিয়া দিল বটে, কিন্তু এ শক্তি অধিকাংশ প্রজার পক্ষে কার্য্যকরী হইতে পারিল না। যাহাদের প্রাণপাত পরিশ্রমে আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের পুষ্টি, সেই শ্রমিকবর্গ দেখিল, রাজনৈতিক ভোট পাইয়াও তাহার অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সকলেরই উপলব্ধি হইল যে, রাজনৈতিক সমস্যাই সমাজের একমাত্র সমস্যা নহে—তাহা অপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইল অর্থনৈতিক সমস্যা। এই উপলব্ধির ফলে আধুনিক ইউরোপের সমস্ত সামাজিক চিন্তার স্রোত অর্থনীতির খাতে প্রবাহিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস চর্চ্চায়ও এক

নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। অর্থনৈতিক ইতিহাস রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত সমান পদবী দাবী করিতে লাগিল। গিজোর গ্রন্থে কিন্তু সামাজিক জীবনের অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনের সম্যক্ আলোচনা পাওয়া যাইবে না। সে আলোচনার জন্য আমাদিগকে পাঠ করিতে হইবে, মার্ক্স্ প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থকারের রচনা।

আর এক দিক দিয়া আধুনিক চিন্তায় ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উঠিয়াছে। দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী (Philosophic Anarchist), গিল্ড্ সোশিয়ালিষ্ট (Guild Socialist), চর্চ্চস্বাতন্ত্র্যবাদী, শ্রমিক-সঙ্ঘবাদী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সংস্কারক, ষ্টেটের শক্তি খর্ব্ব করিয়া সমাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা শক্তি-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কামনা করিতেছেন। গিজো দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া সমাজের নানা খণ্ড শক্তি সংহত হইয়া এক একটি বিরাট্ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং এই পরিণতিকেই তিনি চরম পরিণতি মনে করিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, ইতিমধ্যেই সমাজের চিন্তাস্রোত বিপরীত গতি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আধুনিক চিন্তা ও আধুনিক ইতিহাসের সম্পর্কে আলোচনা করিলে গিজোর গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ে এইরূপ অসম্পূর্ণতা দেখা যাইবে, তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। কিন্তু তিনি যে বিশেষ ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁহার অদ্ভুত বিশ্লেষণক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টি বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এত অল্প পরিসরের মধ্যে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় সভ্যতার ইতিহাসের এমন গভীর ও ব্যাপক আলোচনা আর কোন গ্রন্থে দুর্লভ। এ সভ্যতা আজ দিগ্বিজয়ীর বেশে আমাদের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে।

ইহাকে মূঢ়ের মত ঠেলিয়া রাখিলেও কল্যাণ নাই, অন্ধভক্তির সহিত মোহাচ্ছন্নভাবে উপাসনা করিলেও লাভ নাই। ইহাকে বুঝিয়া লইতে হইবে—ইহার যথার্থ প্রকৃতির সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে। এবং এ পরিচয় লাভের পক্ষে গিজোরচিত বর্ত্তমান গ্রন্থ একটি প্রধান সহায়।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

নিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে শিক্ষণীয় বিষয়ের উপযোগিরূপে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষায় সঙ্কলন ও অনুবাদ করিয়া—ইতিহাস, দর্শন, সমালোচনা ও বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ "সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলী" নামে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহাশয় গত ১৩১৮ সালের ২১শে কার্ত্তিক তারিখে পরিষৎকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল। এই শ্রেণীর সাহিত্য প্রচারের জন্য শ্রীযুক্ত বিনয়বাবু তাঁহার পত্রোক্ত ৫০০০৲ টাকার মধ্যে ১০০০৲ টাকা পরিষৎকে দান করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বিনয়বাবুর পত্রোক্ত "লেখক নির্ব্বাচন ও কার্য্যভার-সমিতি" (শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত) কর্ত্তৃক রিপণ কলেজের অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ মহাশয়, ফরাসী পণ্ডিত এম্ গিজো (M. Guizot) মহাশয়ের লিখিত 'ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থের অনুবাদক নির্ব্বাচিত হন। তিনি কিছু অনুবাদ করিয়া শারীরিক অপটুতাবশতঃ সেই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপরে রিপণ কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়ের উপর এই কার্য্যভার অর্পিত হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং পরিষদের এক একটি বিশেষ অধিবেশনে এক এক অধ্যায় পঠিত হয়। তৎপরে 'নব্যভারত' মাসিক পত্রে উহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে গ্রন্থমুদ্রণের আয়োজন করা হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে গ্রন্থ পরীক্ষা করাইবার সময় উপস্থিত

হইলে শ্রীযুক্ত বিনয়বাবুর নির্ব্বাচিত পরীক্ষকত্রয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় অনবকাশবশতঃ এই কার্য্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তথন পরলোকে। কাজেই তথন শ্রীযুক্ত বিনয়বাবুর সম্মতিক্রমে এই দুইজন পরীক্ষকের স্থলে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয় পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহাঁরা উভয়ে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অনুবাদ পরীক্ষা করিয়া, পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশের উপযোগী বলিয়া মতপ্রকাশ করিলে গ্রন্থখানি পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল।

এই প্রসঙ্গে পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিনয় বাবুর নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কেন না, তাঁহারই সাহায্যে ও উদ্যমে পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী "ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশে"র সূচনা হয়। এতদ্ব্যতীত পরীক্ষকগণ কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, পরীক্ষকগণ তাঁহাদের সমুদয় পারিশ্রমিক ২৫০৲ এবং গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক ৭৫০৲ টাকার মধ্যে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা পরিষদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা লক্ষ্য করিয়া পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের পত্র

২৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
২১শে কার্ত্তিক, ১৩১৮।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,—

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ইতিহাস, দর্শন, সমালোচনা ও বিজ্ঞান, এই চারি শ্রেণীর সাহিত্যসম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহারের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপযোগী করিয়া তুলা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয়, প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীই অনুমোদন করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি সঙ্কলন ও অনুবাদ করা আবশ্যক এবং বর্ত্তমান অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক উপযুক্ত বৃত্তি দ্বারা যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই ধারণায় বিগত মাঘ মাসে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে "সাহিত্য-সেবী" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে, বহু সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-পরিপোষক এ বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। এতদ্দ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া, গত বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত করি এবং বহুল প্রচারোদ্দেশে উহা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। ঐ প্রস্তাব

পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।* উক্ত সম্মিলনে কাসিমবাজারের বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্ত্তৃক উহা সমর্থিত হইয়া উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমি অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত আছি। সম্প্রতি প্রধানতঃ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের সাহায্যে ও অনুকম্পায় সংগৃহীত ৫০০০৲ পাঁচ সহস্র টাকা আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। নিম্নলিখিত সর্ত্তে আপনারা এই অর্থ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব ;—

১। এই অর্থদ্বারা "সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলী" নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

২। এই বৃত্তি দ্বারা দুইটি কার্য্য সাধিত হইবে ;—

(ক) পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন। যথা ;—Schwegler, Weber প্রভৃতি পণ্ডিতগণের লিখিত গ্রন্থাবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

(খ) ফরাসী পণ্ডিত Guizot-প্রণীত "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থের (বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়া) সরল বঙ্গানুবাদ।

৩। কার্য্যপ্রণালী ;—

(ক) পুস্তকের কিয়দংশ লিখিত হইলে, লেখককে উহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতাকারে পাঠ করিতে হইবে। তাহার পরে প্রবন্ধগুলি

* ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত প্রস্তাব,—"বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য সমুন্নত ভাষার ন্যায় তাহাকে উন্নত করিবার জন্য দেশের কৃতবিদ্য শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা উপযুক্ত উপায়ে বিবিধ শাস্ত্রের গ্রন্থরচনা, সঙ্কলন ও অনুবাদ করাইবার ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।"

বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র গ্রন্থ অথবা গ্রন্থের যে অংশটুকু স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহা ঐরূপে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলে, পরীক্ষকের নিকট ঐ রচনা প্রেরিত হইবে। পরীক্ষকের মন্তব্য অনুসারে লেখককে উক্ত রচনার যথোচিত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(খ) এই দুই পুস্তকেরই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম এ, পি এইচ ডি মহাশয় এবং ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়গণ পরীক্ষক থাকিবেন।

(গ) প্রথম পুস্তক অন্ততঃ এক হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া দুই বা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

৪। ব্যয়ের হিসাব ;—

প্রথম গ্রন্থ।—	মুদ্রণ—	১৫০০৲
	লেখকের পারিশ্রমিক—	১২০০৲
	পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক—	৩০০৲
দ্বিতীয় গ্রন্থ।—	মুদ্রণ—	১০০০৲
	লেখকের পারিশ্রমিক—	৭৫০৲
	পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক—	২৫০৲
		৫০০০৲

৫। গ্রন্থের স্বত্ব ;—

(ক) প্রত্যেক গ্রন্থ হাজার কাপি করিয়া মুদ্রিত হইবে এবং পরিষৎ কর্ত্তৃক উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।

(খ) পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রত্যেক গ্রন্থের দুই শত কাপি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইবে। আর লেখকের ইচ্ছানুসারে ২৫ কাপি পুস্তক বিতরিত হইতে পারিবে।

(গ) অবশিষ্ট কাপিগুলি পরিষদের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে।

(ঘ) অন্যান্য সংস্করণ সম্বন্ধে পরিষদের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার থাকিবে।

৬। গ্রন্থের যে পরিমাণ অংশ এক খণ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহা পরীক্ষকগণের মনোনীত হইবার পূর্ব্বে কোন লেখক ন্যায্য পারিশ্রমিকের কোন অংশ পাইবেন না।

৭। লেখক-নির্ব্বাচন ;—

(ক) সাধারণতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং দেশীয় বা বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ এই রচনা-ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(খ) শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ মহাশয়-গণকে লইয়া নির্ব্বাচনাদি ও কার্য্যভার-সমিতি গঠিত হইবে। উক্ত সমিতি যাঁহাকে গ্রন্থরচনা বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া গ্রন্থ-রচনা-ভার অর্পণ করিবেন।

(গ) রচনা-কার্য্যের ভার পাইবার জন্য কেহ আবেদন করিলে, তাহা গৃহীত হইবে না।

৮। প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকায় এই সংরক্ষণ-নীতি-প্রতিষ্ঠাবিষয়ক পত্র সংযুক্ত থাকিবে। পরিষদের পত্রিকা, পঞ্জিকা প্রভৃতিতে এই পত্র ও পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইবে।

৯। সম্প্রতি বরেণ্য কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ ও আন্তরিক সহানুভূতি আছে। যদি তাঁহারা রবীন্দ্র বাবুর সম্বর্দ্ধনা উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সমুদায় অর্থ এই সাহিত্য-সংরক্ষণ-ভাণ্ডারে (পূর্ব্বকথিত সংরক্ষণ-প্রস্তাব অনুসারে) প্রদান করেন, তবে এই ভাণ্ডারের ৫০০০৲ পাঁচ সহস্র টাকা উক্ত সংগৃহীত অর্থের সহিত একযোগে "রবীন্দ্রবৃত্তি"

প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত হইবে এবং এই যুক্ত ভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থনিচয় "সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলী—রবীন্দ্র-বৃত্তি-প্রাপ্ত" এই নামে অভিহিত হইবে।

বিনয়াবনত

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সূচীপত্র

প্রভাব—বর্ব্বর বিজেতৃবর্গ—তাহাদের প্রভাবে আধুনিক জগতে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত মানব সম্বন্ধের বিকাশ—পঞ্চম শতাব্দীতে সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের সারোল্লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—সভ্যতার অঙ্গীভূত প্রত্যেক বিভিন্ন পদ্ধতিই ন্যায্য-শাসনাধিকার দাবী করিতেছে—রাষ্ট্রনৈতিকক্ষেত্রে ন্যায্য শাসনাধিকার কাহাকে বলে?—পঞ্চম শতাব্দীতে সমস্ত বিচিত্র শাসনপদ্ধতির এক-কালীন অবস্থিতি—ব্যক্তি, সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থায় স্থিরতা ও নৈশ্চিত্যের অভাব—ইহার দুই কারণ:—(১) বাহ্যকারণ, বর্ব্বর আক্রমণের দীর্ঘকালব্যাপ্তি; (২) নৈতিক কারণ, বর্ব্বরপ্রকৃতি-সুলভ আত্মসর্ব্বস্ব ব্যক্তিত্বের ভাব—সভ্যতার চারিটি মূল বীজ:—(১) শান্তিশৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা, (২) রোমকসাম্রাজ্যের স্মৃতি, (৩) খৃষ্টীয় চর্চ্চ, (৪) বর্ব্বরসমাজের প্রভাব—বর্ব্বরগণকর্ত্তৃক, পৌরসমাজ-কর্ত্তৃক, স্পেনের যাজক-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক এবং শার্লমাঞি ও আল্‌ফ্রেড্‌-কর্ত্তৃক শৃঙ্খলাস্থাপনের চেষ্টা—জার্ম্মান ও আরব আক্রমণের অবসান—ফিউডাল বা ভূস্বামিতন্ত্র-পদ্ধতির আবির্ভাব।

চতুর্থ অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—তথ্য ও তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক—পৌর সমাজ অপেক্ষা গ্রাম্য সমাজের প্রভাবাধিক্য—একটি ক্ষুদ্র ভূস্বামিতন্ত্র বা ফিউডাল সমাজের গঠনপদ্ধতি—ভূস্বামীর অন্তঃপ্রকৃতি ও পারিবারিক জীবনের উপর ফিউডাল-পদ্ধতির প্রভাব—ফিউডাল-পদ্ধতির প্রতি প্রজা-সাধারণের বিদ্বেষ—দাস-বর্গের কল্যাণ সাধন বিষয়ে যাজকগণের অক্ষমতা—ফিউডাল-সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করা অসাধ্য ছিল কেন?—

(১) পরাক্রান্ত কর্ত্তৃশক্তির অভাব; (২) দেশব্যাপী সাধারণ শাসনশক্তির অভাব; (৩) নানা স্বতন্ত্র খণ্ড সমাজ লইয়া ফেডারেশনপদ্ধতি অনুসারে শাসনমণ্ডলী গঠন করা দুঃসাধ্য—প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের অধিকার ফিউডাল-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব—ফিউডাল পদ্ধতির প্রভাব ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল, কিন্তু সমাজশৃঙ্খলার বিরোধী।

পঞ্চম অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—ধর্ম্মতত্ত্ব সমাজ বন্ধনের অনুকূল—দমন ও দণ্ড চালন শাসনতন্ত্রের সার তত্ত্ব নহে—কি কি লক্ষণ থাকিলে শাসনতন্ত্র ন্যায্য শাসনাধিকারী হয়? (১) যোগ্যতম পাত্রের হস্তে শাসন-ক্ষমতার ন্যাস; (২) শাসিতবর্গের স্বাধীন অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন—চর্চ্চ একটি বৃত্তি-মূলক সমাজ, বংশগত জাতি নহে, সুতরাং চর্চ্চের মধ্যে প্রথম লক্ষণ বর্ত্তমান আছে—চর্চ্চের মধ্যে নির্ব্বাচন ও মনোনয়নের নানা বিভিন্ন প্রণালী—চর্চ্চ নিজের কর্ত্তৃত্বশক্তি অনেক সময় অন্যায়পূর্ব্বক বিস্তার করিয়া লইয়াছিল ও অনেক সময় অন্যায়পূর্ব্বক বাহুবল প্রয়োগ করিয়াছিল, সুতরাং চর্চ্চের মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষণের অভাব—চর্চ্চের মধ্যে মানবচিত্তের আলোড়ন ও স্বাধীনতা—চর্চ্চের সহিত রাজন্যবর্গের বিচিত্র সম্বন্ধ—চর্চ্চের পারত্রিক কর্ত্তৃত্বশক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা—চর্চ্চকর্ত্তৃক ঐহিক শাসনশক্তি অধিকারের চেষ্টা।

ষষ্ঠ অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—চর্চ্চের মধ্যে শাসক ও শাসিতবর্গের পার্থক্যসাধন—যাজকসমাজের উপর সাধারণ জনসমাজের গৌণপ্রভাব—সমাজের সকল স্তর হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া যাজকসম্প্রদায়ের গঠন—সাধারণ সমাজশৃঙ্খলা ও বিধিপ্রণয়নের উপর চর্চ্চের প্রভাব—প্রায়শ্চিত্তপ্রথা—

চর্চ্চের মধ্যে মানবচিত্তের বিকাশ সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মতত্ত্বমূলক—চর্চ্চ সাধারণতঃ প্রবল শাসনশক্তির পক্ষ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে—ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই; কারণ, সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য মানুষের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করা—পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চর্চ্চের বিভিন্ন অবস্থা-পরম্পরা—(১) সাম্রাজ্য-যুগের চর্চ্চ—(২) বর্ব্বরযুগের চর্চ্চ; ঐহিক ও পারত্রিক শাসনের পার্থক্য-নীতির বিকাশ; মঠধারী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের উদ্ভব—(২) ফিউডালযুগের চর্চ্চ; শৃঙ্খলাবন্ধনের চেষ্টা; সংস্কার চেষ্টার অভাব; সপ্তম গ্রেগরী—যাজকতন্ত্র চর্চ্চ—স্বাধীন গবেষণাপ্রবৃত্তির পুনরুজ্জীবন; আবেলার্ড—পৌর সমাজের পুনরুজ্জীবন—উভয় ঘটনার পরস্পর নিরপেক্ষতা।

সপ্তম অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—দ্বাদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পৌরসমাজের তুলনামূলক চিত্র—দুইটি প্রশ্ন—(১) পৌরসমাজসমূহের স্বাধীন অধিকার লাভ—পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পুরীসমূহের অবস্থা—তাহাদের ক্ষয় ও পুনরুজ্জীবন—সামাজিক বিদ্রোহ—চার্টার বা অধিকারপত্র—পুরীসমূহের স্বাধীনতালাভের সামাজিক ও নৈতিক পরিণাম—(২) পুরী-সমূহের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা—জনসাধারণের সভাসমিতি—শাসন-কর্ত্তৃগণ—উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর নাগরিক—ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পুরী-সমূহের অবস্থাবৈচিত্র্য।

অষ্টম অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—ইউরোপীয় সভ্যতার সাধারণ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ইহার বিশিষ্ট ও মৌলিক প্রকৃতি—কোন্ যুগে এই প্রকৃতি প্রকট হইতে লাগিল—দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের

অবস্থা—ক্রুসেড্ বা ধর্ম্মযুদ্ধসমূহের প্রকৃতি—তাহাদের নৈতিক ও সামাজিক কারণসমূহ—ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই সকল কারণের অন্তর্দ্ধান—সভ্যতার উপর ক্রুসেড্‌সমূহের প্রভাব।

নবম অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—ইউরোপের ও জগতের ইতিহাসে রাজশক্তির অসামান্য প্রভাব—এই প্রভাবের যথার্থ কারণ—দুই দিক্ হইতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের বিচার হওয়া আবশ্যক—(১) ইহার যথার্থ সনাতন প্রকৃতি—ইহা ন্যায়শাসনের বিগ্রহস্বরূপ—কিন্তু সর্ব্বতোভাবে নহে—(২) ইহার নমনীয়তা ও বৈচিত্র্য—ইউরোপের রাজতন্ত্র, নানা বিভিন্ন-প্রকৃতির রাজ-তন্ত্র হইতে উদ্ভূত—(১) বর্ব্বর রাজতন্ত্র—(২) রোমকসাম্রাজ্যের রাজতন্ত্র—(৩) ফিউডাল রাজতন্ত্র—(৪) আধুনিক অর্থাৎ যথার্থ রাজতন্ত্র,—ইহার যথার্থ প্রকৃতি।

দশম অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—আধুনিক ইউরোপের নানা বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের মিলন সাধন করিয়া, তাহাদিগকে এক কেন্দ্রশক্তির অধীনে এক সমাজে একযোগে অবস্থান ও কার্য্য করাইবার জন্য বিচিত্র চেষ্টা—(১) যাজকতন্ত্রের অধীনে শৃঙ্খলাস্থাপনের চেষ্টা—এ চেষ্টা কেন ব্যর্থ হইল—চারিটি প্রধান বাধা—সপ্তম গ্রেগরীর দোষাবলী—চর্চ্চের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে—রাজার পক্ষ হইতে—(২) গণতন্ত্রমূলক সমাজগঠনের চেষ্টা—ইটালীয় গণতন্ত্রসমূহ—তাহাদের দোষাবলী—দক্ষিণ ফ্রান্সের পৌররাষ্ট্রসমূহ—আলবিজেন্স্‌দিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধাভিযান—সুইস্ গণতন্ত্রমণ্ডলী—ফ্লাণ্ডার্স ও রাইন্-তীরের পুরী-সমূহ—হান্‌সেয়াটিক পুরী-মণ্ডলী—ফিউডাল অভিজাতবর্গ ও পুরী-

সমূহের সংঘর্ষ—(৩) মিশ্র শাসনতন্ত্রের অধীনে শৃঙ্খলাবন্ধনের চেষ্টা—ফ্রান্সের ষ্টেট্‌স্ জেনারাল—স্পেন ও পর্ত্তুগালের কর্টেস্—ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট—জার্ম্মানীর বিশেষ অবস্থা—তাহাদের সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হইল—ব্যর্থতার কারণ—ইউরোপের সাধারণ প্রবণতা কোন্ দিকে ?

একাদশ অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—পঞ্চদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট প্রকৃতি—জাতিসমূহের ও শাসনতন্ত্রসমূহের কেন্দ্রীকরণের দিকে গতি—(১) ফ্রান্স্—ফরাসী জাতীয় ভাবের উদ্ভব—একাদশ লুইর শাসন—(২) স্পেন—(৩) জার্ম্মানী—(৪) ইংলণ্ড—(৫) ইটালী—রাষ্ট্রসমূহের বাহ্য সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির উদ্ভব—ধর্ম্মজগতে আন্দোলন—অভিজাতবর্গ-প্রবর্ত্তিত সংস্কারচেষ্টা—কনষ্টান্স ও বাসেলের ধর্ম্মসঙ্গীতি—জনসাধারণপ্রবর্ত্তিত সংস্কারচেষ্টা—জন হুস্—সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন—প্রাচীন যুগের প্রতি সমাদর—ক্লাসিকাল্ সম্প্রদায় বা স্বাধীন চিন্তার দল—সাধারণ কর্ম্মোদ্যম—সমুদ্রযাত্রা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন—উপসংহার।

দ্বাদশ অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—আধুনিক ইতিহাসে সাধারণ তথ্য আবিষ্কার করা দুরূহ—ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপের প্রতিকৃতি—ত্বরিত সিদ্ধান্তের বিপদ্—রিফর্মেশন বা ধর্ম্মসংস্কারের বিচিত্র কারণ নির্দ্দেশ—চিন্তা-জগতে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে মানবচিত্তের বিদ্রোহ, ইহাই রিফর্মেশনের প্রধান লক্ষণ—ইহার প্রমাণ—বিভিন্ন দেশে রিফর্মেশনের ভাগ্যপরিণতি—রিফর্মেশনের দৌর্ব্বল্য কোথায় ?—জেসুইটসম্প্রদায়—ধর্ম্মবিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লবের সাদৃশ্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—ইংরাজী বিপ্লবের সাধারণ প্রকৃতি—ইহার প্রধান প্রধান কারণ—ইহার মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লবের অপেক্ষা রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবেরই প্রাধান্য—ইহার মধ্যে তিনটি দলের প্রাধান্য :—(১) আইন সংস্কারের দল ; (২) রাষ্ট্রবিপ্লবের দল ; (৩) সামাজিক বিপ্লবের দল—তিন দলেরই ব্যর্থতা—ক্রমওয়েল—ষ্টুয়ার্টরাজগণের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—বিধিসংস্কারক মন্ত্রিসভা—উচ্ছৃঙ্খল মন্ত্রিসভা—ইংলণ্ড ও ইউরোপে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—

আলোচ্য বিষয়—ইংলণ্ডে ও ইউরোপের মহাদেশখণ্ডে সভ্যতার ধারার তুলনা—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য—সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রের গুণে—অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেশের ও জাতির গুণে—চতুর্দ্দশ লুইর শাসন—তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহ—তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি—তাঁহার আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী—তাঁহার বিধি-বিধান—তাঁহার দ্রুত অবনতির কারণ—অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স—দার্শনিক বিপ্লবের মূলগত লক্ষণ—উপসংহার।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

আমাদের আলোচ্য বিষয়, ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস। সভ্যতা-বিকাশের দিক্ দিয়া ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসের একটা মোটামুটি আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য। এই সভ্যতার মূল কোথায়, কোন্ পথে ইহার উন্নতি হইল, ইহার লক্ষ্য কোন্ দিকে, ইহার প্রকৃতি কি, এই সকল প্রশ্ন সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

"ইউরোপীয় সভ্যতা" বলিয়া যে কথাটি ব্যবহার করিলাম, তাহা নিরর্থক নহে। বাস্তবিকপক্ষে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভ্যতার মধ্যে এমন একটা ঐক্য আছে, যাহা লক্ষ্য করিলে "ইউরোপীয় সভ্যতা" বলিয়া একটা স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানাপ্রকার স্থান, কাল, অবস্থাভেদ সত্ত্বেও এই সভ্যতা সর্ব্বত্র একই প্রকার ঘটনা-সমাবেশে উদ্ভূত হইয়াছে, একই মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বত্র একই প্রকার ফল প্রসব করিয়াছে। ইউরোপের এই সার্ব্বদেশিক সভ্যতার দিকেই আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই।

আবার ইহাও সুস্পষ্ট যে, এই সভ্যতার মূল ইউরোপের কোন একটি দেশের ইতিহাসের মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস একদিকে যেমন সংক্ষিপ্ত ও অল্পকালব্যাপী, অন্য

দিকে ইহার বৈচিত্র্য তেমনি বিস্ময়কর। কোন একটি দেশে ইহা সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করে নাই। ইহার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, বহুদূর দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে হইবে। ইহার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য কখনও ফ্রান্স, কখনও ইংলণ্ড, কখনও জার্ম্মাণী, কখনও বা স্পেনে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

তবে ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনার পক্ষে ফ্রান্সের অধিবাসিবর্গের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। কারণ, ফ্রান্স বরাবর ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আসিয়াছে। আমি এ কথা বলিতে চাহি না যে, ফ্রান্স সকল সময়ে এবং সকল দিক্ দিয়া সমগ্র ইউরোপীয় জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। কোন কোন যুগে ইটালী কলা-শিল্পের ক্ষেত্রে ফ্রান্সকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; কখনও বা ইংলণ্ড রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দিক্ দিয়া অধিকতর উন্নতিসাধন করিয়াছে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ যুগে ইউরোপের অন্যান্য জাতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যখনই ফ্রান্স দেখিয়াছে যে, অন্য কোন জাতি তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে, তখনই সে নবীন উদ্যমে, অক্লান্ত চেষ্টায় অল্পকালের মধ্যেই সকলের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—ইউরোপের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, ইহাও দেখা যায় যে, যখনই কোন নূতন ভাব বা প্রতিষ্ঠান দেশবিশেষে উদ্ভূত হইয়া সমগ্র ইউরোপে ব্যাপ্তি ও সফলতা লাভ করিতে চাহিয়াছে, তখনই সেগুলিকে একবার ফ্রান্সের মাটিতে নূতন করিয়া তৈয়ারী হইতে হইয়াছে, এবং এই ফ্রান্স হইতে একপ্রকার নবজীবন লাভ করিয়া, তাহারা ইউরোপ জয় করিতে বাহির হইয়াছে। এমন কোন মহান্ ভাব নাই, সভ্যতার

এমন কোন মূলসূত্র নাই, যাহা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বে এইরূপে ফ্রান্সের ভিতর দিয়া যায় নাই।

তাহার কারণ এই। ফরাসী জাতির চরিত্রের মধ্যে এমন একটা সামাজিক সৌহৃদ্যের ভাব আছে, এমন একটা সহানুভূতির ক্ষমতা আছে, যাহাতে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ফরাসী জাতি সহজে ও অবাধে সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের ভাষার গুণেই হউক, তাহাদের চিন্তার বিশিষ্ট ভঙ্গীর দরুণই হউক বা তাহাদের মার্জ্জিত শিষ্টাচারের দরুণই হউক, এটা নিশ্চয় যে, ফরাসীজাতির চিন্তা ও ভাব অন্যান্য জাতির চিন্তা ও ভাব অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জল, সুস্পষ্ট ও জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হয় এবং সেই জন্য লোকসমাজে সহজেই প্রসার লাভ করে। এক কথায় প্রাঞ্জলতা, সামাজিকতা ও সহানুভূতিক্ষমতা, এই তিনটি গুণ লইয়াই ফ্রান্সের জাতীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব এবং এই গুণেই ফ্রান্স ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে নেতৃস্থান অধিকার করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে হইলে, ফ্রান্সকেই আমাদের আলোচনার কেন্দ্রস্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে।

এইখানে কতকগুলি গোড়াকার কথা পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। কিছুদিন হইতে একটা কথা উঠিয়াছে যে, বাস্তব তথ্য ও বাস্তব ঘটনাবলীর যথাযথ বিবরণ প্রদান করাই ইতিহাসের একমাত্র কর্ত্তব্য। তথ্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ইতিহাসের পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। ইহা যথার্থ কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু এটা মনে রাখিতে হইবে যে, সাধারণে আপাতদৃষ্টিতে যে সকল তথ্যকে ইতিহাসের একমাত্র বিষয় বলিয়া মনে করিতে চাহেন, তাহা ছাড়া আরও বহুসংখ্যক ও বহুপ্রকারের তথ্য আছে, যাহা ইতিহাসে

স্থান পাইবার যোগ্য। সকল তথ্যই একশ্রেণীর নহে। এমন অনেক তথ্য ও ঘটনা আছে, যাহা বাহ্য ও সহজে প্রত্যক্ষগোচর; যথা—যুদ্ধ, বিগ্রহ ও রাষ্ট্রশক্তিপ্রবর্তিত নানা বাহ্য অনুষ্ঠান। আবার অনেক তথ্য আছে, যাহা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের তথ্য। যদিও ইহারা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, সহজে বাহির হইতে চোখে পড়ে না, তথাপি ইহারা কাল্পনিক নহে, সম্পূর্ণরূপে বাস্তব। আবার একদিকে যেমন এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা স্বতন্ত্র, দেশকালনির্দ্দিষ্ট, সংজ্ঞাবিশিষ্ট, তেমতি অপর দিকে এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহারা ব্যাপক, যাহারা কোন বিশেষ সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত নয়, যাহাদের সন তারিখ নির্দ্দেশ করা যায় না, যাহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না, অথচ যাহাদিগকে ইতিহাস হইতে বাদ দিলে, ইতিহাস অঙ্গহীন হইয়া পড়ে।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয় ও যোগসূত্র আবিষ্কার, তাহাদের কার্য্যকারণবিচার—এক কথায় আমরা যাহাকে ইতিহাসের তত্ত্বাংশ বলিয়া থাকি—এ সমস্তই ইতিহাসের বিষয়ীভূত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বাহ্য ঘটনার বিবরণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকতার হিসাবে কোন অংশে ন্যূন নহে। এই সকল সূক্ষ্ম তথ্যের যথাযথ বিবৃতি ও বিশ্লেষণ করা বা ইহাদিগকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত রঙ্গে ফুটাইয়া তোলা যে অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও শ্রমসঙ্কুল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরূহ বলিয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার উপায় নাই। কারণ, এইগুলিই ইতিহাসের সারাংশ।

আমরা যাহাকে সভ্যতা বলি, তাহা এইরূপ একটি সূক্ষ্ম, জটিল, ব্যাপক ও নিগূঢ় ঐতিহাসিক তথ্য। ইহার বিবরণ দেওয়া কঠিন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার একটী বাস্তব সত্তা আছে, ইতিহাসে স্থান

পাইবার অধিকার আছে। আমরা ইহার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারি। এ প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং উঠিয়াছে যে, এই সভ্যতা জিনিষটা ভাল, কি মন্দ?—কেহ বা ইহাকে লইয়া আনন্দে উন্মত্ত, কাহারও নিকট বা ইহা আক্ষেপের বিষয়। এই সভ্যতা জিনিষটা কি বিশ্বজনীন, না বিশেষ বিশেষ দেশ বা যুগের মধ্যে ইহার গণ্ডী আবদ্ধ? সমগ্র মানব জাতির এক সাধারণ সভ্যতা, বিশ্বমানবের এক সাধারণ নিয়তি বলিয়া একটা কিছু আছে কি? বিভিন্ন মানব-জাতি যুগে যুগে এমন কিছু কি রাখিয়া যাইতেছে, যাহার বিনাশ নাই, যাহা কালে কালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিশাল হইতে বিশালতর আকার ধারণ করিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত যাহার গতির বিরাম নাই? আমার ত দৃঢ়বিশ্বাস যে, বাস্তবিকই বিশ্বমানবের একটা সাধারণ নিয়তি আছে, মানবসভ্যতা যুগে যুগে নানা জাতির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতেছে, এবং এই বিশ্বমানব-সভ্যতার বিরাট্ ইতিহাস লিখিত হইবার যোগ্য। যাহা হউক, এ সব বড় বড় প্রশ্ন উত্থাপন করিব না। এটুকু বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যদি আমরা দেশ ও কালের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আমাদের আলোচনা আবদ্ধ করিয়া লই, যদি কোন একটী জাতির নির্দ্দিষ্ট কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস লইয়া আমরা গবেষণায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে এই সভ্যতার ইতিহাস রচনা একেবারে অসম্ভব চেষ্টা হইবে না। শুধু তাহাই নহে, এই ইতিহাসই শ্রেষ্ঠ ইতিহাস, সমস্ত ইতিহাসই এই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে আপনাদিগের কি ইহা মনে হয় না যে, যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার একমাত্র পরিণতি এই সভ্যতায়? বাণিজ্য বলুন, শিল্প বলুন, যুদ্ধ-বিগ্রহ বলুন, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বলুন, শাসন-ব্যবস্থা বলুন, যখনই তাহাদিগকে সমষ্টি-

ভাবে দেখিবার চেষ্টা করা যায়, যখনই তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যায়, যখনই তাহাদিগকে পরীক্ষা ও বিচার করিবার সময় হয়, তখনই আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে হয়—ইহারা কে কি পরিমাণে জাতিবিশেষের সভ্যতাকে গঠিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছে, সভ্যতার উপর তাহারা কি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? এই-রূপেই আমরা জাতীয় জীবনের অঙ্গস্বরূপ এই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে সমর্থ হই, তাহাদের যথার্থ মূল্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। তাহারা যেন এক একটি নদী ; জাতীয় সভ্যতার মহাসমুদ্রে তাহারা কে কতটুকু জল আনিয়া দিল, তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। কথাটা যে কত সত্য, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রাজশাসনে যথেচ্ছাচারিতা বা অরাজকতা—উভয়ই জাতীয় জীবনের পক্ষে অকল্যাণকর বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন, কেহই ইহাদিগকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। কিন্তু যদি কোনরূপে গৌণভাবে এই যথেচ্ছতন্ত্র বা অরাজকতার দ্বারা জাতীয় সভ্যতার কোনরূপ পরিপুষ্টি সাধিত হয়, যদি তাহারা জাতিকে উন্নতির পক্ষে কিছুমাত্র অগ্রসর করিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে, আমরা কিয়ৎপরিমাণে তাহা-দিগকে মনে মনে ক্ষমা করিয়া থাকি, তাহাদের অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন আমরা কতক পরিমাণে উপেক্ষা করিয়া থাকি। অর্থাৎ যেখানেই আমরা পরিণামে সভ্যতা দেখিতে পাই, সেখানেই সেই সভ্যতার খাতিরে আমরা পূর্ব্বগামী দুঃখ কষ্ট অপমান সমস্তই ভুলিয়া যাইতে চাই।

আবার কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য আছে, যাহার সহিত সামাজিক জীবনের মুখ্য সম্বন্ধ নাই, যাহা মুখ্যতঃ মানুষের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ জীবনের সহিত জড়িত ; যথা—ধর্ম্মবিশ্বাস, দার্শনিক তত্ত্ব, বিজ্ঞান,

সাহিত্য, কলাশিল্প। মানুষের নৈতিক উন্নতি বা মানসিক তৃপ্তিসাধন ইহাদিগের প্রধান লক্ষ্য, সামাজিক উন্নতি-সাধন তত নহে।

ধর্ম্ম সর্ব্বদেশে মানুষকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাশিল্প. ইহারাও অল্লাধিকপরিমাণে এই গৌরবের অংশ দাবী করিয়া থাকে। যখনই আমরা এই দাবী স্বীকার করিয়াছি, যখনই আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা শিল্পের দ্বারা মানব-সভ্যতার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তখনই আমরা মনে করিয়াছি যে, এতৎদ্বারা ধর্ম্ম-সাহিত্যাদিরই গৌরব-বৃদ্ধি হইল। ধর্ম্ম-সাহিত্যাদি স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহাদের মহত্ত্ব বা মূল্য আপেক্ষিক নহে। বাহ্য ফলাফল বিচার করিয়া তাহাদের মূল্য নিরূপণ হয় না। মানুষের আত্মার সহিতই তাহাদের মুখ্য সম্বন্ধ। এমন যে অন্তরঙ্গ বস্তু, সভ্যতার সংস্পর্শে ইহাদেরও মূল্য বৃদ্ধি হয়। শুধু যে মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে; অনেক সময় কেবল সভ্যতার উপর কে কি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বিশেষ ভাবে সেই দিক্ দিয়াই ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্যাদির বিচার করিতে হয় এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে কেবল সভ্যতার দিক্ দিয়াই তাহাদের চূড়ান্ত মূল্য নির্ণয় করিতে হয়।

এখন তাহা হইলে সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একবার দেখা যাউক, এই সভ্যতাবস্তুর স্বরূপ কি?

সভ্যতা (Civilisation) কথাটি বহুকাল হইতে বহু দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ লোকে যে অর্থে কথাটি ব্যবহার করে, তাহা অল্লাধিক পরিমাণে ব্যাপক ও স্পষ্ট। যাহাই হউক, কথাটির যখন ব্যবহার আছে, তখন ইহার একটা যেমন হউক, অর্থও আছে। ইহার সর্ব্বজন-প্রচলিত সহজবুদ্ধিগোচর যে লৌকিক অর্থ, তাহাই আমাদিগকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কারণ, এই সকল

ব্যাপক শব্দের যে লৌকিক অর্থ, তাহা প্রায়ই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার অপেক্ষা সুনির্দ্দিষ্ট হয়। কোন শব্দের লৌকিক অর্থ সমগ্র সমাজের বহুকালার্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। কিন্তু বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা শব্দের যে সংজ্ঞা প্রস্তুত করিয়া লই, তাহা ব্যক্তিবিশেষ বা অল্পসংখ্যক লোকের অভিজ্ঞতার ফল; বিশেষ কোন একটা সত্যের অনুভূতি হইতে এই সকল সংজ্ঞার উৎপত্তি। সেই জন্য শব্দের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা প্রায়ই লৌকিক সংজ্ঞা অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী হয়। সুতরাং সমগ্র মানব-জাতির সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে এই Civilisation শব্দটির মধ্যে যতগুলি ভাব অনুস্যূত আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা সভ্যতাবস্তুটির প্রকৃত পরিচয়লাভের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিব। সভ্যতা শব্দের একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করিয়া আমরা ততদূর অগ্রসর হইতে পারিব না।

প্রথমে আমি আপনাদের সম্মুখে কতকগুলি কাল্পনিক সমাজের চিত্র ধরিতে চাই। এই চিত্রগুলি একে একে বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, লোকসাধারণে সভ্য সমাজ বলিলে যাহা বুঝে, তাহা এর মধ্যে কোন্ চিত্রের সঙ্গে মিলে।

প্রথমে এমন একটি সমাজ কল্পনা করা যাউক, যেখানে বাহ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব নাই, রাজকর পরিমাণে অল্প, বিচার-ব্যবস্থা সুপরিচালিত, এক কথায় যেখানে লোকের বাহ্য জীবনযাত্রা পরমসুখে ও সুনিয়মে পরিচালিত হয়। কিন্তু সেখানে অপর দিকে লোকের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন স্ফূর্ত্তিলাভ করিবার সুযোগ পায় না; এমন কি, এগুলিকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখা হয়, মানুষের বুদ্ধি, বিবেক, কল্পনাকে চিরকালের জন্য জড় ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা হয়। এরূপ সমাজের চিত্র ইতিহাসে নিতান্ত

বিরল নহে। এমন অনেক অভিজাততন্ত্র রাষ্ট্র দেখা গিয়াছে, যেখানে জনসাধারণ মেষপালের ন্যায় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত পালিত হইয়াছে, কিন্তু মানসিক বা নৈতিক উন্নতির অবসর পায় নাই। এই চিত্র কি সভ্যতার চিত্র? এই সমাজ কি সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে?

এইবার অন্য একটি সমাজের চিত্র কল্পনা করা যাউক। এখানে লোকের বাহ্য জীবনযাত্রা তত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত পরিচালিত না হউক, তবু একেবারে দুঃসহ নহে। এখানে কিন্তু নৈতিক ও মানসিক দিক্‌টা অবজ্ঞাত নহে। জনসাধারণকে কিয়ৎপরিমাণে মানসিক ও আধ্যাত্মিক খাদ্য যোগান হইয়া থাকে। তাহাদের মনে উচ্চ ও পবিত্র ভাব অঙ্কুরিত করিয়া দেওয়া হয়। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কতকদূর পর্য্যন্ত বেশ উন্নত ও পরিপুষ্ট, কিন্তু তাহাদের মনে যাহাতে স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের ভাব কোনরূপে স্থান না পায়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। পূর্ব্বোক্ত সমাজে যেমন বাহ্য ও শারীরিক অভাব পূরণের জন্য যথোপযোগী ব্যবস্থা আছে, এখানে তেমনি নৈতিক ও মানসিক অভাব পূরণের জন্য রীতিমত ব্যবস্থা আছে। যাহার যেটুকু প্রাপ্য, তাহাকে সেইটুকু সত্য বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধানে কাহারও অধিকার নাই। স্থাবরতাই এই সমাজের অন্তরঙ্গ জীবনের প্রধান বিশেষত্ব। এসিয়ার অধিকাংশ অধিবাসিবর্গ এইরূপ সমাজে বাস করিয়া আসিতেছে। যেখানেই দেবতন্ত্র বা যাজক-তন্ত্রের দ্বারা জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই-খানেই এই অবস্থা। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দুসমাজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানেও আবার সেই প্রশ্ন করি, এরূপ সমাজে কি সভ্যতার বিকাশ বা পুষ্টি হইতেছে?

এইবার সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকারের এক সমাজের কল্পনা করা

যাউক। এ সমাজে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অবাধ স্ফূর্ত্তি, কিন্তু সাম্য ও শৃঙ্খলার একান্ত অভাব। এখানে দুর্ব্বল সবলের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ। এখানে বল ও আকস্মিক ভাগ্যের রাজত্ব। সকলেই জানেন, ইউরোপকে এই অবস্থার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে। এটা কি সভ্যতার অবস্থা? অবশ্য ইহার মধ্যে সভ্যতার অনেক মূলতত্ত্ব নিহিত আছে, এবং এই তত্ত্বগুলি হয় ত ক্রমশঃ বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে; কিন্তু সমাজের মধ্যে যে ভাবের প্রধান আধিপত্য, সেটা যে সভ্যতা নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশেষে আমি আর একটি সমাজ-চিত্রের অবতারণা করিব। এ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা খুব বেশী; বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অবস্থার তারতম্যও খুব অল্প অথবা অল্পকালস্থায়ী। কিন্তু এখানে সামাজিক বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল; ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যতীত সকলের সাধারণ স্বার্থ বলিয়া কোন বস্তুর ধারণা নাই। প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি আপন আপন শক্তি ও প্রতিভা লইয়া স্বাতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করে এবং অবশেষে সমাজের উপর কোন প্রভাব বিস্তার না করিয়াই, পশ্চাতে কোন চিহ্ন না রাখিয়াই, সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করে। যুগের পর যুগ পুরুষানুক্রমে তাহারা একই ভাবে জীবন যাপন করিয়া যায়, কোথাও কোন উন্নতি বা পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। অসভ্য জাতিদিগের এই অবস্থা; তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও সাম্য আছে, কিন্তু সভ্যতা নিশ্চয়ই নাই।

এইরূপ আরও অনেক কাল্পনিক সমাজের অবতারণা করা যায়, কিন্তু সভ্যতা শব্দের লৌকিক ও সহজ অর্থ নির্দ্ধারণের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এটা বেশ স্পষ্ট যে, এই সকল কল্পিত সমাজের মধ্যে কোনটিই মানব-জাতির সহজ বুদ্ধিতে সভ্যসমাজ বলিয়া গৃহীত হইবে না। কেন গৃহীত

হইবে না? কারণ, আমার মনে হয় যে, সভ্যতা কথাটার মধ্যে একটা উন্নতি বা পরিপুষ্টির ভাব অনুস্যূত আছে। সভ্য জাতি বলিলেই একটা পরিবর্ত্তনশীল, উন্নতিশীল জাতির চিত্র মনে আসে। এই উন্নতির কথাটাই যেন সভ্যতা শব্দের অন্তর্নিহিত মূল ভাব। এই উন্নতি জিনিষটি কি? এই পরিপুষ্টি কিসে হয়? এইখানেই যত গোল।

Civilisation শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে একটা বেশ পরিষ্কার ও সন্তোষজনক অর্থ পাওয়া যায়। Civilisation অর্থ Civil lifeএর সম্পূর্ণতা সাধন, সামাজিক জীবনের পুষ্টিসাধন। অর্থাৎ মানুষ মানুষের সঙ্গে যে সকল বিচিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেই সকল সম্বন্ধের পূর্ণতা ও পুষ্টিসাধনই সভ্যতা।

বাস্তবিক পক্ষে Civilisation কথাটি উচ্চারণ করিলেই প্রথমে এই শেষোক্ত ভাবটিই মনে আসে। আমরা তৎক্ষণাৎ মনে মনে এমন একটি আদর্শ সমাজ চিত্রিত করিয়া লই, যেখানে সামাজিক সম্বন্ধগুলি সুপরিব্যাপ্ত, সুনিয়ন্ত্রিত ও ক্রিয়াবান্। সে সমাজে একদিকে যেমন শক্তি ও সৌখ্য-বিধায়ক পদার্থসমূহ বহুলপরিমাণে উৎপন্ন হয়, তেমনি অপর দিকে সেই সকল পদার্থ সমাজভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুসঙ্গত ও যথাযোগ্য বণ্টিত হয়।

কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট? সভ্যতা শব্দের মধ্যে কি আর কোন ভাব অন্তর্নিহিত নাই? মানবসমাজ কি তাহা হইলে পিপীলিকা-সমাজ হইতে অভিন্ন? পিপীলিকা-সমাজের যেমন সামাজিক শৃঙ্খলা ও শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই একমাত্র লক্ষ্য, মানব-সমাজেরও কি তাহাই? তাহা হইলে ত অন্নবস্ত্রাদির জন্য পরিশ্রমের মাত্রা যত বাড়ান হইবে ও পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যসামগ্রী যত ন্যায়মত বণ্টিত হইবে, সমাজের উদ্দেশ্য ততই সুসিদ্ধ হইবে এবং সমাজের উন্নতিও সেই পরিমাণে হইবে।

মানবজাতির লক্ষ্য ও নিয়তি সম্বন্ধে এমন একটা সঙ্কীর্ণ ধারণা করিতে আমাদের মন কিছুতেই সম্মত হয় না। আমাদের মনে সহজেই ধারণা হয় যে, সভ্যতা জিনিষটা এ অপেক্ষা অনেক জটিল ও ব্যাপক।

সভ্যতা শব্দের লোকপ্রচলিত অর্থও আমাদের এই সহজ ধারণাকেই সমর্থন করিতেছে।

প্রথমে রোমের দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। রোমে যখন প্রজাতন্ত্র শাসনের চরমোৎকর্ষ, পিউনিক যুদ্ধ যখন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, রোমান চরিত্রের বিশিষ্ট সদ্‌গুণগুলি যখন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, রোম যখন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য লাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে, রোমীয় সমাজের অবস্থা যখন নিঃসন্দেহ উন্নতিশীল, এক দিকে সেই সময়ের রোমকে ধরুন। অপর দিকে অগষ্টসের সময়ের রোমকে ধরুন। তখন রোমের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে, অন্ততঃ তখন রোমীয় সমাজের উন্নতি বন্ধ হইয়াছে ; রাষ্ট্রে ও সমাজে অকল্যাণকর নীতির আধিপত্যের সূচনা হইয়াছে। অথচ এমন কেহই নাই, যিনি বলিবেন না যে, অগষ্টসের রোম, প্রজাতন্ত্র রোম অপেক্ষা, ফ্যাব্রিসিয়স্ ও সিন্‌সিনেটসের রোম অপেক্ষা সভ্যতায় উন্নত।

এইবার একবার আল্পস্ গিরিমালার অপর পারে যাওয়া যাউক। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের কথা ভাবুন। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার দিক্ দিয়া দেখিলে ফ্রান্স তখন ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অথচ সকলেই বলিবেন যে, সভ্যতা-হিসাবে ফ্রান্স তখন ইউরোপের অন্যান্য সমস্ত দেশ অপেক্ষা উন্নত। ইউরোপীয় সাহিত্যের সর্ব্বত্রই এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এইরূপ আরও অনেক দেশের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান যাইতে পারে

যে, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সভ্যতার উন্নতি বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ইহার অর্থ কি? সামাজিক ও আর্থিক অবস্থায় নিকৃষ্ট হইলেও, অন্য কি গুণে কোন জাতি সভ্য-পদবী প্রাপ্ত হইতে পারে?

ইতিহাস বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই সকল জাতি সামাজিক জীবনে নহে, অন্যত্র উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইহারা মানুষের ব্যক্তি-গত জীবনের, অন্তরঙ্গ জীবনের, সার মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করিয়াছে। মানুষের চিন্তা, ভাব ও বৃত্তিসমূহের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। তাহাদের সমাজ ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মনুষ্যত্ব অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সামাজিক জীবনের উন্নতির পক্ষে এখনও তাহাদের অনেক কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে, কিন্তু মানসিক ও নৈতিক জীবনে তাহারা প্রভূত কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে।

তাহাদের সমাজে অনেক লোক বাহ্য সম্পদ্ ও সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত; কিন্তু অনেক বড় লোক সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতেছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা উৎকর্ষের চরম সীমায় উঠিয়াছে। যেখানেই এই সকল লক্ষণ দেখা দিয়াছে, যেখানেই মানুষের অতীন্দ্রিয় ভোগের এই সকল শ্রেষ্ঠ উপাদান সৃষ্ট হইয়াছে, সেইখানেই লোকসাধারণ সভ্যতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে:

তাহা হইলে সভ্যতার দুইটি অঙ্গ। একদিকে সমাজের উন্নতি, অন্য দিকে মনুষ্যত্বের বিকাশ। যেখানেই মানুষের বহিরঙ্গ জীবন সজীব, উন্নতিশীল ও সুশৃঙ্খল; যেখানেই মানুষের অন্তরঙ্গ জীবন অপূর্ব্ব জ্যোতি ও মহিমায় মণ্ডিত; এই দুই লক্ষণ যেখানেই পাওয়া গিয়াছে, সামাজিক অবস্থার নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবসমাজ সেইখানেই সমস্বরে সভ্যতার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা সর্ব্বসাধারণের সহজবুদ্ধি অনুসারে সভ্যতার মূল প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করিলাম। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইব। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে যেগুলি সন্ধিক্ষণ বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন, যথা—খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান, সেই সন্ধিক্ষণগুলির বিচার করিলেও আমরা দেখিব যে, পূর্ব্বোক্ত দুই লক্ষণের মধ্যে অন্ততঃ একটি সেখানে বিদ্যমান। খৃষ্টধর্ম্মের যখন প্রথম অভ্যুত্থান, শুধু তখন নহে, অনেক দিন পর্য্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য কোন উদ্যম প্রকাশ করে নাই। বরং সে স্পষ্টবাক্যে ঘোষণা করিয়াছে যে, সামাজিক ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করিবে না। সে ক্রীতদাসকে বলিয়াছে,—'প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া যাও।' সেই যুগের সমাজের অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সে অস্ত্রধারণ করে নাই। অথচ খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান যে মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটা সন্ধিক্ষণ, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কেন না, ইহা মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে; মানুষের বিশ্বাস, মানুষের অন্তঃকরণের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে; মানুষের চিন্তা ও ভাবরাজ্যে একটা নবজীবন দান করিয়াছে।

আমরা সভ্যতার ইতিহাসে আর একটা বড় সন্ধিক্ষণ দেখিয়াছি। সে ফরাসী বিপ্লব। এ বিপ্লবের উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরঙ্গ পরিবর্ত্তন নহে, মানুষের বাহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন। এ সন্ধিক্ষণে মানুষের সমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে।

এইরূপ ইতিহাসের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান কর, দেখিবে যে, যে কোন ঘটনাদ্বারা সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে, তাহা হয় মানুষের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত জীবন, না হয় বহিরঙ্গ সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এখন সভ্যতার এই যে দুইটি অঙ্গ পাওয়া গেল, ইহার মধ্যে যে কোন একটিই কি সভ্যতার পক্ষে যথেষ্ট? কেবল অন্তরঙ্গ উন্নতি বা কেবল বহিরঙ্গ উন্নতি কি সভ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? একটির আবির্ভাব হইলেই, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, অন্যটির আবির্ভাব কি অবশ্যম্ভাবী?

আমার মনে হয়, তিন দিক্ দিয়া প্রশ্নটির বিচার হইতে পারে। প্রথমে আমরা সভ্যতার এই দুই অঙ্গের প্রকৃতি বিচার করিয়া দেখিতে পারি, ইহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত কি না। অথবা আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া দেখিতে পারি যে, ইহারা পৃথক্ ও স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, না সর্ব্বত্রই একটির সঙ্গে সঙ্গে অপরটির আবির্ভাব হইয়াছে। অথবা আমরা এক তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিতে পারি। আমরা লোকসাধারণের সহজবুদ্ধির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারি। আমি প্রথমে এই শেষোক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে চাই।

যখন দেশের অবস্থার একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যখন সমাজে সম্পদ্ ও শক্তির পরিপুষ্টি হয়, সামাজিক সম্পদের বণ্টন-ব্যবস্থায় একটা বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন এই বিপ্লব, এই পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়. ইহা অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা কি বলেন? তাঁহারা বলেন,—"মানুষের বাহিরের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিলে কি হইবে? যে পরিমাণে বাহিরের উন্নতি হইবে, সেই পরিমাণে কি ভিতরের উন্নতি হইবে, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইবে? তোমরা যে উন্নতি সাধন করিতে চাও, সে উন্নতি ছলনামাত্র, সে উন্নতি মানুষের চরিত্রের পক্ষে, অন্তরঙ্গ মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর।" যাঁহারা সামাজিক উন্নতির পক্ষপাতী, তাঁহারা ইহার বিপক্ষে প্রবল যুক্তিসমূহের

অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন, সামাজিক উন্নতির সঙ্গে নৈতিক উন্নতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেখানে বহিরঙ্গ জীবন সুনিয়ন্ত্রিত, সেখানে অন্তরঙ্গ জীবনও মার্জ্জিত ও পবিত্র হয়।

এইবার বিপরীত দিক হইতে দেখা যাউক। যখন কোন সমাজে চিত্তবৃত্তিনিচয়ের বিকাশ ও উন্নতি চলিতেছে, তখন সেই উন্নতিমার্গের পথপ্রদর্শকেরা জনসাধারণের কাছে কোন্ আশার প্রলোভন দেখান? সমাজের শৈশবাবস্থায় ধর্ম্মশাসক, ঋষি, মনীষী, কবি প্রভৃতি যে কেহ মানুষের দুর্দ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া কোমল ও মার্জ্জিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা মানুষকে কি বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন? তাঁহারা আশা দিয়াছেন যে, চিত্তবৃত্তির বিকাশের দ্বারা সামাজিক অবস্থার উন্নতি হইবে, সমাজের সম্পদ্ আরও সুশৃঙ্খলার সহিত যথাযোগ্যভাবে সকলের ভোগে নিয়োজিত হইবে।

তাহা হইলে দুই পক্ষের এই বাদ প্রতিবাদ হইতে কোন সত্য উদ্ধার করা যায়? এই বাদ প্রতিবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, মানুষের সহজ স্বাভাবিক ধারণায় সভ্যতার এই দুই দিক্ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। এই দুইএর মধ্যে একটা দেখিলেই লোকে তাহার সঙ্গেই অন্যটাকেও দেখিতে আশা করে। লোকের মনে এইরূপ ধারণা আছে বলিয়াই দুই পক্ষের লোক পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তির অবতারণা করেন। যাঁহারা সামাজিক বিপ্লব চান না, তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, সমাজের উন্নতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ উন্নতির কোন অনুকূল সম্বন্ধ নাই। অন্যদিকে যাঁহারা অন্তরঙ্গ উন্নতি করিতে চান, তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, অন্তরঙ্গ উন্নতি হইলেই বহিরঙ্গ উন্নতি সাধিত হইবে।

যদি আমরা জগতের ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তাহা হইলেও

আমরা সেই একই উত্তর পাইব। আমরা দেখিব, মানুষের ব্যক্তিগত ভাব ও চিন্তার বিকাশ সমাজের পক্ষেও লাভজনক হইয়াছে; আবার সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তারও বিকাশ হইয়াছে। তবে কখনও বা একটি, কখনও বা অন্যটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং সেই সেই যুগের উপর একটা বিশেষ ছাপ দিয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রথমটি বিকাশ প্রাপ্ত হইবার অনেক কাল পরে সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া, সহস্র প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া তবে সমাজে সভ্যতার দ্বিতীয় অঙ্গটি পুষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং পুষ্টিলাভ করিয়া সভ্যতাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু যদি সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখা যায়, তাহা হইলে এই উভয় প্রকারের উন্নতির মধ্যে যে যোগসূত্র আছে, তাহা আবিষ্কার করা যায়। বিধির বিধানের গতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। সে কল্য যে বীজ বপন করিয়াছে, অদ্যই তাহার ফল ফলাইবার জন্য ব্যস্ত নহে। ফল তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফলিবেই, হয় ত শত শত বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে নয়। বিধাতার নিকট সময়ের কোন মূল্য নাই। সময়ের দূরত্ব তাঁহার নিকট তুচ্ছ, তাঁহার এক এক পাদক্ষেপেই কত কত যুগ অতিক্রান্ত হইয়া যায়। খ্রীষ্টধর্ম্ম মানুষের নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে নূতন উৎপ্রাণনা আনিয়া দিবার কত শতাব্দী পরে, কত অসংখ্য ঘটনার পরে, তবে মানুষের সামাজিক জীবনে সেই উৎপ্রাণনার যথোপযুক্ত ফল ফলিল। কিন্তু তাই বলিয়া এই ফল যে সে ফলাইতে পারে নাই, তাহা কে বলিবে?

যদি ইতিহাস ছাড়িয়া সভ্যতার ঐ দুই অঙ্গের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলেও আমরা সেই একই সিদ্ধান্ত পাইব। যখন অন্তরের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, যখন মানুষ নূতন কোন

একটা ভাব বা গুণ বা বৃত্তি লাভ করে, এক কথায় যখন তাহার ব্যক্তিগত সত্তা পুষ্টিলাভ করে, তখন সে কি চায়, সে কি অভাব বোধ করে? সে চায়, তাহার নূতন ভাব চতুষ্পার্শ্বস্থ মানববৃন্দের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে, সে চায়, তাহার অন্তরের বস্তুকে বাহিরের জগতে বাস্তব প্রতিষ্ঠা দিতে। যখনই মানুষ নূতন কিছু পায়, যখনই তাহার অন্তরে বিশ্বাস হয় যে, তাহার একটা নূতন পরিণতি লাভ হইয়াছে, তখনই সে সেটিকে নিজস্ব করিয়া ভাবে।

তাহার নিজের জীবনে সে যে নূতন পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য সে একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা অনুভব করে। এই প্রেরণা হইতেই বড় বড় সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। যে সকল শক্তিমান্ পুরুষ নিজে রূপান্তরিত হইয়া জগতের রূপান্তর সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র এই অভাববোধের দ্বারাই প্রেরিত ও চালিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন।

আবার ধরুন, সমাজে একটা বিপ্লব—একটা আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সমাজব্যবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত; সম্পত্তি ও অধিকার এখন পূর্ব্বাপেক্ষা সমান ভাবে সমাজে সর্ব্বত্র বণ্টিত; অর্থাৎ এখন মানুষের শাসন-ব্যবস্থায়, এবং পরস্পর ব্যবহারে, ন্যায়ধর্ম্ম ও দয়া-ধর্ম্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনারা কি মনে করেন, সমাজের এই উন্নতি, মানব-জীবনের বাহ্যব্যাপারের এই সংস্কার, মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের, মানুষের মনুষ্যত্বের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না? প্রাচীন প্রথা, প্রাচীন দৃষ্টান্ত, মহৎ আদর্শের প্রভাব সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হয়, তাহা কি এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে যে, বাহ্যজগতে কল্যাণ ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্তর্জ্জগতেও কল্যাণ ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজে ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইলে মানুষের

অন্তরেও ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়, অন্তরঙ্গের দ্বারা যেমন বহিরঙ্গ সংস্কৃত হয়, বহিরঙ্গের দ্বারা তেমনি অন্তরঙ্গের সংস্কার সাধিত হয়, অর্থাৎ সভ্যতার দুই অঙ্গ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ? এই দুই অঙ্গের বিকাশের মধ্যে বহু শতাব্দীর, বহু বাধাবিপত্তির ব্যবধান থাকিতে পারে, একটি অপরটির সহিত যুক্ত হইবার পূর্ব্বে সহস্ররূপে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইবেই হইবে। ইহাই তাহাদের ধর্ম্ম ও প্রকৃতি, ইহাই ইতিহাসের প্রধান তথ্য, ইহাই মানবজাতির সহজ সংস্কার।

এখন বোধ হয়, সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটা পরিষ্কার করা গিয়াছে। সভ্যতা কাহাকে বলে, সভ্যতার সীমা কতটুকু—সভ্যতাসম্পর্কীয় এইরূপ প্রধান প্রধান মৌলিক প্রশ্নগুলি একরূপ মোটামুটি আলোচনা করা গিয়াছে। এইখানে আমরা আর একটী প্রশ্ন তুলিব। প্রশ্নটি ইতিহাসের প্রশ্ন নহে, এটি একটি দার্শনিক সমস্যা। এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয় ত মানববুদ্ধির অতীত, কিন্তু পদে পদে আমাদিগকে এইরূপ সমস্যার একটা না একটা সমাধান করিয়া লইতে হয়, নচেৎ জীবনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

সভ্যতার যে দুইটী অঙ্গের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে কোন্‌টি উদ্দেশ্য, কোন্‌টি উপায়? কোন্‌টি মুখ্য, কোন্‌টি গৌণ? মানুষ কি সামাজিক উন্নতির জন্যই, ঐহিক জীবনের সুখশান্তির জন্যই নিজের অন্তর্বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করে? না, সমাজ কেবল মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার, মানুষের অন্তর্বৃত্তিগুলির বিকাশ, পরিপুষ্টি ও স্বচ্ছন্দ-লীলার ক্ষেত্র মাত্র? অর্থাৎ মানুষ সমাজের দাস, না সমাজ মানুষের দাস? এ প্রশ্নের উত্তর পাইলে তবে আমরা বুঝিতে পারিব, মানব-জীবনের চরম পরিণতি সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ কি না; সমাজের

সেবাতেই মানুষের সমস্ত নিজস্ব নিঃশেষিত হইয়া যায়, না, ইহা ছাড়া মানুষের আরও কিছু এমন অমূল্য সম্পদ্ আছে, যাহা পার্থিব জীবন হইতে শ্রেষ্ঠ।

বন্ধুবর রোয়াইয়ে কোলার (Royer Collard) তাঁহার নিজের বিশ্বাস অনুসারে এই প্রশ্নের একটা সমাধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মদ্রোহ অপরাধ আইন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন,—"বিভিন্ন মানবসমাজ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, জীবন ধারণ করে ও জীবন বিসর্জ্জন করে ; পৃথিবীতেই তাহারা চরম পরিণতি লাভ করে। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ মানুষকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সমাজের কার্য্যে নিজের শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করিবার পরও তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার মহত্তম অংশটুকু তাহার সর্ব্বোচ্চ মনোবৃত্তিগুলি অবশিষ্ট রহিয়া যায়। এই সকল অন্তর্বৃত্তিগুলির চর্চ্চা-দ্বারা সে ভগবানের দিকে, পরলোকের দিকে, এক অদৃশ্য জগতে অজ্ঞাত আনন্দের দিকে উন্নীত হয়।"

আমি এ কথার উপর আর কিছু বলিব না। আমি স্বাধীন ভাবে এ প্রশ্নের বিচারেও প্রবৃত্ত হইব না। আমি প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট। সভ্যতার ইতিহাসে এ প্রশ্নটি মাঝে মাঝে উঠে। সভ্যতার ইতিহাস যখন সম্পূর্ণ হয়, যখন আমাদের ঐহিক জীবন সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার থাকে না, মানুষ তখন জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে না যে, ইহাতেই কি সব শেষ হইল, এইখানেই কি মানব-জীবনের চরম পরিণতি? সভ্যতার ইতিহাস আমাদিগকে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন করিয়া দেয়, ইহাই তাহার শেষ প্রশ্ন—ইহাই চরম সমস্যা। সমস্যাটির স্থান ও গুরুত্ব নির্দ্দেশ করিয়াই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল মনে করি।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, সভ্যতার

ইতিহাস দুই বিভিন্ন প্রণালীতে, দুই বিভিন্ন প্রকার উপাদান লইয়া, দুই বিভিন্ন দিক্ হইতে আলোচিত হইতে পারে। ঐতিহাসিক কোন নির্দ্দিষ্ট যুগ বা যুগপরম্পরা ধরিয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট জাতির মধ্যে মানবচিত্তের অন্তরতম প্রদেশে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন ; তিনি মানুষের অন্তরে যত কিছু রূপান্তর. যত কিছু বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে পারেন, চিত্রিত ও বিবৃত করিতে পারেন, এবং অবশেষে এইরূপে সেই দেশের ও সেই যুগের সভ্যতার এক ইতিহাস পাইতে পারেন। তিনি অন্য কোন প্রণালীও অবলম্বন করিতে পারেন। মানুষের অন্তরঙ্গ সত্তার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, তিনি বহিঃসমাজের মধ্যে আপনার স্থান লইতে পারেন। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির চিন্তা ও ভাবের বিচিত্র পরিবর্ত্তনের বিবরণ প্রদান না করিয়া তিনি বাহ্য ঘটনার, সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। সভ্যতার এই দুই প্রকারের ইতিহাস পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ; ইহারা পরস্পরের প্রতিবিম্বস্বরূপ। অথচ ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় ; হয় ত পৃথক্ করাই উচিত; কারণ, এইরূপে উভয় ইতিহাসের বিস্তৃত ও পরিষ্কার আলোচনা হইতে পারে। আমি বর্ত্তমান গ্রন্থে সভ্যতার অন্তরঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। আমি বাহ্য ঘটনা লইয়া, দৃশ্যমান জগৎ লইয়া, সমাজ লইয়া আলোচনা করিতে চাই।

আমরা প্রথমে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থায়, রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগে ইউরোপীয় সভ্যতার সমস্ত উপাদানগুলি অনুসন্ধান করিতে চাই। সেই সুবিশাল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সমাজের কি অবস্থা ছিল, তাহা মনোনিবেশপূর্ব্বক গবেষণা করিতে চাই। সেখান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সেগুলি পাশাপাশি সাজাইতে চেষ্টা করিব। পরে সেগুলিকে গতি দান করিয়া পরবর্ত্তী পঞ্চদশ শতাব্দীর

মধ্য দিয়া তাহাদের বিচিত্র গতিপথ অনুসরণ করিয়া যাইতে চাই।

আমার বিশ্বাস, এই আলোচনায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই আমাদের দৃঢ় ধারণা হইবে যে, সভ্যতা এখনও অপরিণতবয়স্ক; জগতে সভ্যতার জীবনলীলা অবসানোন্মুখ হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। মানবচিন্তা এখনও যথাসম্ভব বিকাশ লাভ করে নাই। মানবজাতির ভবিষ্যৎ পরিণতির সমগ্র ধারণা করিতে এখনও বহু বিলম্ব। প্রত্যেকে যদি নিজের মনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের সঙ্গে বাস্তব জগতের তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলেই স্পষ্ট ধারণা হইবে যে, সভ্যতা ও সমাজ বাস্তবিকপক্ষে এখন অত্যন্ত শিশু; বুঝিতে পারিব যে, যদিও তাহারা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহাদের গন্তব্য পথের তুলনায় সে দৈর্ঘ্য নিতান্ত তুচ্ছ। তাহাতে আমাদের বিষণ্ণ হইবার কোনই কারণ নাই। আমি যখন গত পঞ্চদশশতাব্দীব্যাপী ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব, তখন দেখিতে পাইবেন, আমাদের সময় পর্য্যন্তও কি সামাজিক ব্যাপারে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষকে কত পরিশ্রম, কত চেষ্টা করিতে হইয়াছে, কত ঝঞ্ঝা বিপ্লব অতিক্রম করিতে হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মানব-সমাজকে যেমন ক্লেশ পাইতে হইয়াছে, মানবাত্মাকেও সেইরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। আপনারা দেখিবেন যে, কেবল আধুনিক যুগেই মানুষের মন কতকটা শান্তি ও শৃঙ্খলার আভাস পাইয়াছে। সমাজ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সমাজ যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় সমাজ হইতে এখন অন্যায় ও উদ্বেগ অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, যেন নিজেদের উন্নতি ও সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা অহঙ্কার ও আলস্যের কবলে নিপতিত না হই। আমাদের মানসিক উন্নতিতে অতিমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা যেন আধুনিক কালের অনায়াসলব্ধ বিলাস ও শান্তিতে আপনাদের মনুষ্যত্ব হারাইয়া না ফেলি।

আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা উদ্দাম ও প্রবল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু কার্য্যকালে আমরা হতাশ হইয়া পড়ি, উদ্যমের একান্ত অভাব হইয়া পড়ে। আমাদের এই দুই চরিত্রগত দোষ যেন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া না ফেলে। আমরা যেন পূর্ব্ব হইতে আমাদের শক্তি, জ্ঞান ও যোগ্যতার যথার্থ পরিমাপ লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকি। যেন আমাদের সাধ্যাতীত কোন বাঞ্ছা বা দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে উন্মত্ত না করিয়া তোলে।

অনেক সময় আমাদের দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্য—সমস্তই উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হই। অথচ পূর্ব্বকালের বর্ব্বরসুলভ উদ্যম বা কর্ম্মঠতা আমাদের নাই। এইরূপে আমাদের বর্ত্তমানের যে উন্নতি লইয়া গর্ব্ব করি, সেই উন্নতির মূলে যেন আমরা কুঠারাঘাত না করি। ন্যায়পরতা, বিধিপরতন্ত্রতা, প্রকাশ্যতা ও স্বাধীনতা —আমাদের সভ্যতার এই কয়েকটি মূলমন্ত্র যেন আমরা সুদৃঢ়ভাবে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত ধরিয়া রাখি। এ কথা যেন আমরা মনে রাখি যে, আমরা যেমন সমস্ত ব্যাপার স্বাধীনভাবে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া লইতে চাই, সেইরূপ আমাদের আচরণের উপরও জগতের দৃষ্টি রহিয়াছে। যথাসময়ে আমরা এই বিষয় আলোচনা করিব

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমি কোন বিশেষ জাতি বা বিশেষ কালের বিচার না করিয়া, সাধারণ ভাবে, বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে সভ্যতা-বস্তুটির স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ আমি ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু এই আখ্যানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি মোটামুটি ভাবে এই সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃতি ও গঠনের সহিত আপনাদের পরিচয় স্থাপন করিতে চাই। আমি কেবল ততটুকু পরিস্ফুটভাবে ইহার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে চাই, যাহাতে জগতের অন্যান্য দেশের সভ্যতা হইতে ইহা যে বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা, এইটুকুই আপনাদের মনে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে পারে। আমি এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, আমার বর্ণিত চিত্র এমন যথাযথ ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইবে যে, আপনারা দেখিবামাত্রই ইহাকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি বলিয়া চিনিতে পারিবেন।

এশিয়াতেই হউক বা ইউরোপেই হউক, আধুনিক ইউরোপের পূর্ব্বে যে সকল স্থানে সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছে, সেই সকল স্থানের সভ্যতার মধ্যে, এমন কি, গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতার মধ্যেও একটা বৈচিত্র্যাভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক সভ্যতাই যেন একটিমাত্র করিয়া মূল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটিমাত্র করিয়া মূলভাব হইতে উদ্ভূত। যেন সমাজ সে সব স্থানে একটিমাত্র মূল তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং সে সব স্থানের রীতিনীতি, অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান সমস্তই যেন একটিমাত্র মূলতত্ত্বদ্বারা গঠিত ও অনুপ্রাণিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, মিশর দেশে এক যাজকতন্ত্ররূপ মূলতত্ত্বদ্বারা সমগ্র সমাজ শাসিত ও অনুপ্রাণিত। এই একটিমাত্র তত্ত্ব সেখানকার

রীতিনীতি, সেখানকার স্থাপত্য এবং সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শনের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষেও আপনারা সেই একই তত্ত্বের প্রভাব দেখিতে পাইবেন। সেখানে এখনও পর্য্যন্ত আপনারা সেই যাজকতন্ত্রের আধিপত্য দেখিতে পাইবেন। আবার অন্য কোন কোন দেশে আপনারা অন্য এক তত্ত্বের প্রভাব দেখিবেন, যথা—সমাজে বিজেতৃ-জাতির আধিপত্য। এ সকল সমাজে একমাত্র বলের আধিপত্য দেখা যাইবে। সমাজের বিধিব্যবস্থা, সমাজের প্রকৃতি, সমস্তই সেখানে বলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত। অন্যত্র আবার সমাজে জনতন্ত্রনীতির বিকাশ ও আধিপত্য। এশিয়ামাইনর, সীরিয়া, ফীনিশিয়া প্রভৃতি দেশের সমুদ্রোপকূলে যে সমস্ত বাণিজ্যসমৃদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এই জনতন্ত্রনীতির আধিপত্য দেখা যায়। মোটের উপর দেখা যায়, প্রাচীন সভ্যতামাত্রই এক একটি বিশেষ ভাব বা তত্ত্বের ছাপ লইয়া নিজ নিজ রীতিনীতি প্রতিষ্ঠানাদি গঠন করিয়া লইয়াছিল; একটি প্রবল শক্তিদ্বারা তাহাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাপ্রণালী শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত।

আমি এ কথা বলিতে চাই না যে, এই সকল রাষ্ট্রের সভ্যতার মধ্যে যে একমুখীনতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আদিম কাল হইতে বরাবরই তাহাদের মধ্যে প্রবল ছিল। ঐ সকল দেশের প্রাচীনতর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সমাজের আভ্যন্তরীণ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সময়ে সময়ে সমাজের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য পরস্পর লড়াই করিয়াছে। যথা প্রাচীন মিশর, ইত্রুরিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশে যোদ্ধৃসমাজ যাজকসমাজের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। অন্যত্র গোষ্ঠীগত বা বংশগত ঐক্যের ভাব অন্যপ্রকার স্বাধীন একতাবন্ধনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে; কোথাও বা অভিজাততন্ত্রের সহিত জনতন্ত্রের সংঘর্ষ

ঘটিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল বিভিন্ন তত্ত্বের সংঘর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগে সংঘটিত হইয়াছে, এবং ঐতিহাসিক যুগে তাহাদের অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র রহিয়া গিয়াছে।

কোন কোন স্থলে ঐতিহাসিক যুগেও জাতীয় জীবনের মধ্যে এই সকল সংঘর্ষের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পকালের মধ্যেই এই সকল সংঘর্ষের পর্য্যবসান হইয়াছে। পরস্পর বিবদমান বিভিন্ন শক্তির মধ্যে কোন একটি শক্তি অল্পকালের মধ্যেই সমাজে একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন সমাজের ইতিহাসে এককালে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অবস্থান ও সংঘর্ষ কখনও অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই, সাময়িক বিক্ষোভমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই কোন প্রকার জটিলতা বা উপাদানবৈচিত্র্য নাই। এক একটি জাতির ইতিহাসমধ্যে এক একটি মূলতত্ত্বের আধিপত্য। প্রাচীন সমাজের এই একবর্ত্তিতার ফল ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রসব করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে এই একবর্ত্তিতার ফলে সমাজের বিকাশ ও পরিণতি অতি অল্প কালের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছিল। কোনও জাতি এত শীঘ্র এমন সফলতার সহিত জাতীয় শক্তির বিকাশ সাধনে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এই বিস্ময়জনক উন্নতি ও পুষ্টির পর, গ্রীস যেন হঠাৎ একেবারে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। গ্রীসের জাতীয় ক্ষয় ও বিনাশ সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু এই ক্ষয়ের সূত্রপাত হইল বড় শীঘ্র। মনে হয়, যেন গ্রীকসভ্যতার প্রাণতত্ত্বের সৃজনী শক্তি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল ; এ পর্য্যন্ত আর এমন কোনও নূতন শক্তির আবির্ভাব হয় নাই, যাহাতে এই সভ্যতাকে নবজীবন দান করিতে পারে।

অন্যত্র, মিশর ও ভারতবর্ষে সামাজিক জীবনে একটিমাত্র তত্ত্বের

একাধিপত্যের ফল অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। সেখানে সমাজ স্থিতিশীল হইয়া পড়িয়াছে। একবর্ত্তিতার ফলে দাঁড়াইয়াছে বৈচিত্র্যাভাব। সমাজ সেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই, টিকিয়া রহিয়াছে, কিন্তু গতি নাই, চাঞ্চল্য নাই, সামাজিক জীবন যেন বরফের মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

এই কারণেই সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই একটা একাধিপত্যস্থাপনের চেষ্টা, বিরোধী মত, বিরোধী শক্তিকে জোর করিয়া দমন করিবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। এই একাধিপত্যের চেষ্টা সর্ব্বত্র ধর্ম্মনীতি বা শাসননীতির নামে চালান হইয়াছে। সমাজ কোন একটি বিশেষ শক্তির একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইয়াছে, সে শক্তি অন্য কোন শক্তির অস্তিত্বমাত্র থাকিতে দেয় নাই। সমস্ত বিরোধী ভাব, বিরোধী শক্তি সে নির্ম্মমভাবে দলন ও নিষ্পীড়ন করিয়াছে। শাসন-শক্তি কখনও তাহার পার্শ্বে অন্য কোন শক্তি বা তত্ত্বের প্রকাশ অথবা ক্রিয়া স্বীকার করে নাই।

সভ্যতার এই একনীতিবর্ত্তিতা সাহিত্য বা অন্যান্য মানস সৃষ্টির উপরেও একটা বিশেষ ছাপ দিয়াছে। ইউরোপের সর্ব্বত্রই আজকাল ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের যে সকল নিদর্শন ছড়াইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত হইয়াছেন। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সেগুলি সব এক ছাঁচে ঢালা, সেগুলি যেন সব এক তথ্যের পরিণতি, এক ভাবের প্রকাশ। ধর্ম্মগ্রন্থ বল, ঐতিহাসিক কিংবদন্তী বল, নাটক মহাকাব্য বল, সর্ব্বত্রই এক প্রকৃতির ছাপ। ঐতিহাসিক ঘটনা ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে বৈচিত্র্যহীনতা, যে প্রকৃতিসাম্য, মানস সৃষ্টির মধ্যেও তাহারই ছাপ। শুধু ভারতে নয়, মানববুদ্ধির শ্রেষ্ঠ সম্পদের ভাণ্ডার যে গ্রীস, সেই গ্রীসদেশেও সাহিত্য ও কলারাজ্যে এই একাকারের রাজত্ব।

আধুনিক ইউরোপের সভ্যতা এই বিষয়ে প্রাচীন সভ্যতার ঠিক বিপরীত। সাধারণ ভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, এই সভ্যতার প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়, জটিল, বিক্ষুব্ধ। ইহার মধ্যে সকল প্রকারের সমাজনীতি, সকল প্রকারের সমাজগঠন একত্র পাশাপাশি রহিয়াছে। অপার্থিব ও পার্থিব শক্তি—যাজকতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও জনতন্ত্র—সকল প্রকার শাসনতন্ত্রের উপাদান; এবং রাষ্ট্রশরীর ও সমাজ-শরীরের সকল প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে। স্বাধীনতা, অর্থসম্পদ্ ও সামাজিক প্রতিপত্তির সর্ব্ববিধ স্তর ইহার মধ্যে পাশাপাশি রহিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন শক্তি অনবরত পরস্পরের বিরুদ্ধে বল পরীক্ষা করিতেছে, কিন্তু কেহই অন্যগুলিকে নিঃশেষে দলন করিতে পারিতেছে না, কেহই সমাজের উপর, রাষ্ট্রের উপর নিজের একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেছে না। প্রাচীন কালে প্রত্যেক যুগেই সমস্ত সমাজ যেন এক ছাঁচে ঢালা ছিল। কখনও বা বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র, কখনও বা বিশুদ্ধ যাজকতন্ত্র, কখনও বা বিশুদ্ধ জনতন্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে, কিন্তু সেই সেই কালে সেই সেই তন্ত্রের সম্পূর্ণ আধিপত্য। আধুনিক ইউরোপ সকল প্রকার সমাজ-ব্যবস্থার, সমাজগঠনের সকল প্রকার নূতন প্রচেষ্টার নিদর্শন লইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত। এখানে বিশুদ্ধ বা মিশ্র রাজতন্ত্র, যাজক-তন্ত্র, অল্পবিস্তর আভিজাত্যপ্রমুখ জনতন্ত্র, সকল প্রকার শাসন-ব্যবস্থাই এককালে পাশাপাশি সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। অথচ তাহাদের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে একটা পারিবারিক সাদৃশ্য লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না।

আধুনিক ইউরোপের চিন্তা ও ভাবরাজ্যেও সেই বৈচিত্র্য, সেই সংঘর্ষ। যাজক-তন্ত্রবাদ, রাজতন্ত্রবাদ, অভিজাততন্ত্রবাদ, জনতন্ত্রবাদ,

এই সকল বিভিন্ন মত ও বিশ্বাস পরস্পরকে খণ্ডন করিতেছে, পরস্পরকে হঠাইতে চেষ্টা করিতেছে, পরস্পরের স্বচ্ছন্দবিকাশে বাধা দিতেছে এবং পরস্পরের রূপান্তর সাধন করিতেছে। মধ্যযুগের লেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসঙ্কোচ ও স্পষ্টবাদী, তাঁহাদের লেখা পড়িয়া দেখুন ; কোথাও দেখিবেন না যে, কোন একটি ভাব বা চিন্তাকে তাহার চরম পরিণতি পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। যিনি স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ্যশাসনের একান্ত পক্ষপাতী, তিনিও সহসা স্বকীয় মতবাদের চরম ফলাফল বিবেচনা করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়ান। তাঁহার চারি দিকে যে আরও পাঁচ রকমের চিন্তাপ্রণালী, আরও পাঁচ রকমের ভাবসমষ্টি সমাজের মধ্যে মাথা তুলিয়া আছে, সে দিকে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারেন না। কাজেই তাঁহার চিন্তাস্রোতের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাঁহার ভাবস্রোত আতিশয্যে পৌঁছিতে পায় না। আবার যাঁহারা জনতন্ত্রের পক্ষপাতী, তাঁহারাও সেই এক নিয়মের বশবর্ত্তী। প্রাচীন সাহিত্য দর্শনে দেখা যায়, এক একটি মতবাদ নিঃসঙ্কোচে কোনও দিকে না তাকাইয়া অনুকূল যুক্তি দ্বারা পথঘাট বাঁধিয়া একেবারে তাহার চরম পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বিরুদ্ধ মতবাদের অস্তিত্বই সে স্বীকার করে না, নানা বিরোধী মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য সে নিজেকে কখনও খর্ব্ব করে নাই। মধ্যযুগের ইউরোপের চিন্তারাজ্যে এইরূপ নিঃসঙ্কোচ একদেশদর্শিতা ও একমুখী গতি কুত্রাপি দেখা যায় না। চিন্তার রাজ্যে যেরূপ, ভাবরাজ্যেও এই উভয় যুগের মধ্যে সেই একরূপ পার্থক্য। মধ্যযুগের ইউরোপে একদিকে যেমন দেখা যায় প্রবল স্বাতন্ত্র্যানুরাগ, অপর দিকে তেমনি তাহার পার্শ্বেই সহজস্বীকৃত কুণ্ঠালেশহীন শাসনবশ্যতা ; একদিকে অসাধারণ প্রভুভক্তি, অসাধারণ রাজভক্তি, অপর দিকে সমস্ত

বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অপর কাহারও দিকে না তাকাইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে নিজের ইচ্ছাশক্তি খাটাইবার জন্য অদম্য বাসনা। সমাজে যে বৈচিত্র্য ও বিক্ষোভ, মানুষের ভাবরাজ্যেও সেই বৈচিত্র্য ও বিক্ষোভ।

রসসাহিত্যক্ষেত্রেও সেই এক প্রকৃতির ছাপ। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, শিল্পকলা ও সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া মধ্যযুগের সাহিত্য ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু ভাব ও চিন্তার গভীরতার দিক্ দিয়া এই আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্য অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিসম্পদ্‌শালী। মানবাত্মা এখন নানা বিভিন্ন দিক্ দিয়া এবং গভীরতর স্তর পর্য্যন্ত নাড়া পাইয়াছে। এবং এই কারণেই এই যুগে শিল্পগঠনে পারিপাট্যের অসম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে। কারণ, শিল্পের উপাদান যত বিচিত্র, যত অপূর্ব্ব, যত সংখ্যায় অধিক হইবে, সেই উপাদানগুলিকে একত্র সংহত করিয়া বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল শিল্পাবয়বে পরিণত করা তত কঠিন হইবে। যে যে গুণে শিল্পসৃষ্টির সৌন্দর্য্য সাধিত হয়, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে, সুস্পষ্টতা, সরলতা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত গঠনভঙ্গীর মধ্যে ভাবদ্যোতনামূলক একাত্মতা। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার অসাধারণ ভাববৈচিত্র্য ও চিন্তা-বৈচিত্র্যের দরুন এই সরলতা ও প্রাঞ্জলতা সাধন করা শিল্পের পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।

তাহা হইলে দেখা গেল, আধুনিক সভ্যতার এই প্রধান বিশেষত্ব কি ভাবরাজ্যে, কি চিন্তারাজ্যে, কি সাহিত্যক্ষেত্রে, কি শিল্পক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই ফুটিয়া রহিয়াছে। অবশ্য শিল্প বা সাহিত্যের এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মানবাত্মার বিশেষ বিশেষ বিকাশ পৃথক্ করিয়া আলোচনা করিলে, আমরা সাধারণতঃ দেখি যে, ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রাচীন অপেক্ষা আধুনিক শিল্পসাহিত্য নিকৃষ্ট। কিন্তু অন্য দিকে যদি

আমরা সমষ্টিভাবে বিচার করি, তাহা হইলে দেখিব, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা অন্য যে কোন সভ্যতা অপেক্ষা তুলনাতীতরূপে সম্পদ্‌শালী ; কারণ, ইহার মধ্যে একই সময়ে নানা বিচিত্র দিক্ দিয়া মানবাত্মা বিকাশ ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ফলে আপনারা দেখিতেছেন যে, যদিও এই সভ্যতা পঞ্চদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি ইহা এখনও ক্রমোন্নতিশীল। এ সভ্যতা গ্রীকসভ্যতার মত রাতারাতি বাড়িয়া উঠে নাই সত্য, কিন্তু ইহার উন্নতির বেগ কখনও রুদ্ধ হয় নাই। তাহার সম্মুখে ভবিষ্য জগতে যে বিশাল লীলাক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার আভাস পাইয়া সে দিনে দিনে নূতন উদ্যমে দ্রুততর বেগে অগ্রসর হইতেছে ; কারণ, সে ক্রমশঃই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে। অন্যান্য সভ্যতায় এক মূলনীতির, এক ছাঁচের প্রাধান্য বা একাধিপত্যের ফলে যেমন স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ক্রিয়া স্ফূর্ত্তি পায় নাই, আধুনিক ইউরোপে তেমনি সমাজব্যবস্থায় নানা বিরোধী শক্তি, নানা বিভিন্ন জাতি, নানা বিভিন্ন শ্রেণীর একত্র অবস্থানের দরুন বর্ত্তমান কালের স্বাধীনতা জন্মলাভ করিয়াছে। কারণ, এই সকল পরস্পরবিরোধী শক্তি কেহ কাহাকে একেবারে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই। এবং কেহ কাহাকে নির্ম্মূল করিয়া উৎসাদিত করিতে পারে নাই বলিয়াই নানা বিভিন্ন মত, নানা বিভিন্ন চিন্তাসূত্র, নানা বিভিন্ন ভাবসূত্র বাধ্য হইয়া পরস্পরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, সে একটা বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের ভার লইবে। সুতরাং অন্য সর্ব্বত্রই যেখানে একনীতির আধিপত্যের দরুন দণ্ডমূলক শাসনের প্রাধান্য হইয়াছে, আধুনিক ইউরোপে সেখানে সভ্যতার উপাদান-বৈচিত্র্যের ফলে এবং এই সকল উপাদানের নিয়ত সংঘর্ষ ও

বিরোধের ফলে উৎপন্ন হইল ইউরোপীয় স্বাধীনতা। ইহাই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষ মহত্ত্ব।

ইহারই দরুন সে অন্যান্য সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। এ দাবী যে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। একবার ইউরোপীয় সভ্যতার কথা ভুলিয়া গিয়া, সাধারণ ভাবে জগৎপ্রকৃতির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখুন। জগৎ কি নিয়মে চলিতেছে? সেও কি ঠিক এইরূপ উপাদানবৈচিত্র্য লইয়া নানা বিচিত্র শক্তির সংঘর্ষের মধ্য দিয়া চলিতেছে না? বাস্তবিক পক্ষে এই জগৎপ্রকৃতির মধ্যেও কোন একটি তত্ত্ব, কোন একটি নিয়মশৃঙ্খলা, কোন একটী ভাব, কোন একটি বিশেষ শক্তি, অন্য সমস্ত শক্তির প্রভাব বিনষ্ট করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই।

নানা বিচিত্র শক্তি, নানা বিচিত্র তত্ত্ব, নানা বিচিত্র পদ্ধতি, পরস্পরের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, পরস্পরকে খর্ব্ব করিতেছে, পরস্পরের সঙ্গে অনবরত লড়াই করিতেছে; কখনও একটি, কখনও বা অন্যটি প্রাধান্য লাভ করিতেছে, কিন্তু কেহ কখনও সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইতেছে না, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইতেছে না। এই বিশাল জগদ্ব্যাপারের গতি অবশ্য একটা সামঞ্জস্যের দিকে, একটা একীকরণের দিকে। সে সামঞ্জস্য, সে আদর্শে হয় ত কখনও উপনীত হওয়া যাইবে না, কিন্তু মানবজাতি স্বাধীন চেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাই যদি জগতের সাধারণ প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিশাল জগৎপ্রকৃতির যথার্থ প্রতিকৃতি বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা নাই, একদেশবর্ত্তিতা নাই, স্থাবরতা নাই। আমার বিশ্বাস, জগতের ইতিহাসে এই প্রথম

সভ্যতা হইতে বিশেষত্বের ছাপ মুছিয়া গিয়াছে, মানব-সভ্যতা এই প্রথম বিশাল বিশ্বনাট্যের মতই বিচিত্র উপাদান লইয়া, বিচিত্র সম্পদে সম্পন্ন হইয়া, বিচিত্র সংঘর্ষের মধ্য হইতে বলসঞ্চয় করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এ কথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপীয় সভ্যতা সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশ্য অনুসারে অগ্রসর হইতেছে। ইহাই হইল ইহার শ্রেষ্ঠতার যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত পরিমাপ।

আমি চাই যে, আপনারা বরাবর ইউরোপীয় সভ্যতার এই মৌলিক বিশিষ্টতার কথা মনে করিয়া রাখিবেন। আপাততঃ আমি কেবল কথাটি বলিয়া রাখিলাম। পরে ঘটনাপরম্পরার বিবৃতি ও অভিব্যক্তি দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইবে। তথাপি, যদি আমি দেখাইতে পারি যে, এই সভ্যতার শৈশবাবস্থাতেই এই বিশিষ্টতার মূল কারণ ও উপাদানসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে; যদি ইহার জন্মকালে, রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনমুহূর্ত্তে, জগতের তৎকালীন অবস্থার মধ্যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল ঘটনার সমন্বয়ে ইউরোপীয় সভ্যতা গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যেই, এই বিক্ষোভ, এই বৈচিত্র্য, এই বহুমুখীনতার লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমার মূলসূত্রের যে এটা একটা প্রবল সমর্থন হইবে, তাহা অবশ্য আপনারা স্বীকার করিবেন। আমি এখন এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে আমি রোমীয় সাম্রাজ্যের অবসানযুগে ইউরোপের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব, এবং নানা প্রথা, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, ভাব ও চিন্তা হইতে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব যে, প্রাচীন জগৎ বর্ত্তমান জগৎকে কি কি উপাদান দান করিয়া গেল। যদি এই উপাদানের মধ্যেই আপনারা দেখিতে পান যে,

ইউরোপীয় সভ্যতার পূর্ব্বোক্ত বিশেষ প্রকৃতির ছাপ রহিয়াছে; তাহা হইলে আপনাদিগের নিকট আমার প্রদত্ত পরিচয় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না।

প্রথমে আমাদের স্পষ্টরূপে ধারণা করা দরকার যে, রোমীয় সাম্রাজ্যের যথার্থ স্বরূপ কি এবং কেমন করিয়াই বা ইহা গঠিত হইল।

রোম মূলতঃ ছিল একটি মিউনিসিপালিটি অর্থাৎ পৌর সঙ্ঘ। মাত্র একটি প্রাচীরবেষ্টিত নগরের অধিবাসিবর্গের উপযোগী রীতিনীতি প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি হইল রোমের শাসনতন্ত্র। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্তই হইল পৌর প্রতিষ্ঠান, ইহাই তাহাদের বিশিষ্ট প্রকৃতি। এ কথা যে শুধু রোমের পক্ষে খাটে, তাহা নয়। যদি আমরা তদানীন্তন ইটালীর দিকে তাকাই, তাহা হইলে রোমের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি নগর ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। তখন জনসঙ্ঘ বা জাতি বলিলে বুঝাইত কেবলমাত্র কতকগুলি নগরের, কতকগুলি পৌরতন্ত্রের সমবায়। লাটিন জাতি ছিল কতকগুলি লাটিন নগরের সমবায়। সেইরূপ, ইট্রস্কান (Etruscan) জাতি, সাম্‌নাইট (Samnite) জাতি, সেবাইন (Sabine) জাতি, বৃহত্তর গ্রীসের (Graecia Magna) অধিবাসিবৃন্দ, সকলের পক্ষেই ঐ এক বর্ণনা প্রযোজ্য।

তখন সহরের বাহিরে দেশ বলিয়া কোন ব্যাপার ছিল না। অবশ্য ভূমি ছিল, এবং ভূমিতে চাষ আবাদও হইত, কিন্তু এখনকার মত পল্লীজনপদ ছিল না, পল্লীসমাজ ছিল না। ভূম্যধিকারিগণ নগরবাসী ছিলেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে স্ব স্ব ভূমি সম্পত্তি পরিদর্শন করিতে বাহির হইতেন, এবং সঙ্গে কতকগুলি ক্রীতদাস লইয়া যাইতেন। কিন্তু আমরা এখন পল্লীভূমি বলিতে যাহা বুঝি অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়িয়া

এক একটি গ্রাম বা পল্লীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকসমষ্টির বাস, এ ব্যাপার প্রাচীন ইটালীতে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। রোমীয় রাষ্ট্র যখন ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন সে কি করিল ? ইতিহাস অনুধাবন করিয়া দেখ, দেখিবে, সে হয় নূতন নূতন নগর জয় করিয়া লইল, না হয় নূতন নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিল। বিভিন্ন নগরের সহিতই সে যুদ্ধ করিয়াছে, বিভিন্ন নগরের সহিতই সে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে এবং বিভিন্ন নগরেই সে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। রোমের জগদ্বিজয়ের ইতিহাস নগরবিজয় ও নগরপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। প্রাচ্যদেশে অবশ্য রোমের সাম্রাজ্যবিস্তার ঠিক একেবারে এই প্রণালীতে সম্পন্ন হয় নাই। সেখানে জনসঙ্ঘ ইউরোপীয় জনসংঘের মত ভিন্ন ভিন্ন নগরচক্রে ঝাঁক বাঁধিয়া থাকিত না। কিন্তু আমরা যখন কেবল এখানে ইউরোপীয় লোকসমষ্টির কথাই আলোচনা করিতেছি, তখন প্রাচ্যদেশে কি ঘটিয়াছিল, তাহা লইয়া আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই।

প্রতীচ্য ভূভাগের সর্ব্বত্রই কিন্তু আমরা পূর্ব্বোক্ত তথ্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হই। গলে (Gaul) বলুন, স্পেনে (Spain) বলুন, আমরা কেবল সহরের কথাই শুনিতে পাই। সহরের বাহিরে একটু দূরে যাইলেই সমগ্র দেশ জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রোমীয় স্থাপত্য কীর্ত্তি, রোমের রাজপথগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করুন। দেখিবেন, কতকগুলি বড় বড় রাজপথ নগর হইতে নগরান্তরে গিয়া পৌছিয়াছে। আজকাল পল্লীখণ্ডে যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ পরস্পরকে কাটিয়া সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া রহিয়াছে, তখন তাহা দেখা যাইত না। মধ্যযুগ হইতে এ পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র যে অগণিত গ্রাম, পল্লী আবাস, উপাসনা-মন্দির ছড়াইয়া গিয়াছে, রোমীয় যুগে তাহার কিছুই ছিল না। রোম কেবল আমাদিগের জন্য কতকগুলি বিপুল পৌরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে।

রোমীয় স্থাপত্যকীর্ত্তিমাত্রই পৌরকীর্ত্তি, বহু লোকসমষ্টির উপভোগের জন্য সংগঠিত হইয়াছিল। রোমীয় জগতের যে দিক্ দিয়াই আলোচনা করুন, দেখিবেন, সেই নগরপ্রাধান্য, সেই পৌর আদর্শের একাধিপত্য, এবং সামাজিক হিসাবে পল্লীভূখণ্ডের অস্তিত্বাভাব।

রোমীয় জগতের এই পৌরপ্রকৃতির দরুন রাষ্ট্রীয় বন্ধনের একতা সম্পাদন এবং একতা সংরক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল ; রোমের মত একটি পৌর রাষ্ট্রের পক্ষে জগৎ বিজয় করা যত সহজ হইয়াছিল, বিজিত জগৎ শাসন করা ও তন্মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করা তদপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন হইয়াছিল। তাই যেমনি রাষ্ট্রবিস্তারকার্য্য সম্পূর্ণ হইল, সমগ্র প্রতীচ্যখণ্ড ও প্রাচ্যখণ্ডের অনেকখানি রোমীয় শাসনের অধীন হইয়া পড়িল, অমনি সাম্রাজ্যভুক্ত সেই ছোট বড় সংখ্যাতীত পৌর রাষ্ট্রগুলি (যাহারা নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্যই গঠিত হইয়াছিল) চারিদিকে বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। কাজেই এমন একটি শাসনতন্ত্রের আবশ্যক হইয়া পড়িল, যাহাতে নানা বিচ্ছিন্ন উপাদান একত্র বাঁধিয়া রাখিতে পারে, নানা বিকীর্ণ শক্তিপুঞ্জ এক কেন্দ্র হইতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতে পারে। সাম্রাজ্যতন্ত্র যে রোমের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল, ইহাই হইল তাহার অন্যতম কারণ। সাম্রাজ্যতন্ত্র এই বিচ্ছিন্ন বিকীর্ণ সমাজের মধ্যে একতা ও সংযোগ সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিছুদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। অগষ্টস্ ও ডাইওক্লিশিয়ানের রাজত্বের অন্তর্ব্বর্ত্তী কালেই, পৌরব্যবস্থা প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই রোমীয় জগৎ ব্যাপিয়া একটি সুবিশাল ঐককেন্দ্রিক শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সমগ্র সাম্রাজ্য জালের মত ঘিরিয়া কতকগুলি ক্রমপরম্পরাবিন্যস্ত, পরস্পরসম্বদ্ধ এবং সাম্রাজ্যকেন্দ্রের সহিত দৃঢ়শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজপুরুষ বসান হইল। তাহাদের একমাত্র কাজ হইল, সমাজের মধ্যে

রাজশক্তির ইচ্ছাকে ফলবতী করা, সমাজের উদ্যম, সমাজের সম্পদ্ রাজশক্তির হস্তে তুলিয়া দেওয়া।

এই ব্যবস্থা যে শুধু রোমীয় জগতের নানা বিচ্ছিন্ন শক্তি, নানা বিচিত্র উপাদান একত্র করিয়া ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা নয়, উপরন্তু জনসাধারণের মনে অতি সহজে ও অনায়াসেই যথেচ্ছতন্ত্র কেন্দ্রশক্তির ভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই ক্ষীণসূত্রে মিলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে, এই পৌররাষ্ট্রসমষ্টির মধ্যে কেমন করিয়া যে এত শীঘ্র পূতগরিমামণ্ডিত একমাত্র সম্রাট্‌মহিমার প্রতি এমন একটা অচলা ভক্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিল, তাহা বিস্ময়ের ব্যাপার। রোমীয় জগতের নানা বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে একটা একতাবন্ধন আনার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই খুব প্রবলভাবে অনুভূত হইয়াছিল, নচেৎ কেমন করিয়া এত সহজে এই স্বেচ্ছাতন্ত্রনীতি জনবৃন্দের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইল?

জনসাধারণের এই বিশ্বাসের সাহায্যে, প্রকাণ্ড একটা জালের মত বিস্তৃত এই শাসন-যন্ত্রের সাহায্যে এবং তৎসহযোগী সামরিক ব্যবস্থার সাহায্যে, রোমীয় সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ প্রলয়ের বিরুদ্ধে এবং বাহির হইতে বর্ব্বর-আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে লাগিল। এইরূপে সে অনেক দিন ধরিয়া জরাগ্রস্ত হইয়াও, লড়াই করিয়া করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এমনি একটা মুহূর্ত্ত আসিল, যখন আর লড়াই করা চলিল না, প্রলয়শক্তিরই জয় হইল। স্বেচ্ছাতন্ত্রনীতির শাসনকৌশল, দাসভাবাপন্ন প্রজাবৃন্দের ঔদাসীন্য, কিছুতেই আর এই বিপুলকায় শাসনযন্ত্রটিকে টিকাইয়া রাখিতে পারিল না। চতুর্থ শতাব্দীতে সর্ব্বত্রই রোমীয় সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন বিখণ্ডিত হইয়া পড়িল। বর্ব্বরগণ চারিদিক্ হইতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল। বিজিত প্রদেশগুলি আর

কোন বাধা দিল না; তাহারা সাম্রাজ্যের ভাগ্যে কি হইল, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া নিশ্চেষ্ট রহিল। এই সময়ে, কোন কোন সম্রাটের মনে এক নূতন কল্পনার উদ্রেক হইল। তাঁহারা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিলেন যে, স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনপ্রণালী অপেক্ষা জনসাধারণকে স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়া রোমীয় সাম্রাজ্যের একত্বরক্ষা করার বেশী সুবিধা হয় কি না। অর্থাৎ আজকাল যেমন রাষ্ট্রভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিসঙ্ঘের দ্বারাই শাসন-কার্য্য পরিচালিত হয়, সেইরূপ কোন একটা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া দেখিতে চাহিলেন। ৪১৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হনোরিয়স (Honorius) ও কনিষ্ঠ থিওডোসিয়স্ গলপ্রদেশের (Gaul) শাসনকর্ত্তা এগ্রিকোলার নিকট একটি আদেশপত্র পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, গল্‌প্রদেশের দক্ষিণাংশে একপ্রকার জনপ্রতিনিধিচালিত শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা; এবং ইহার সাহায্যে সাম্রাজ্যের একত্ব বজায় রাখা। নিম্নে এই আদেশপত্রের মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

"আপনি যে সন্তোষজনক মন্তব্য দিয়াছেন, তদনুসারে নিম্নোক্ত আদেশগুলি আইনস্বরূপ জারী করিতেছি। আপনার শাসনভুক্ত সাতটি প্রদেশ এই আইনের দ্বারা বাধ্য থাকিবে। আইনগুলি এমন যে, প্রজাবর্গ নিজেরাই এরূপ বিধি আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা করিতে পারিত। দেখা যায় যে, প্রত্যেক প্রদেশ হইতে, এমন কি, প্রত্যেক নগর হইতে অনেক কর্ম্মচারী অথবা বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধি, হিসাব নিকাশ দিবার জন্য অথবা ভূম্যধিকারিবর্গের স্বার্থসম্পর্কিত নানা বিষয়ে আপনার সহিত আলোচনা করিবার জন্য অনেক সময় আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা স্থির করিয়াছি, এ বৎসর হইতে বৎসরে একবার করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজধানী আর্ল্ (Arles) নগরে উপরোক্ত সাতটি প্রদেশের অধিবাসিবর্গের একটি

সম্মিলন আহ্বান করিলে অনেক উপকার হয় এবং ব্যবস্থাটী সময়োচিত হয়। এই ব্যবস্থায় আমরা সাধারণের স্বার্থ ও বিশেষ বিশেষ পক্ষের স্বার্থ, উভয় দিকেই সমান দৃষ্টি দিয়াছি। প্রথমতঃ শাসনকর্ত্তার সম্মুখে দেশের প্রধান প্রধান অধিবাসিবর্গের একত্র সম্মিলনের দরুন প্রত্যেক আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য পাওয়া যাইবে। এই সম্মিলনে যাহা কিছু আলোচনা বা মীমাংসা হইবে, তাহা বিভিন্ন প্রদেশে কাহারও অবিদিত থাকিবে না। এবং যাঁহারা ঐ সম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না, তাঁহারাও সম্মিলনপ্রণীত ন্যায়বিধি দ্বারা বাধ্য থাকিবেন। উপরন্তু আর্ল্ নগরে এই বার্ষিক সম্মিলনের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আমরা এমন একটী ব্যবস্থা করিলাম, যাহাতে সাধারণেরও লাভ হয় এবং সামাজিকতারও বৃদ্ধি ও প্রসার হয়। বাস্তবিক পক্ষে, নগরটি এমন সুন্দর ভাবে অবস্থিত যে, দলে দলে বিদেশীয়গণ এখানে সমাগত হয়, এবং অন্যান্য স্থানে যাহা কিছু উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়, সমস্তই এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কি বিপুল ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত প্রাচ্যখণ্ড, কি সুগন্ধবিস্তারী আরবমরু, কি সূক্ষ্মকারুকুশল আসীরিয়া, কি উর্ব্বর আফ্রিকা, কি সুন্দর স্পেন, কি বীরপ্রসূ গল্—যেখানে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা এই আর্লনগরীতে এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে, সেগুলিকে এইখানকার ক্ষেত্রেই উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ রোন্ নদীর সহিত টস্কান্ সমুদ্রের যোগ থাকায় উভয়ের তীরবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশই পরস্পরের প্রতিবেশীস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব যখন সমগ্র পৃথিবী আপনার শ্রেষ্ঠ দ্রব্যসম্ভার আনিয়া এই নগরের চরণে ঢালিয়া দিতেছে, যখন সকল দেশের বিশেষ বিশেষ দ্রব্যসামগ্রী স্থলপথে, সমুদ্রপথে, নদীপথে, পালের সাহায্যে, দাঁড়ের সাহায্যে, শকটের সাহায্যে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তখন এরূপ ভোগসমৃদ্ধিশালী, বাণিজ্যকুশল ভগবচ্চিহ্নিত

নগরে এই জনসম্মিলন আহ্বান করিবার জন্য এই যে আদেশ দিতেছি, ইহাতে গল্ মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিরূপে দেখিতে পায়?

পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তা পেট্রোনিয়স্ সাধু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া পূর্ব্বে আদেশ করিয়াছিলেন যে, এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী কালের বিপ্লব ও অনধিকারিগণকর্ত্তৃক রাজ্যাধিকারের দরুন প্রথাটি উঠিয়া যাওয়ায় আমরা ইহাকে পুনরায় নূতন উদ্যমের সহিত উজ্জীবিত করিতে সংকল্প করিয়াছি। অতএব হে প্রিয় ভ্রাতঃ এগ্রিকোলা, আপনি এই আদেশ অনুসারে, এবং আপনার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুসারে, আপনার শাসনাধীন প্রদেশসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত নিয়মগুলি পালন করাইবেন।

যাবতীয় রাজকর্ম্মাধিকারী, পৌরকর্ম্মাধিকারী, ভূম্যধিকারী এবং বিভিন্ন প্রদেশের বিচারাধিকারী সকলকে বিদিত করা যাইতেছে যে, প্রতি বৎসর আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে তাঁহারা আর্ল্‌নগরীতে সম্মিলিত হইয়া অধিবেশন করিবেন। অধিবেশনের তারিখ তাঁহারা ইচ্ছামত ধার্য্য করিবেন।

নোবেম্ পপুলিনিয়া ও দ্বিতীয় আকুইতেন, এই দুই সুদূরবর্ত্তী প্রদেশের বিচারক-বর্গ অত্যাবশ্যক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে, যথারীতি প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন।

যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে অবহেলা করিবেন, তাঁহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। বিচারকদিগের পক্ষে এই অর্থদণ্ডের পরিমাণ পাঁচ সুবর্ণমুদ্রা এবং পৌরসঙ্ঘের (Curia) পারিষদদিগের ও অন্যান্য উচ্চপদধারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে তিন সুবর্ণ-মুদ্রা হইবে।

আমরা এই উপায়ে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিবর্গের প্রভূত কল্যাণ-

সাধন করিতে চাই। আমাদের ইহাও স্থির বিশ্বাস যে, এই উপায়ে আর্ল্‌নগরীও শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে।"

রাজাজ্ঞা যথানিয়মে প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু যাহাদের উপকারের জন্য এই ব্যবস্থা, সেই প্রদেশ ও সেই নগরগুলি কিন্তু এ দান গ্রহণ করিল না। কেহই প্রতিনিধি পাঠায় না, কেহই আর্ল্‌ যাইতে প্রস্তুত নয়। সেই আদিম অনভিব্যক্ত সমাজের পক্ষে এই সার্ব্বজনীন কেন্দ্রীকরণ ও একীকরণের আদর্শ সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। স্থানীয় ভাব, পৌর ভাব, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বদান্যতার ভাব পুনরায় জাগিয়া উঠিল; সুতরাং একটা সার্ব্বজনীন রাষ্ট্রীয় সমাজ বা দেশ বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, তাহা পুনরায় গড়িয়া তোলা অসম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন নগর আপন আপন প্রাচীরবেষ্টনের মধ্যে নিজকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিল। এবং সাম্রাজ্যের পতন হইল; কারণ, কেহই নিজকে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করিতে চাহিল না, পৌর জনবর্গ কেবল আপন আপন পুরীর অঙ্গ হইয়া থাকিতে চাহিল। অতএব রোমীয় সাম্রাজ্যের শৈশবে যেরূপ, পতনকালেও সেইরূপ পৌরভাব ও পৌর আদর্শের প্রাধান্য দেখিতে পাই। রোমীয় জগৎ পুনরায় তাহার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিল। পুরসমষ্টি লইয়াই এই জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল; সাম্রাজ্যের পতন হইল, কিন্তু পৌররাষ্ট্রগুলি রহিয়া গেল।

প্রাচীন রোমীয় সভ্যতা আমাদিগকে এই পৌরতন্ত্রপদ্ধতি দান করিয়া গিয়াছে। অবশ্য রোমীয় সভ্যতার অবসানযুগে এই পদ্ধতির অনেক অবনতি ঘটিয়াছিল; কিন্তু তথাপি রোমীয় জগতের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উপাদানের বিলয় প্রাপ্তির পর ইহাই একমাত্র যথার্থ ও একমাত্র সুগঠিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া টিকিয়া গেল।

একমাত্র বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে। কারণ, আরও একটি বস্তু, আরও একটি আদর্শ সঙ্গে সঙ্গে টিকিয়া গেল। সেটী হইল সাম্রাজ্যের কল্পনা, সম্রাট্ নামের মোহিনী শক্তি, এক দেবমহিমামণ্ডিত স্বেচ্ছাতন্ত্র বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্‌শক্তির আদর্শ।

এই দুইটি বস্তু রোমীয় সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতাকে দান করিয়া গেল—একদিকে পৌররাষ্ট্রতন্ত্র এবং তাহার আনুষঙ্গিক রীতি-নীতি প্রথা ও স্বাতন্ত্র্যনীতি; অন্য দিকে এক বিশ্বব্যাপী একাকার ব্যবহারবিধিসমষ্টি, স্বেচ্ছাতন্ত্র শক্তির আদর্শ, দৈবমহিমান্বিত রাজশক্তির আদর্শ, সাম্রাজ্যের আদর্শ, শৃঙ্খলাবন্ধন ও বশীকরণ-নীতি।

কিন্তু ঐ সময়েই রোমীয় সমাজের মর্ম্মস্থলেই আর এক প্রকার সমাজ গড়িয়া উঠিল। এ সমাজের প্রকৃতি ও মূলনীতি অন্যরূপ। ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন ভাবসমষ্টির দ্বারা সঞ্জীবিত। আমি খৃষ্টীয় ধর্ম্মসঙ্ঘের বা চর্চ্চের কথা বলিতেছি। মনে রাখিবেন, আমি খৃষ্টধর্ম্মের কথা বলিতেছি না, খৃষ্টীয় চর্চ্চের কথা বলিতেছি—খৃষ্টীয় সমাজের ধর্ম্মশাসনপ্রতিষ্ঠানের কথা বলিতেছি। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টধর্ম্ম আর কেবল ভিন্ন ভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত মত বা বিশ্বাসের বিষয় ছিল না, ইহা তখন একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, ইহা তখন গঠনপ্রাপ্ত হইয়াছে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে; ইহার তখন একটা ধর্ম্মশাসনপদ্ধতি দাঁড়াইয়াছে, যাজকসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকার্য্যের জন্য যাজকবৃন্দের ক্রমবন্ধন ও শ্রেণীবিন্যাস হইয়াছে, আর্থিক আয় সংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে, স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার নানা উপায় আয়ত্ত হইয়াছে, প্রাদেশিক সঙ্গীতি, জাতীয় সঙ্গীতি, সাধারণ মহাসঙ্গীতি প্রভৃতি বিরাট সমাজবন্ধনের উপযোগী মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এবং সাধারণ সংসদে বিচার বিতর্ক করিবার পদ্ধতি, সংসদে বসিয়া দশজনে মিলিয়া সমাজসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক কথায়, খৃষ্টধর্ম্ম এ যুগে একটা চর্চ্চে অর্থাৎ ধর্ম্মসমাজে পরিণত হইয়াছে।

খৃষ্টধর্ম্ম যদি এই চর্চ্চের আকার প্রাপ্ত না হইত, বলিতে পারি না, তাহা হইলে রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মধ্যে ইহার কি দশা হইত। আমি এখানে কেবল সহজমানববুদ্ধিগোচর বিচারে প্রবৃত্ত। স্বাভাবিক ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতিপ্রণালীর বাহিরে যাহা কিছু, সে সব ব্যাপার আদৌ স্পর্শ না করিয়া আমি বিচার করিতেছি। খৃষ্টধর্ম্ম যদি পূর্ব্ব-পূর্ব্বযুগের মত কেবল একটা মত বা বিশ্বাস বা ভাবসমষ্টি-রূপেই থাকিত, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, ইহা রোমসাম্রাজ্যের বিলয় ও বিদেশী বর্ব্বরদিগের আক্রমণকালে সেই মহাবিপ্লবের মধ্যে কোথায় তলাইয়া যাইত। পরবর্ত্তী যুগে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় এইরূপ এক বহিঃ-শত্রুর আক্রমণের ফলে ইহার রসাতল-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। সেই মুসলমান আক্রমণকালে সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত চর্চ্চ্-আকারে সংহত থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টধর্ম্ম আত্মরক্ষণ করিতে পারে নাই। সুতরাং রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে ঐরূপ ঘটিবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল। সে সময়ে এমন কোন উপায় ছিল না, যাহার সাহায্যে আজকাল প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতিরেকেও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে, বিরুদ্ধশক্তিকে বাধাপ্রদান করে; এমন কোন উপায় ছিল না, যদ্দ্বারা কোন বিশুদ্ধ সত্য বা বিশুদ্ধ আদর্শ মানবসাধারণের মানস রাজ্যে অধিকার বিস্তার করে, মানুষের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে, ঘটনাপরম্পরার স্রোত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। চতুর্থ শতাব্দীতে এমন কিছুই ছিল না, যাহাতে ব্যক্তিগত ভাব, ব্যক্তিগত চিন্তা এইরূপ প্রভাবশালী হইয়া

উঠিতে পারে। ইহা সুস্পষ্ট যে, এমন একটা প্রলয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে একটা প্রবল সুসম্বদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের একান্ত আবশ্যক ছিল। আমার বোধ হয়, যদি বলা যায় যে. চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টীয় চর্চ্চই খৃষ্টধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা হইলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না। রোমসাম্রাজ্যের অন্তিমকালে ও বর্ব্বর-অধিকারের আদিমযুগে ইউরোপীয় সমাজের ভিতরে ভিতরে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল, সেই ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে এক চর্চ্চই তাহার ব্যবস্থান প্রতিষ্ঠান লইয়া, তাহার ধর্ম্মশাসকবৃন্দ লইয়া, তাহার বিরাট শক্তি লইয়া সমাজকে টিকাইয়া রাখিয়াছিল; এবং বিদেশী বর্ব্বরদিগকে আয়ত্তাধীন করিয়া মধ্যস্থস্বরূপ রোমীয় জগৎ ও বর্ব্বর-জগতের মধ্যে একতাস্থাপন করতঃ পরস্পরের মধ্যে শিক্ষাসভ্যতার আদান প্রদানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। অতএব, খৃষ্টধর্ম্ম তখন হইতে আধুনিক সভ্যতাকে কি কি দান করিয়াছে, কি কি নূতন উপাদান আনিয়া দিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে, খৃষ্টধর্ম্মের দিকে তত লক্ষ্য না করিয়া, এই খৃষ্টীয় চর্চ্চের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সে সময়ে খৃষ্টীয় চর্চ্চের স্বরূপ ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল?

শুদ্ধ মানববুদ্ধিগোচর বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, যদি আমরা খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় সমাজের অভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিব, এই সময়ের মধ্যে ইহা তিনটি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে।

একেবারে প্রথম অবস্থায় খৃষ্টীয় সমাজ কেবল মাত্র এক ধর্ম্মবিশ্বাস ও এক ধর্ম্মভাবে মিলিত সম্প্রদায়মাত্র ছিল। এই আদিম খৃষ্টীয় সমাজ কতকগুলি ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাস একত্র পোষণ করিবার জন্য সম্মিলিত

হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোন দৃঢ়বদ্ধ ধর্ম্মবাদ ছিল না, শাসন-পদ্ধতি ছিল না, ধর্ম্মশাসনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যাজকসঙ্ঘ ছিল না।

অবশ্য কোন সম্প্রদায়ই—তা সে যত শিশুই হউক না কেন, তাহার গঠন যতই দুর্ব্বল হউক না কেন,—কোন সম্প্রদায়ই একটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির নেতৃত্ব ভিন্ন টিকিতে পারে না। এই নেতৃ-শক্তি ব্যতীত তাহাকে পরিচালন করিবে কে, তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া রাখিবে কে? আদিমযুগের এই বিভিন্ন খৃষ্টীয় উপাসকসঙ্ঘের মধ্যে এমন লোক অবশ্য ছিলেন, যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, শিক্ষা দিতেন, শাসন করিতেন, কিন্তু কোন সর্ব্বজনমান্য সুনির্দ্দিষ্ট শাসনবিধি ছিল না, বিধিনির্দ্দিষ্ট কোন ধর্ম্মশাস্ত্রও ছিল না। বিশ্বাস ও ভাবের ঐক্যে গ্রথিত একটী শিথিলগ্রন্থি উপাসকসম্প্রদায়মাত্র—এই ছিল খৃষ্টীয় সমাজের আদিম অবস্থা।

যে পরিমাণে খৃষ্টধর্ম্ম দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল ও বিস্তার লাভ করিতে লাগিল, সেই পরিমাণে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট মতবাদ, নিয়মপদ্ধতি, শাসনবিধি ও শাসনকর্ত্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল। এক শ্রেণীর ধর্ম্মশাসকের নাম হইল প্রেস্‌বিটার বা প্রাচীন, তাঁহারাই পরে যাজক বা পুরোহিত হইলেন; আর এক শ্রেণীর নাম হইল এপিস্কোপয় অর্থাৎ পরিদর্শক, তাঁহারা পরে হইলেন বিশপ্; অন্য এক শ্রেণীর নাম হইল ডিয়াকোনয় বা ডিকন্, তাঁহারা দরিদ্র পোষণ ও ভিক্ষা বিতরণের ভার পাইলেন।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ধর্ম্মাধিকারিবর্গের কাহার কি কার্য্য, কাহার কি অধিকার ছিল, তাহা সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করা এখন এক প্রকার অসম্ভব। পরস্পরের অধিকারের সীমারেখা সম্ভবতঃ অস্পষ্ট ও পরিবর্ত্তনশীল ছিল, কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া

উঠিয়াছিল। তথাপি এই দ্বিতীয় যুগের এই একটা বিশেষত্ব ছিল যে, ধর্ম্মশাসনব্যবস্থায় তখন সাধারণ উপাসকবৃন্দেরই প্রাধান্য ছিল। কর্ম্মচারিনিয়োগ, বিধিনিষেধ প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সকল বিষয়েই সাধারণ উপাসকবৃন্দের মতই প্রবল ছিল। চর্চ্চের শাসনব্যবস্থা ও সাধারণ খৃষ্টীয় সমাজ, এ দুইএর মধ্যে তখনও পর্য্যন্ত কোন পার্থক্য ছিল না। পরস্পর পরস্পর হইতে ব্যবহিত বা স্বতন্ত্র ছিল না। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ে তখন সাধারণ জনবর্গের প্রভাবই প্রবল ছিল।

তৃতীয় যুগে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন সাধারণ সমাজ হইতে পৃথক্ একটি যাজকসঙ্ঘ গঠিত হইল। এই যাজকসঙ্ঘের নিজেদের ধনসম্পত্তি ছিল, নিজেদের নির্দ্দিষ্ট এলাকা ছিল, নিজেদের একটা বিশেষ সংগঠনপদ্ধতি ছিল। এক কথায় ইহারা নিজেরাই একটা অন্যনিরপেক্ষ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজে পরিণত হইল। যে বৃহৎ সমাজের সম্পর্কে এই যাজকসঙ্ঘের সৃষ্টি ও স্থিতি, যে সমাজের উপর নেতৃত্ব করিয়া ইঁহাদের প্রসার ও প্রতিপত্তি, সেই সাধারণ খৃষ্টীয় সম্প্রদায় হইতে পৃথক্‌ভাবে ও স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সামর্থ্য ও সঙ্গতি ইঁহারা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই হইল খৃষ্টীয় চর্চ্চের সংগঠনক্রমের তৃতীয় ক্রম। এই আকারেই পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহার আবির্ভাব। রাজশাসনের সঙ্গে প্রজাবৃন্দের যে সমস্ত সম্পর্ক রহিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে; বরং এমন সর্ব্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থা আর কখনও হয় নাই; কিন্তু যেখানে যেখানে যাজকবৃন্দের সহিত উপাসকসম্প্রদায়ের সম্পর্ক, সে সমস্ত বিষয়ে যাজকবৃন্দের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল।

এই সময়ে খৃষ্টীয় যাজকসঙ্ঘের প্রভাববৃদ্ধির আর একটী অন্য প্রকারের কারণ ছিল। বিশপ ও যাজকগণই প্রধান প্রধান পৌর-

কর্ম্মচারী ছিলেন। আপনারা দেখিয়াছেন যে, বাস্তবিকপক্ষে বলিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত রোমীয় সাম্রাজ্যের কেবল এই পৌরশাসনতন্ত্রটুকুই অবশিষ্ট ছিল। সম্রাট্‌দিগের যথেচ্ছ শাসনের উপদ্রবে ও নগরগুলির অধঃপতন হওয়ায়, পৌরসংসদের পারিষদবর্গ নিরাশ ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে নবজীবনসম্পন্ন ও নবোদ্যমে বলীয়ান্ বিশপ্ ও যাজকবৃন্দ স্বভাবতঃই সকল বিষয় পরিদর্শন ও পরিচালন করিতে প্রস্তুত ও অগ্রসর হইলেন। এজন্য তাঁহাদিগকে দোষ দিলে, সমাজের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহারা অনধিকার সত্ত্বেও গ্রাস করিয়াছেন বলিলে অন্যায় হইবে। কারণ, এই ব্যাপার স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হইয়াছিল। কেবল যাজকেরাই তখন নৈতিক বলে বলীয়ান্ ও সজীব ছিলেন, কাজে কাজেই তাঁহারা সকল ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। বিশ্বজগতের এই নিয়ম। তদানীন্তন সম্রাট্‌দিগের সমস্ত বিধিবিধানেই এই পরিণতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। থিওডোসিয়াস্ বা জষ্টি-নিয়ানের বিধিসংহিতা খুলিয়া দেখুন; দেখিবেন, এমন অনেক বিধি আছে, যাহা দ্বারা বিশপ্ ও যাজকদিগের উপর পৌরব্যাপার পরিচালনের ভার দেওয়া হইতেছে। এখানে জষ্টিনিয়ানপ্রবর্ত্তিত কয়েকটী বিধি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) নগরসমূহের বাৎসরিক কার্য্য পরিচালনের জন্য আমরা নিম্নোক্ত বিধান প্রবর্ত্তন করিতেছি। পৌর সম্পত্তির উপস্বত্ব বা দানসূত্রে প্রাপ্ত নগরের যত আয় আছে, তাহার ব্যবস্থা করা; পূর্ত্তকার্য্য; শস্যভাণ্ডার স্থাপন; পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ, স্নানাগার, বন্দর প্রভৃতির পরিরক্ষণ; প্রাচীর ও সেতু নির্ম্মাণ; পৌরব্যাপারসম্পৃক্ত মামলা মোকদ্দমা চালান—এ সমস্ত ব্যাপারই এই পৌর কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। আমরা বিধান করিতেছি যে, বিশপ ও নগরের সর্ব্বোচ্চশ্রেণী হইতে

নির্ব্বাচিত তিনজন লোক একত্র হইয়া একটি সমিতি গঠন করিবেন। তাঁহারা প্রতিবৎসর যে যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবেন; কার্য্যকারকগণ যাহাতে যথারীতি সমস্ত কার্য্য পরিচালন করেন, রীতিমত হিসাবনিকাশ দেন, পৌরকীর্ত্তি, রাজপথ, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার বা অন্যান্য কর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ যাহাতে যথাযুক্তভাবে নিয়োগ করেন, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

(২) ৫০০ সুবর্ণমুদ্রার অনধিক আয়সম্পন্ন নাবালকদিগের অভিভাবক নিয়োগ সম্বন্ধে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অনুমতির অপেক্ষা করিতে হইবে না; কারণ, তাহাতে অনর্থক ব্যয়বাহুল্য হয়। আমরা বিধান করিতেছি যে, এই সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় বিশপ্ ও অন্যান্য পৌরপদধারিবর্গের সহযোগে পৌরশাসনকর্ত্তাই অভিভাবক নিয়োগ করিবেন।

(৩) আমাদের ইচ্ছা—বিশপ্, যাজকবর্গ, ভূস্বামিবর্গ, প্রধানবর্গ ও পৌরসংসদের পারিষদবর্গ একত্র হইয়া পুররক্ষক নির্ব্বাচন ও নিয়োগ করিবেন।

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। সর্ব্বত্রই এক ব্যাপার লক্ষিত হয় যে, রোমীয়দিগের পৌরতন্ত্র ও মধ্যযুগের পৌরতন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থলে যাজকতন্ত্র ও পৌরতন্ত্রের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। প্রাচীন পৌরতন্ত্রে পৌরশাসনকর্ত্তৃগণের প্রাধান্য ছিল; আধুনিক যুগের পৌরতন্ত্রগঠন অন্যবিধ, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলে দেখা যায়, পৌরতন্ত্রে যাজকবর্গের প্রাধান্য।

এখন আপনারা দেখিতে পাইতেছেন যে, খৃষ্টীয় চর্চ্চ কতকপরিমাণে তাহার গঠনপ্রণালীর দরুন, কতকপরিমাণে খৃষ্টীয় জনবৃন্দের উপর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের দরুন এবং কতকপরিমাণে পৌরব্যাপারে

যোগ দেওয়ার দরুন, কি প্রভূত ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিল। এইরূপে খৃষ্টীয় চর্চ্চ এই যুগ হইতেই আধুনিক সভ্যতার বিকাশ সাধনে ও প্রকৃতি সংগঠনে প্রধান সহায় হইয়া চলিল। এখন একবার দেখা যাউক, তখন হইতে খৃষ্টীয় চর্চ্চ কোন্ কোন্ বস্তু, কোন্ কোন্ উপাদান ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

প্রথমতঃ এইটাই একটা পরম লাভ যে, সেই জড়শক্তিপ্লাবিত সমাজের মধ্যে এমন একটা শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল, যাহার প্রভাব ও শক্তি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক—যাহার প্রতিষ্ঠা মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তার রাজ্যে, মানুষের হৃদয়বৃত্তির রাজ্যে। যদি সে সময় খৃষ্টীয় চর্চ্চ না থাকিত, তাহা হইলে সমগ্র জগৎ বিশুদ্ধ জড়শক্তির কবলে নিপতিত হইত। একমাত্র চর্চ্চই কেবল নৈতিক শক্তির আধার ছিল। শুধু তাই নয়, সমস্ত মানববিধানের উর্দ্ধে যে একটা শ্রেষ্ঠতর বিধান আছে, শ্রেষ্ঠতর শাসনপদ্ধতি আছে, এ ধারণাটা চর্চ্চই পোষণ ও প্রচার করিয়াছিল। মানবের মুক্তিসাধনকল্পে, চর্চ্চ এই এক মৌলিক সত্য প্রচার করিল যে, সমস্ত মানববিধানের উর্দ্ধে এমন একটা শাসনবিধি আছে, যাহা যুগভেদে ও প্রথাভেদে কখনও বা বিচারবুদ্ধিসিদ্ধ, কখনও বা বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বলিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু যাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে—আখ্যাভেদ সত্ত্বেও মূলতঃ এক, নিত্য, সনাতন।

এক কথায়, এই ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় ব্যাপার সাধিত হইল, সেটি হইতেছে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক শাসনের পার্থক্যসাধন। এই পার্থক্য হইতেই ধর্ম্মবিবেকের স্বাতন্ত্র্য-সাধন সম্ভব হইল। সুসম্পূর্ণ ও সুবিস্তৃত বিবেকস্বাতন্ত্র্যের মূলে যে তত্ত্ব, এই শাসনপার্থক্যের মূলেও সেই তত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্ব নাই। মানুষের আত্মার উপর, বিশ্বাসের উপর, সত্যের উপর যে জড়শক্তির

ও বাহুবলের কোন প্রভাব বা অধিকার নাই, এই ধারণার উপরই এই শাসনস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা। চিন্তাজগৎ ও কার্য্যজগৎ, বাহ্যব্যাপার ও অন্তর্ব্যাপারের মধ্যে যে প্রভেদ স্থাপিত হইল, তাহা হইতেই ইহার উদ্ভব। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে নৈতিক স্বাধীনতার জন্য ইউরোপ এত যুঝিয়াছে, যে নীতির প্রতিষ্ঠা হইতে এত দীর্ঘকাল লাগিয়াছে, অনেক সময় যাজকসঙ্ঘের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যে নীতি অগ্রসর হইয়াছে, ব্যক্তিগত বিবেকবুদ্ধির সেই স্বাতন্ত্র্য ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবেই ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক শাসনের স্বাতন্ত্র্যনামে উপস্থাপিত হইয়াছিল। এবং চারিদিকে বর্ব্বরপ্রাধান্যের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য খৃষ্টীয় চর্চ্চই এই নীতির প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণ করিয়াছিল।

তাহা হইলে পঞ্চম শতাব্দীতে খৃষ্টীয় চর্চ্চ ইউরোপীয় সমাজের তিনটি মহৎ কল্যাণ সাধন করেন,—(১) সমাজে নৈতিক প্রভাবের প্রতিষ্ঠা, (২) পার্থিব ব্যাপারে বিধাতৃবিহিত শাসননীতির সংরক্ষণ ও (৩) পার্থিব ও অপার্থিব শাসনতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যসাধন। তথাপি এ সময়েও চর্চ্চের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে সমাজস্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। সেই পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই এমন কতকগুলি অকল্যাণকর নীতির আবির্ভাব হইল, ইউরোপীয় সভ্যতার অভিব্যক্তির ইতিহাসে যাহার প্রভাব নিতান্ত অল্প নয়। প্রথমতঃ এই সময়ে চর্চ্চের শাসন-ব্যবস্থায় শাসক ও শাসিতবর্গের মধ্যে একটা পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। শাসনকর্ত্তৃগণ শাসনাধীন জনবৃন্দের সম্পর্কে যাহাতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইতে পারেন, তাঁহারা যাহাতে জনবৃন্দের উপর স্বকীয় বিধান অবাধে চালাইতে পারেন, তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন বুদ্ধির সম্মতিসাপেক্ষ না হইয়া তাহাদের মন প্রাণ অধিকার করিয়া বসিতে পারেন, সেই দিকে চেষ্টা হইতে লাগিল। উপরন্তু চর্চ্চের চেষ্টা হইল—যাহাতে সমাজে যাজকতন্ত্রনীতির প্রাধান্য

স্থাপিত হয়, যাহাতে তাঁহারা পার্থিব শাসনক্ষমতার উপরও স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা সমাজে একেশ্বর হইয়া রাজত্ব করিতে পারেন। এবং চর্চ্চ যখন পার্থিব রাজক্ষমতা করায়ত্ত করিতে, এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে অলক্ষ্য গতিতে যাজকতন্ত্র-নীতির প্রাধান্য স্থাপন করিতে অপারগ হইল, তখন সে পার্থিব রাজবর্গের যথেচ্ছশক্তির ভাগী হইবার নিমিত্ত জনবর্গের স্বাধীনতার হানি করিয়া তাঁহাদের সহিত সহায়তাসূত্রে আবদ্ধ হইল।

পঞ্চম শতাব্দীর ইউরোপ রোমীয় সাম্রাজ্য ও খৃষ্টীয় চর্চ্চের নিকট কি কি সভ্যতাসূত্র লাভ করিল, তাহা এতক্ষণ আলোচনা করা গেল। রোমীয় জগতের এই অবস্থায় টিউটন বর্ব্বরেরা আসিয়া রোমসাম্রাজ্য অধিকার করিল। সুতরাং ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থায় যে যে উপাদান একত্র মিলিত ও মিশ্রিত হইল, তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে এখন কেবল দেখিতে হইবে, এই বর্ব্বর আগন্তুকেরা কি আনিয়া দিল।

মনে রাখিবেন যে, বর্ব্বরদিগের ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, আমরা এখানে ঘটনাপরম্পরার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হই নাই। আপনারা অবশ্য জানেন যে, যে সকল বর্ব্বর জাতি এই সময় রোম-সাম্রাজ্য জয় করিয়া লইল, তাহারা প্রায় সকলেই এক মূল জাতির শাখাপ্রশাখা। আলানাই (Alanai) প্রভৃতি দুই একটী স্লাভনিক জাতি ব্যতীত তাহারা জার্ম্মান। তাহারা সকলেই প্রায় সভ্যতার একই স্তরে উপনীত। তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি রোমীয় জগতের সহিত অল্পবিস্তর সংস্পর্শে আসায় তাহাদের মধ্যে অবশ্য সভ্যতার কিছু তারতম্য ঘটিয়াছিল। যেমন গথ্ জাতি ফ্রাঙ্কদিগের অপেক্ষা নিশ্চয়ই উন্নততর ও শিষ্টতর ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বিচার করিতে হইলে, ইউরোপীয় সভ্যতার উপর প্রভাবের দিক্ দিয়া বিচার

করিতে গেলে, বর্ব্বরদিগের মধ্যে এই তারতম্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বিবেচনা করিতে হয়।

বর্ব্বর সমাজের সাধারণ অবস্থাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা বড়ই কঠিন। রোমীয় পৌরতন্ত্র বা খৃষ্টীয় চর্চ্চের স্বরূপ বুঝিতে আমাদের কোনই কষ্ট হয় না; কারণ, তাহাদের প্রভাব এখনও পর্য্যন্ত চলিতেছে। বর্ত্তমান কালের বহু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, বহু ঘটনার মধ্যে এই প্রভাবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সকল চিহ্ন চিনিয়া বা বুঝিয়া লইবার সহস্র উপায় আছে। কিন্তু বর্ব্বরদিগের রীতিনীতি ও সামাজিক অবস্থা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সেগুলিকে উদ্ধার করিতে হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন অথবা কল্পনার সাহায্য লইতে হয়।

বর্ব্বরপ্রকৃতির যথাযথ স্বরূপ কল্পনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে একটি মূল ভাব, মূল তথ্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সেটী হইতেছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আনন্দ, সংসারের ও জীবনের নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে সতেজে ও স্বাধীনভাবে স্ফূর্ত্তি করিবার আনন্দ—শ্রান্তিবিরহিত কর্ম্মস্ফূর্ত্তির আনন্দ; সংশয়বৈষম্যবিপৎসঙ্কুল জীবনযাত্রার যে আনন্দ, তাহাই বর্ব্বরসমাজের প্রধান ভাব ছিল, এই আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় বর্ব্বরেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর বর্ব্বরদিগের মধ্যে এই ভাব যে কত প্রবল ছিল, তাহা আজকালকার সুনিয়ন্ত্রিত বিধিবদ্ধ সমাজপিঞ্জরের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন।

আমার মতে কেবল মাত্র একখানি গ্রন্থে বর্ব্বর জাতির এই বিশেষ লক্ষণ জীবন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ব্বরধর্ম্মী সমাজে মানুষ যে যে

আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য ও প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়, তাহা একমাত্র তিয়েরী-(Thierry) প্রণীত "নরমান কর্তৃক ইংলণ্ডবিজয়ের ইতিহাস"নামক গ্রন্থেই হোমারসুলভ সজীবতার সহিত উপলব্ধ ও চিত্রিত হইয়াছে। বর্ব্বর-প্রকৃতি ও বর্ব্বরজীবনের এমন সুস্পষ্ট চিত্র আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমেরিকার অসভ্য জাতিদের লইয়া কুপার (Cooper) যে সব উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও কতকটা এই ধরণের জিনিষ পাওয়া যায়; কিন্তু আমার বোধ হয়, সেগুলি তিয়েরীর গ্রন্থের মত এত উৎকৃষ্ট নয়, এত সত্য নয়, এত সরল নয়। আমেরিকার অরণ্যচারী অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে, তাহাদের লোকব্যবহার ও ভাবসমষ্টির মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা কতক পরিমাণে প্রাচীন জার্ম্মানদিগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য এই সকল চিত্র কতক পরিমাণে কবিকল্পনাসুলভ আদর্শ চিত্র মাত্র—বর্ব্বরদিগের আচারসংস্কারের মধ্যে ও জীবনপ্রণালীর মধ্যে যে একটা পাশব ভাব আছে, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থরূপে চিত্রিত হয় নাই। এই সকল আচরণপদ্ধতির ফলে সমাজের মধ্যে যে সকল দোষ সংক্রামিত হইয়াছিল, আমি কেবল তাহার কথা বলিতেছি না—স্বতন্ত্র-ভাবে প্রত্যেক বর্ব্বর ব্যক্তির আন্তরিক অবস্থাও আমার মন্তব্যের বিষয় নহে। তাহাদের এই যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ইহার মধ্যে যতটা স্থূল পাশব ভাব আছে, যতটা হৃদয়হীনতা আছে, তাহা তিয়েরীর গ্রন্থ পাঠে ততটা ধারণা করা যায় না। তথাপি যদি আমরা বিষয়টা তলাইয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব, এই পাশবতা, এই দেহ-সর্ব্বস্বতা, এই স্থূলবুদ্ধি স্বার্থপরতার মিশ্রণসত্ত্বেও স্বাতন্ত্র্যানুরক্তি একটি মহৎ ভাব। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি হইতে এই ভাবের উদ্ভব। ইহা দ্বারা মানুষ নিজেকে মানুষ বলিয়া উপলব্ধি করে; মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়, মানুষ নিজের স্বাধীন বিকাশে স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

জার্ম্মান বর্ব্বরদিগের দ্বারাই এই ভাব ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল। রোমীয় জগতে ইহা অজ্ঞাত ছিল, খৃষ্টীয় চর্চ্চে ইহা অজ্ঞাত ছিল, প্রায় সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে যেখানেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব দেখিবেন, সেখানেই ইহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা, পৌরতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ পৌরজনের স্বায়ত্তাধিকার। মানুষ তখন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য যুঝিত না, যুঝিত পৌর অধিকার লাভের জন্য। সে তখন একটা জনসঙ্ঘের অঙ্গস্বরূপ ছিল, জনসঙ্ঘের কল্যাণার্থে নিজের ব্যক্তিগত অধিকার, ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। খৃষ্টীয় চর্চ্চেও সেই এক ব্যাপার। খৃষ্টীয় সঙ্ঘের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ, সঙ্ঘের বিধানের প্রতি অচলা ভক্তি, সঙ্ঘের আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটা তীব্র বাসনা, এই হইল খৃষ্টীয় চর্চ্চভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির মূল আন্তরিক ভাব। অথবা ইহাও বলা যায় যে, মানুষের আত্মার উপর ধর্ম্মভাবের প্রবল প্রতিক্রিয়ার ফলে, মানুষের মধ্যে একটা আত্মদানের ভাব, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মের বিধান শিরোধার্য্য করিবার ভাব জাগিয়া উঠিল। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব, সমস্ত বাধাবিপদ্ অবহেলা করিয়া কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য স্বাধীনতাচর্চ্চার ভাব রোমীয় জগতেও ছিল না, খৃষ্টীয় সমাজেও ছিল না। বর্ব্বরেরাই এই ভাবের বীজ আনিয়া আধুনিক সভ্যতার শৈশব-ক্ষেত্রে বপন করিল। ইউরোপীয় সভ্যতার পরবর্ত্তী ইতিহাসে এই ভাবের লীলা এত বিরাট্, এত সহজলক্ষ্য, এত মহাফলপ্রসূ যে, ইহাকে ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যতম মৌলিক উপাদান বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

আধুনিক সভ্যতা বর্ব্বরদিগের নিকট অন্য একটি দ্বিতীয় উপাদানের

জন্য ঋণী। সেটি হইল আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার মধ্যে সামরিক সহায়তার চুক্তি-বন্ধন। এই উপায়ে সমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ সমাজের যোদ্ধৃবৃন্দমধ্যে এমন একটি সম্বন্ধপরম্পরার সৃষ্টি হইল, যাহার ফলে পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার (এবং প্রথম প্রথম একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত সামাজিক সাম্যেরও) কিছু মাত্র ব্যতিক্রম না ঘটিয়াও সমাজের মধ্যে একটা ক্রমবিন্যস্ত শ্রেণীবিভাগের প্রতিষ্ঠা হইল ; এবং ইহা হইতেই পরে "ফিউডালিজ্ম্"-আখ্যাপ্রাপ্ত অভিজাত-তন্ত্রের উদ্ভব হইল। মানুষের প্রতি মানুষের আসক্তি, বাহিরের কোনরূপ বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও, কোন প্রকার সাধারণ সামাজিক দায় বা কর্ত্তব্যের প্রেরণা না থাকা সত্ত্বেও এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির প্রতি এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির যে নিষ্ঠা, প্রীতি, ভক্তি, তাহারই উপর এই সম্বন্ধপরম্পরার প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন জনতন্ত্রে দেখিবেন, কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সহিত স্বাধীনভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে সম্পর্কিত নয়, সকলেই পৌররাষ্ট্রের সহিত সম্বদ্ধ; বর্ব্বরদিগের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেই সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হইত। প্রথমে, যখন তাহারা দলে দলে ইউরোপের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন দলপতির সহিত তাঁহার অনুচরবর্গের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া এই ব্যক্তিগত বন্ধন স্থাপিত হইত। পরে এই বন্ধন আশ্রয়দাতা ভূম্যধিকারীর সহিত অধীন আশ্রিত প্রজা বা ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ আকারে পরিণত হইল। সুতরাং মানুষে মানুষে স্বাধীন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠাস্বরূপ এই যে দ্বিতীয় মূলনীতি, ইহা বর্ব্বরদিগের নিকট হইতেই পাওয়া গেল।

এখন একবার জিজ্ঞাসা করি, যখন আমি আরম্ভেই বলিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা শৈশবাবস্থা হইতেই একটা বিচিত্র, বিক্ষুব্ধ ও জটিল ব্যাপার, তখন কি সেটা ভুল বলিয়াছিলাম? ইহা কি সত্য নয় যে,

ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে যে যে উপাদান, যে যে শক্তি একত্র হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনকালেই একত্র দেখা দিয়াছে? আমরা সেই যুগে তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির সমাজ দেখিতে পাইলাম—(১) রোমীয় সমাজের শেষ চিহ্নস্বরূপ পৌরসমাজ, (২) খৃষ্টীয় সমাজ, ও (৩) বর্ব্বরসমাজ। এই তিন বিভিন্ন সমাজের গঠনপ্রণালী বিভিন্ন, মূলনীতি বিভিন্ন, এবং অন্তঃস্যূত ভাব ও আদর্শ বিভিন্ন। একদিকে নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতার জন্য অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা, অন্য দিকে সম্পূর্ণতম বশ্যতাস্বীকার; একদিকে সামরিক প্রধানবর্গের আধিপত্য, অন্য দিকে যাজকবর্গের আধিপত্য; সর্ব্বত্রই পার্থিব ও অপার্থিব শাসন-শক্তির একত্র সংস্থান। চর্চ্চের বিধিবিধান, রোমীয় তন্ত্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যবহারবিধি, বর্ব্বরদিগের অলিখিত রীতি-পদ্ধতি—সমস্তই পাশাপাশি রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই নানা বিভিন্ন জাতি, ভাষা, সমাজ, রীতিনীতি, ভাব ও সংস্কারের সংমিশ্রণ বা একত্র সংস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ইহাতেই যথেষ্টরূপ প্রমাণিত হইতেছে যে, আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার সাধারণ প্রকৃতি যে ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা ভুল হয় নাই।

অবশ্য ইহা নিশ্চয় যে, এই বৈচিত্র্য ও বিরোধের দরুন ইউরোপকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই কারণে ইউরোপের উন্নতি হইতে এত বিলম্ব ঘটিয়াছে। এই কারণেই ইউরোপকে এত ঝটিকা দুর্য্যোগ সহিতে হইয়াছে। তথাপি ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ, জাতির পক্ষেও সেইরূপ, বিচিত্রতম সম্পূর্ণতম বিকাশের মূল্যস্বরূপ যে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, সমস্তই সহনীয়। মোটের উপর ইউরোপীয় সমাজের এই জটিলতা, এই সংক্ষোভ ও সংঘাতই অন্যান্যদেশসুলভ সহজ শান্ত সরলতা অপেক্ষা, মানব জাতিকে উন্নতির পক্ষে অধিকতর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয় সভ্যতার মূল উপাদান কি কি, এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই সভ্যতার জন্মকাল হইতেই যে এই সকল উপাদানের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই উপাদানগুলি কিরূপ বিচিত্রধর্ম্মী ও পরস্পরবিরোধী, পূর্ব্ব হইতেই তাহার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং এটাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই সকল পরস্পরবিরোধী মূল তত্ত্বের মধ্যে কোনটিই ইউরোপীয় সমাজে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই, কোন একটি তত্ত্ব অপর তত্ত্বগুলিকে পরাজিত বা বিদূরিত করিতে পারে নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, ইহাই ইউরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ। এখন আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে এই সভ্যতার শৈশব যুগের ইতিহাস, অর্থাৎ ইউরোপীয় ইতিহাসের বর্ব্বর যুগ বলিয়া যাহা সধারণতঃ অভিহিত হয়, সেই যুগের ইতিহাস।

এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই এমন একটি ব্যাপার চোখে পড়ে, যাহা আমাদের পূর্ব্বসিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। আধুনিক ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকগণ যে সকল মত ও ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, সেগুলি আলোচনা করিলে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যাঁহারা রাজতন্ত্রবাদী, তাঁহারা বলেন, ইউরোপীয় সমাজে মূলে রাজতন্ত্রেরই একাধিপত্য ছিল, অন্যান্য বিরোধী তত্ত্ব পরে আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যাঁহারা যাজকতন্ত্রবাদী বা অভিজাত-তন্ত্রবাদী, তাঁহারাও স্ব স্ব শাসনতন্ত্রের পক্ষ হইতে ঠিক ঐরূপ

দাবীই করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় সভ্যতার অভ্যুত্থানপ্রণালী বুঝাইতে যে কেহ চেষ্টা করিয়াছেন, সকলেই প্রমাণ করিতে চান যে, পরে যতই বিরোধ বৈচিত্র্য আসিয়া পড়ুক না কেন, মূলে কিন্তু একটি মাত্র শাসননীতির একাধিপত্য ছিল—কাঁহারও মতে সেটি রাজতন্ত্র, কাহারও মতে অভিজাততন্ত্র, আবার কাহারও বা মতে গণতন্ত্র।

বুল্যাঁভিয়ে (Boulainvilliers)-প্রমুখ এক সম্প্রদায়ের সমাজতত্ত্ববিদ্ আছেন, যাঁহারা ফিউডালিজম্‌কেই ইউরোপীয় সমাজের একমাত্র মূলতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চান। তাঁহারা বলিতে চান যে, রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর বিজেতৃজাতির হস্তেই, অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালের টিউটন অভিজাতবর্গের হস্তেই সমস্ত অধিকার ও শক্তি আসিয়া পড়ে; সমস্ত ইউরোপীয় সমাজ তাহাদেরই অধিকারভুক্ত হয় এবং পরে রাজবর্গ ও প্রজাবর্গ আসিয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার ছিনাইয়া লয়। অভিজাততন্ত্রই হইতেছে ইউরোপীয় সমাজের আদিম ও যথার্থ স্বরূপ।

এই সম্প্রদায়ের পার্শ্বেই আর এক সম্প্রদায় দেখা যায়, যাঁহারা রাজতন্ত্রবাদী,—যথা আবে দ্যুবো (Abbe Dubos)। তাঁহারা বলেন, ইউরোপীয় সমাজে রাজগণেরই ন্যায্য অধিকার। টিউটন অর্থাৎ জার্ম্মান রাজগণ প্রাচীন রোমীয় সম্রাট্‌গণের সমস্ত অধিকারই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। গল্ (Gaul) প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগণ তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বসাইয়াছেন। তাঁহারাই কেবল ন্যায্য অধিকারসূত্রে রাজ্যশাসন করিয়াছেন। অভিজাতবর্গ যাহা কিছু আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা রাজবর্গের ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াই করিয়াছিলেন।

আর এক সম্প্রদায়ের সমাজতত্ত্ববিদ্ আছেন, যাঁহাদিগকে গণতন্ত্রবাদী বা প্রজাতন্ত্রবাদী বলা যাইতে পারে। আবে দ্য মাব্লীর (Abbe de

Mably) গ্রন্থাবলী পাঠ করুন, দেখিবেন, তাঁহার মতে পঞ্চম শতাব্দী হইতে সমাজের শাসন ও কর্ত্তৃত্বভার জনসঙ্ঘের হাতে আসিয়াছে, স্বাধীন প্রজাবর্গ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে সম্মিলিত হইয়া যে প্রজাতন্ত্র গণসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলেন, তাহারই হাতে সমস্ত অধিকার আসিয়া পড়িল। পরবর্ত্তী কালে অভিজাতবর্গ ও রাজন্যবর্গ প্রজাসঙ্ঘের এই আদিম স্বাতন্ত্র্য কাড়িয়া লইয়া, নিজ নিজ অধিকার ও সম্পদ্ বাড়াইয়া লইয়াছেন। ইহাদের আক্রমণ হইতে প্রজাসঙ্ঘ আত্মরক্ষা করিতে পারিল না বটে, কিন্তু এটা সত্য যে, মূলে সমাজশাসনব্যাপারে প্রজাসঙ্ঘেরই কর্ত্তৃত্বাধিকার ছিল।

এই ত গেল তিন পক্ষের দাবী। কিন্তু ইহাদের সকলের দাবী ছাড়াইয়া আর একটি শক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে,—সেটি হইতেছে খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্র বা চর্চ্চ (church)। এই শক্তির তরফ হইতে দাবী করা হয় যে, চর্চ্চের অধিকার ভগবদ্দত্ত অধিকার; ভগবদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য চর্চ্চের আবির্ভাব; চর্চ্চের চেষ্টাতেই ইউরোপে সভ্যতা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; সুতরাং ইউরোপীয় সমাজশাসনে চর্চ্চেরই ন্যায্য অধিকার, চর্চ্চই ইউরোপীয় জগতের একমাত্র সম্রাজ্ঞী।

এখন দেখুন, আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াইল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, ইউরোপের ইতিহাসে কোন একটি শক্তি অপরাপর শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাভব করিয়া একেশ্বরভাবে যে কখনও কর্ত্তৃত্ব করে নাই, এ কথাটা বেশ প্রমাণ করিয়া দিয়াছি; এই সকল বিরুদ্ধ শক্তি যে বরাবর পাশাপাশি কাজ করিয়াছে, কখন বা পরস্পর বিরোধ করিয়াছে, কখনও পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কখনও বা পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছে, এই কথাটাই যেন পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। অথচ দেখুন, এই প্রথম পদক্ষেপেই একটা সম্পূর্ণ

বিরুদ্ধ মত দেখা যাইতেছে যে, ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবযুগেই, বর্ব্বর ইউরোপের মধ্যভাগেই এই সকল বিরুদ্ধশক্তির মধ্যে একটিমাত্র—সে রাজশক্তিই হউক বা প্রজাশক্তিই হউক, অভিজাতশক্তিই হউক বা যাজকশক্তিই হউক—ইহাদের মধ্যে একটি মাত্র শক্তিই সমাজে একাধিপত্য করিত। এবং শুধু একটিমাত্র দেশে নয়, ইউরোপের সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে এই সকল বিরুদ্ধশক্তি এই একাধিপত্যের দাবী করিয়া আসিয়াছে। যে সকল পরস্পরবিরোধী ঐতিহাসিক মতবাদের উল্লেখ করিলাম, সেগুলি সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকের পক্ষে এই ব্যাপারের মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান্ তথ্য নিহিত আছে। আধুনিক ইউরোপের আদিম যুগে স্ব স্ব অধিকার সম্পূর্ণ ও অখণ্ড ছিল বলিয়া এই যে বিভিন্ন শক্তি পরস্পরবিরোধী দাবী উপস্থিত করিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দুইটী মূল্যবান্ তথ্য উদ্ধার করিতে পারেন। প্রথমটি হইতেছে শাসনক্ষেত্রে ন্যায্যাধিকারতত্ত্ব, অর্থাৎ যে কোন শাসনশক্তি সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহার কর্ত্তৃত্ব করিবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার আছে কি না, তাহার বিচার। শাসনাধিকার লইয়া এই যে বৈধাবৈধ বিচার, এরূপ বিচারের আবশ্যকতা আছে বলিয়া যে ধারণা, তাহা ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতীয় তথ্যটি হইতেছে বর্ব্বর ইউরোপের সামাজিক অবস্থার যথার্থ স্বরূপ ও বিশিষ্ট প্রকৃতি।

এখন দেখা যাউক, পূর্ব্বোক্ত ঐ বিরোধের মধ্য হইতে এই তথ্য দুইটি কিরূপে বাহির করা যায়।

এই যে যাজকতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, এই সকল বিভিন্ন শক্তি প্রত্যেকেই দাবী করিতেছে যে, সর্ব্বপ্রথমে সমাজশাসনে

তাহারই অখণ্ড অধিকার ছিল; ইহা দ্বারা তাহারা বাস্তবিকপক্ষে কি দাবী করিতেছে? তাহারা প্রত্যেকেই কি দাবী করিতেছে না যে, সমাজশাসনে একমাত্র তাহারই বৈধ অধিকার? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের উপরই স্থায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত—কে কতদিন ধরিয়া অধিকার ভোগ করিয়াছে, তাহারই দ্বারা তাহার অধিকারের স্থায্যতা বিচার হয়। আপেক্ষিক প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়াই বিভিন্ন পক্ষ স্ব স্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে, স্ব স্ব শক্তির বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। লক্ষ্য করিবেন যে, এই চেষ্টা কেবল একপক্ষে আবদ্ধ নহে, সকল বিরুদ্ধ শক্তিরই ঐ এক চেষ্টা, সমাজ-শাসনে আমারই যে একমাত্র স্থায্য অধিকার, সকল পক্ষই ইহা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। বর্ত্তমান কালে আমরা মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে, রাজশক্তিই কেবল স্থায্য অধিকারের দাবী করেন। বাস্তবিক এটা আমাদের ভুল; সকল প্রকার শাসনপদ্ধতিরই এই অধিকারবৈধতার দাবী রহিয়াছে; আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়াছি যে, ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গই এই দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। ইউরোপের পরবর্ত্তী ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির সমাজব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রের মূলে এইরূপ একটা স্থায্য অধিকারের দাবী রহিয়াছে। ইটালী ও সুইট্জার্‌লাণ্ডের অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র, সান্‌মারিনোর সাধারণতন্ত্র ও ইউরোপের বড় বড় রাজতন্ত্র, সকলেই স্ব স্ব দেশে স্ব স্ব শাসনশক্তিকে একমাত্র ন্যায্য অধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, এবং সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক ন্যায্য অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছেন। সকলেই স্ব স্ব শাসন-পদ্ধতির প্রাচীনত্ব ও সনাতনত্বের উপর নিজ নিজ অধিকারের ন্যায্যত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইউরোপ ছাড়িয়া অন্যান্য দেশের ও অন্যান্য যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এই তথ্যের সন্ধান পাইবেন। এমন কোন দেশ নাই, এমন কোন যুগ নাই, যাহাতে কোন না কোন প্রকারের সমাজ-ব্যবস্থা বা শাসনতন্ত্র নাই; এবং এমন কোন শাসনতন্ত্র নাই, যাহার মূলে প্রাচীনত্ব বা সনাতনত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বৈধ অধিকারের দাবী নাই।

এই যে বৈধাধিকারতত্ত্ব, ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার উপাদানই বা কি কি? কিরূপেই বা এই তত্ত্ব ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রবেশ লাভ করিল?

সমস্ত শাসনশক্তির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাহুবল ব্যতিরেকে কোন শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি এ বলিতে চাই না যে, কেবলমাত্র বাহুবলেই তাহাদের উদ্ভব; বাহুবল ছাড়া অন্য কোন অধিকার যদি তাহাদের না থাকিত, তাহা হইলেও যে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, এ কথা আমি বলিব না। বাহুবলের দাবী ছাড়া অন্যান্য দাবীরও যে আবশ্যকতা ছিল, তাহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। সমাজের প্রয়োজন অনুসারে, সমাজপ্রচলিত রীতিনীতি মতামত প্রভৃতির অবস্থা অনুসারেই এক একটি শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এটাও লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না যে, জগতে যত প্রকার শাসনতন্ত্র আছে, সে রাজতন্ত্রই হউক বা প্রজাতন্ত্রই হউক, সকলেই মূলে কিছু না কিছু পরিমাণে বাহুবলের সংস্পর্শে কলঙ্কিত।

অথচ কোন শাসনশক্তিই স্বীকার করিবে না যে, বাহুবলেই তাহার উদ্ভব। শক্তিদ্বারা, বাহুবলের দ্বারা যে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না, বাহুবল একমাত্র সম্বল হইলে যে শাসনাধিকার জন্মাইতেই পারে না, এ কথা জগতের সমস্ত শাসনতন্ত্রই সহজসংস্কারবশে অবগত

আছেন। এই জন্যই প্রাচীন কালের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া যখন দেখিতে পাই, নানা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সংঘর্ষ চলিতেছে, সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করিয়া পরস্পরের বলপরীক্ষা চলিতেছে, তখন দেখি, প্রত্যেক পক্ষের তরফ হইতে একই দাবী উঠিতেছে—"আমিই প্রাচীন, আমিই সনাতন; এখন একটা বাহুবলের দ্বন্দ্বপরীক্ষা চলিতেছে বটে, কিন্তু মূলে আমার প্রতিষ্ঠা বাহুবলের উপর নহে; অন্য দাবীর বলে, অন্য অধিকারসূত্রে আমার প্রতিষ্ঠা; এখন যে অশান্তি বিগ্রহের মধ্যে আমাকে লিপ্ত দেখিতেছ, ইহার পূর্ব্বে সমাজ আমারই দখলে ছিল; আমারই অধিকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার; এখনই কেবল এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়া আমার ন্যায্য অধিকার লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে।"

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈধাধিকার-তত্ত্ব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহার প্রতিষ্ঠা অন্যত্র। বাস্তবিক পক্ষে এই যে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি অন্ততঃ তত্ত্বের হিসাবে বাহুবলের দাবী অস্বীকার করিতেছে, ইহার তাৎপর্য্য কি? তাহারা নিজেরাই ঘোষণা করিতেছে যে, রাজনৈতিক অধিকারতত্ত্বের মূল বাহুবল নয়, অন্যত্র; যুক্তি ও ন্যায়ধর্ম্মের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা; এবং সকলেই নিজ নিজ শক্তি যে যুক্তিমূলক, ন্যায়মূলক, তাহাই প্রচার করিতে চাহিতেছে। তাহাদের প্রতিষ্ঠা যে কেবল বাহুবলে, এ কথা কেহ মনে করে, ইহা চান না বলিয়াই তাঁহারা প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়া অন্য ভিত্তির উপর তাঁহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চান। অতএব শাসনাধিকারবৈধতার প্রথম লক্ষণ দাঁড়াইল এই যে, এ বৈধতা বাহু-বলের দাবী অস্বীকার করে এবং একমাত্র নৈতিক শক্তির দাবী, যুক্তির দাবী, ন্যায়ধর্ম্মের দাবীই গ্রাহ্য করে। এই শেষোক্ত মূল হইতেই

অধিকারবৈধতাতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ। কিন্তু এই বিকাশসাধনে প্রাচীনত্ব ও দীর্ঘকালব্যাপ্তি সহায়তা করিয়াছে। কিরূপে করিয়াছে, তাহা এবার দেখা যাউক।

কার্য্যতঃ বাহুবলের সাহায্যেই সর্ব্বপ্রকার শাসনতন্ত্র ও সমাজ-ব্যবস্থার জন্ম হয়। তৎপর সময় যত অতীত হইতে থাকে, ততই কালের ধর্ম্মে বাহুবলের, বাহ্য শক্তির ক্রিয়াকলাপ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, সংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে থাকে। সমাজ অনেক দিন ধরিয়া টিকিয়া থাকার দরুনই, সমাজ মানুষ লইয়া গঠিত বলিয়াই এই পরিবর্ত্তন, এই সংস্কার সাধিত হয়। মানুষ নিজের অন্তরের মধ্যেই শৃঙ্খলা, যুক্তি ও ন্যায়ধর্ম্ম বিষয়ে কতকগুলি ধারণা পোষণ করিয়া থাকে; সে সেই ধারণাগুলি নিজের জীবনে ও সামাজিক জীবনে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে চায়। সে অবিরামভাবে এই কার্য্যসাধনে নিরত; এবং যে সমাজের মধ্যে তাহার কার্য্যক্ষেত্র, সে সমাজ যদি টিকিয়া যায়, আকস্মিক বিপ্লব বা অন্য কোন কারণে সামাজিক জীবনের গতিপ্রবাহ যদি খণ্ডিত না হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার চেষ্টার ফলও কিছু ফলে। মানুষ তখন যে সামাজিক বাবস্থার মধ্যে নিজের জীবন যাপন করে, সেই সামাজিক ব্যবস্থাকেই যুক্তিমূলক, নীতিমূলক ও ন্যায্যাধিকারমূলক মনে করিয়া লয়।

মানুষের চেষ্টা ছাড়া বিধাতারও এমন একটি বিধান আছে, যাহাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শৃঙ্খলা, যুক্তিযুক্ততা ও ন্যায়ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন সমাজই টিকিয়া থাকিতে পারে না। এ বিধানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হওয়া অসম্ভব; প্রাকৃতিক জগৎ যেরূপ বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এও সেইরূপ বিধান। কোন একটা সমাজ যদি অনেক দিন ধরিয়া টিকিয়া থাকে, তাহা হইতেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সে

সমাজ একেবারে বুদ্ধিবিচারবর্জ্জিত বা ধর্ম্মবর্জ্জিত নহে, যে বিচারবুদ্ধি, সত্যদৃষ্টি ও ন্যায়বোধ সমাজকে জীবনশক্তি দান করিতে একমাত্র সমর্থ, তাহা হইতে সে সমাজ একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। উপরন্তু যদি দেখা যায় যে, ঐ সমাজ ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে, ক্রমশঃ পুষ্টি ও শক্তিলাভ করিতেছে, তাহার শাসন, তাহার ব্যবস্থা দিনে দিনে অধিক-সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে সে অধিকতর পরিমাণে বিচারবুদ্ধি, ন্যায়বোধ ও যথার্থ অধিকার অর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে বলিয়াই তাহার এই উন্নতি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, জগদ্ব্যাপারের মধ্যেই, এবং জগদ্ব্যাপার হইতে মানুষের মনের মধ্যে, এই বৈধাধিকারতত্ত্ব অনুস্যূত রহিয়াছে। এই তত্ত্বের মূল প্রতিষ্ঠা ও প্রথম উদ্ভব, অন্ততঃ কিয়ৎ-পরিমাণে—ধর্ম্মবোধ, বিচার-বুদ্ধি ও সত্যদৃষ্টি হইতে; পরে কালব্যাপ্তিতে ইহার পুষ্টি হয়, কারণ দীর্ঘকালস্থায়িত্বের দ্বারা ইহাই কতকটা পরিমাণে প্রতিপন্ন হয় যে, বাস্তব ঘটনার মধ্যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—বাহ্য জগতের মধ্যে যথার্থ বৈধাধিকারতত্ত্ব প্রবেশলাভ করিয়াছে। আমরা যে যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইতেছি, সে যুগে দেখিব—রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের শৈশব-শয্যার উপরে পশুশক্তি ও মিথ্যাচার আপন আপন ছায়া বিস্তার করিয়া আছে; সর্ব্বত্রই দেখিবেন, পশুশক্তি ও মিথ্যাচার অল্পে অল্পে কালের নিয়োগে সংস্কৃত হইয়া উঠিতেছে, ন্যায্য অধিকার ও সত্যবোধ ক্রমশঃ সভ্যতার মধ্যে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই যে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা, ইহা হইতেই ধাপে ধাপে শাসনক্ষেত্রে বৈধ অধিকারের ধারণা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; এইরূপেই

আধুনিক সভ্যতার মধ্যে এই ধারণা, এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

অতএব যখন বিভিন্ন সময়ে ন্যায়-ধর্ম্মনিরপেক্ষ স্বেচ্ছাতন্ত্র-শক্তির পক্ষ হইতে এই বৈধাধিকারতত্ত্বের দোহাই দিবার চেষ্টা হইয়াছে, তখন এই তত্ত্বটিকে ইহার প্রকৃত মূল হইতে বিকৃত করা হইয়াছে। স্বেচ্ছাতন্ত্রের ধ্বজা হওয়া দূরে থাকুক, ন্যায় ও সত্যের নামেই এই তত্ত্বটি জগতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এ তত্ত্ব কখনও একপক্ষপাতী হইতে পারে না; ইহা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি হইতে পারে না; যেখানেই সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, সেখানেই এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়। ইহা স্বাধীনতার পক্ষেও প্রযোজ্য, শক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য; ইহা ব্যক্তিবিশেষের অধিকারও বিচার করিতে পারে, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানেরও বিচার করিতে পারে। আমরা যত অগ্রসর হইব, তত দেখিব, নানা বিভিন্ন প্রকৃতির পরস্পরবিরোধী সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

রাজতন্ত্রের মধ্যেও ইহার যেরূপ প্রতিষ্ঠা, মধ্যযুগের ভূস্বামিতন্ত্রের মধ্যে, ফ্লাণ্ডার্স ও জার্ম্মানীর পৌরতন্ত্রের মধ্যে এবং ইটালীর জনতন্ত্রের মধ্যেও ইহার সেইরূপ প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই তত্ত্বটি বিস্তৃত হইয়া, তাহাদিগকে একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি দান করিয়াছে, এবং আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

এই ত গেল প্রথম তত্ত্ব। আধুনিক সভ্যতার নানা বিরুদ্ধ উপাদানের তরফে একই কালে যে প্রাচীনত্বের দাবী, তাহা হইতে আর একটি দ্বিতীয় তথ্য যে উদ্ধার করা যায়, তাহা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন সেইটির আলোচনা করা যাউক। সে তথ্যটি হইতেছে ইউরোপের

বর্ব্বরযুগের যথার্থ প্রকৃতি। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গই দাবী করিয়া থাকে যে, এই যুগে সমগ্র ইউরোপে তাহারই একমাত্র অধিকার ছিল; সুতরাং এটা নিশ্চয় যে, এ যুগে কাহারও একাধিপত্য ছিল না। জগতে কখনও যদি একমাত্র সমাজব্যবস্থার প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে সেটাকে চিনিয়া লওয়া তত কঠিন হয় না। দশম শতাব্দীতে আসিয়া দ্বিধাশূন্য হইয়া বলিতে পারি যে, এ যুগে ভূস্বামিতন্ত্রের প্রাধান্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য, এ কথা জোর করিয়া বলিতে আমাদের কোন সঙ্কোচ হইবে না। ফ্লাণ্ডার্সের পৌরতন্ত্র বা ভারতীয় জনতন্ত্ররাষ্ট্রগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা তৎক্ষণাৎ বলিতে পারি যে, ইহাদের মধ্যে প্রজাতন্ত্রতত্ত্বের আধিপত্য। যেখানে বাস্তবিকপক্ষে সমাজে কোন বিশেষ শক্তির আধিপত্য বা প্রাধান্য আছে, তাহা বুঝিতে কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

অতএব ইউরোপীয় সভ্যতার উৎপত্তিকালে কাহার প্রাধান্য ছিল, এই লইয়া বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের মধ্যে যে কলহ, তাহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাহারা সকলেই এককালে পাশাপাশি বর্ত্তমান ছিল, এবং কোন শাসনতন্ত্রেরই প্রাধান্য এতটা ব্যাপক ছিল না যে, তদ্দ্বারা সেই সমাজের নামকরণ বা আকৃতিপরিচয় হইতে পারে।

অতএব বর্ব্বর যুগের ইহাই হইল বিশিষ্ট প্রকৃতি। এ যুগে সভ্যতার সকল উপাদানই একত্র তাল পাকাইয়া আছে; সকল প্রকার শাসনতন্ত্রেরই অঙ্কুর অবস্থা; একটা বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও সংঘর্ষ, যাহার মধ্যে বিরোধেরও কোন স্থায়িত্ব নাই, বাঁধাবাঁধি নাই। এই যুগের সামাজিক অবস্থা সকল দিক্ দিয়াই আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারি যে, কোথাও এমন একটি ব্যাপার, এমন একটি তত্ত্ব পাওয়া যায় না, যাহা সুপরিব্যাপ্ত বা সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি

কেবল দুইটি বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইব—(১) ব্যক্তিবর্গের অবস্থা, (২) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা। তাহাতেই সমগ্র সমাজের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এই যুগে আমরা চারি শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই—(১) স্বাধীন শ্রেণী, অর্থাৎ যাহারা কোন উপরওয়ালা বা মুরুব্বির মুখাপেক্ষী নহে, যাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত, অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বাধ্য-বাধকতায় আবদ্ধ না হইয়া আপন আপন সম্পত্তি ভোগ করিত, আপন আপন জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। (২) আশ্রিতবর্গ বা প্রজাবর্গ,—ইহারা প্রথমে দলপতি বা সর্দ্দারদিগের সহিত অনুচর-সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল, পরে ভূস্বামী বা ঐরূপ কোন প্রধান ব্যক্তির সহিত প্রজা বা ভৃত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, ভূমি বা অন্য কোন সম্পত্তির পরিবর্ত্তে তাহারা প্রভুর প্রয়োজনে শক্তিসামর্থ্য নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। (৩) স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ক্রীতদাসবর্গ। (৪) ক্রীতদাসবর্গ।

কিন্তু এই যে শ্রেণীবিভাগ করা গেল, এ বিভাগ কি স্থায়ী ও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল? কোন ব্যক্তি কোন একটি শ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যে একবার আসিলে সেই গণ্ডীর মধ্যেই কি চিরকাল আবদ্ধ থাকিয়া যাইত? এই বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে কি কোন শৃঙ্খলা বা স্থায়িত্ব ছিল? কিছুতেই নহে। প্রায়ই দেখিবেন, স্বাধীন শ্রেণীর লোক স্ব স্ব সামাজিক পদমর্য্যাদা ও অধিকার পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ভূমি বা অন্য কোন দান গ্রহণ করতঃ তাহার দাসত্ব অঙ্গীকার করিতেছে ও এইরূপে আশ্রিত-শ্রেণীর মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। কোথাও বা আবার আশ্রিত শ্রেণীর লোক তাহাদের আশ্রয়দাতার সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়া পুনরায় স্বাধীন শ্রেণীর মধ্যে পুনঃপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বত্রই

দেখিবেন একটা সচলতা, শ্রেণী হইতে শ্রেণ্যন্তরে অবিরত যাতায়াত চলিতেছে; বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধের কোন স্থিরতা নাই, কোন স্থায়িত্ব নাই; কোন লোক দীর্ঘকাল এক পদবীতে অবস্থান করিতেছে না, কোন পদবীর চিরকাল একমূল্য থাকিতেছে না।

ভূসম্পত্তির অবস্থাও ঐরূপ ছিল। আপনারা জানেন যে, সে কালে দুই শ্রেণীর ভূসম্পত্তি ছিল—(১) সম্পূর্ণরূপে দায়শূন্য; (২) দায়বদ্ধ, অর্থাৎ যে ভূসম্পত্তির দরুন কোন উৰ্দ্ধতন অধিকারীর সহিত একটা বাধ্য-বাধকতা থাকে। আপনারা জানেন যে, এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভূসম্পত্তির মধ্যেও একটা সুস্পষ্ট ক্রমনির্দ্দেশের চেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই সকল দায়বদ্ধ ভূসম্পত্তি প্রথমে কয়েকটি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বৎসরের জন্য বিলি করা হইত, পরে প্রজার জীবনকাল পর্য্যন্ত, এবং সর্ব্বশেষে সেগুলি বংশগত হইয়া পড়িল। বৃথা এ চেষ্টা! ভূমিস্বত্বের এই সকল প্রকারভেদ বিশৃঙ্খল ভাবে একই সময়ে বর্ত্তমান ছিল; আমরা একই সময়ে নির্দ্দিষ্টকালব্যাপী স্বত্ব, জীবনস্বত্ব, বংশপরম্পরাগত স্বত্ব, সকল প্রকার স্বত্বেরই অস্তিত্ব দেখিতে পাইব। ব্যক্তিবর্গের অবস্থার মধ্যেও যে স্থায়িত্ব ও স্থিরতার অভাব, ভূস্বত্বের অবস্থাতেও তাহাই। সকল দিকেই একটা বহু আয়াসসাধ্য বিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যায়; গতিশীল যাযাবর জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তে স্থায়ী সুস্থির জীবনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে; মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পরিবর্ত্তে, মানবসম্বন্ধ ও সম্পত্তিগত সম্বন্ধ জড়াইয়া এক জটিল বৈষয়িক সম্বন্ধের উদ্ভব হইতেছে। এই সন্ধিক্ষণে সমস্তই বিশৃঙ্খল, সমস্তই অনির্দ্দিষ্ট, সমস্তই খণ্ডিত।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও সেই এক অস্থিরতা, সেই এক গণ্ডগোল। তিন প্রকার শাসনপদ্ধতি একই কালে বর্ত্তমান ছিল—

একদিকে রাজতন্ত্র; অপর দিকে অভিজাততন্ত্র অর্থাৎ ভূসম্পত্তি ও মানুষের মধ্যে পরস্পরাপেক্ষী সম্বন্ধ, এবং অন্য আর একদিকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের মন্ত্রণা-সভা। কোন পদ্ধতিরই সমাজে একান্ত অধিকার ছিল না; কোনটিই অন্যগুলির উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে নাই। স্বাধীন জন-তন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানাদি ছিল, কিন্তু জনসম্মিলনীতে যে সব ব্যক্তির যোগ দেওয়া উচিত, তাঁহারা প্রায়ই উপস্থিত হইতেন না। এমন কি, রাজতন্ত্র, যাহা অপেক্ষা সরল ও সহজনির্দ্দিষ্ট শাসনপ্রতিষ্ঠান আর হইতেই পারে না, সেই রাজতন্ত্রেরও তখন কোন স্থায়ী নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি ছিল না; তাহা কতকপরিমাণে নির্ব্বাচনমূলক, কতকপরিমাণে বংশপরম্পরাগত ছিল। কখনও পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হইতেছেন, কখনও বা পরিবারমধ্যে যিনি যোগ্যতম, তিনিই রাজপদের জন্য নির্ব্বাচিত হইতেছেন; কখনও বা আবার দূরবর্ত্তী কোন জ্ঞাতি বা কুটুম্ব, এমন কি, সম্পূর্ণ বাহিরের লোকও নির্ব্বাচিত হইতেছেন। কোনও পদ্ধতিরই কোন প্রকার স্থিরতা নাই; সকল প্রতিষ্ঠানই, সকল প্রকার সমাজব্যবস্থাই পাশাপাশি রহিয়াছে, পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইতেছে এবং নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

রাষ্ট্রগঠনেও সেই পরিবর্ত্তনশীলতা, সেই উত্থানপতনবৈচিত্র্য; এক একটি রাষ্ট্র মাথা তুলিতেছে, আবার তলাইয়া যাইতেছে, কখনও বা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলিয়া এক হইতেছে, কখনও বা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমাব্যবচ্ছেদ নাই, নির্দ্দিষ্ট শাসনতন্ত্র নাই, নির্দ্দিষ্ট প্রজাসঙ্ঘও নাই; আছে কেবল নানা অবস্থা, নানা নীতি, নানা তথ্য, নানা জাতি, নানা ভাষার এক অদ্ভুত অসামঞ্জস্য। এই হইল বর্ব্বর ইউরোপের প্রকৃত স্বরূপ।

এই অদ্ভুত যুগের আরম্ভই বা কবে, শেষই বা কবে? ইহার জন্মকাল সম্বন্ধে কোন গোল নাই; রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আরম্ভ। কিন্তু এ যুগ শেষ হইল কবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে, এই বর্ব্বর যুগের সমাজের যে অবস্থা নির্দ্দেশ করা হইল, কি কি কারণে সেই অবস্থার উদ্ভব।

আমার মনে হয়, ইহার দুইটি প্রধান কারণ দেখিতে পাওয়া যায়; একটি বাস্তব কারণ, বাহ্য ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত হইতে তাহার উৎপত্তি; অপরটি নৈতিক, মানুষের অন্তর হইতেই তাহার উদ্ভব।

বাস্তব কারণটি হইতেছে—বর্ব্বর আক্রমণের দীর্ঘকালব্যাপ্তি। পঞ্চম শতাব্দীতেই বর্ব্বর আক্রমণ শেষ হইয়া গেল, এ কথা মনে করা চলিবে না; এ মনে করিলে চলিবে না যে, রোমীয় রাষ্ট্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ধ্বংসস্তূপের উপর বিভিন্ন বর্ব্বর রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এবং যাহা কিছু গোলযোগ সঙ্গে সঙ্গে চুকিয়া গেল। রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর বহুকাল পর্য্যন্ত এ ব্যাপার চলিয়াছিল; ইহার প্রমাণাবলী সুস্পষ্ট।

প্রথমেই ফ্রাঙ্ক্ রাজগণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাদিগকে কেবলই রাইন্ নদীর অপর পারে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চালাইতে হইয়াছিল; ক্লোটেয়ার ও ডাগোবের বারবার জার্ম্মানীতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, রাইন্ নদীর পূর্ব্বতীরে টুরিঙ্গীয় (Thuringian), দিনেমার, সাক্সন প্রভৃতি যে সকল জাতির বাস ছিল, তাহাদের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন? কারণ এই যে, এই সকল জাতি রাইন্ নদী পার হইয়া পশ্চিম তীরে রোমসাম্রাজ্যের লুণ্ঠনে ভাগ

বসাইতে চাহিয়াছিল। অপরদিকে ঐ সময়েই গল্অধিবাসী ফ্রাঙ্কগণ যে বারবার ইটালী আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারই বা অর্থ কি? তাঁহারা সুইজারলাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন, আল্পগিরিমালা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, ইটালিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কি কারণে? কারণ এই যে, উত্তরপূর্ব্বদিক্ হইতে নূতন নূতন জাতি তাঁহাদিগকে ঠেল দিতেছিল। তাঁহাদের যুদ্ধাভিযানের কারণ কেবলমাত্র লুণ্ঠনলোলুপতা নহে, প্রয়োজনের তাড়নাই তাহার কারণ। প্রথমাধিকৃত প্রদেশে তাহারা শান্তিতে বাস করিতে পাইল না বলিয়াই তাহারা অন্যত্র ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যাত্রা করিল। এদিকে আবার একটি নূতন জার্ম্মান জাতির আবির্ভাব হইল, তাহারা ইটালীতে লম্বার্ড-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। গল প্রদেশে ফ্রাঙ্করাজবংশের পরিবর্ত্তন হইল, মেরোভিঙ্গীয়-দের পরিবর্ত্তে কার্লোভিঙ্গীয় বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। এখন ইহা ঐতি-হাসিকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাস্তবিকপক্ষে এই রাজবংশ-পরিবর্ত্তনের অর্থ—গলে নূতন করিয়া একটি ফ্রাঙ্ক-আক্রমণ; এই আক্রমণের ফলে গলে প্রাচ্য ফ্রাঙ্কের পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য ফ্রাঙ্কজাতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পরিবর্ত্তনব্যাপার সমাপ্ত হইয়া গেল; কার্লোভিঙ্গীয় বংশই রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। পরে শার্লমেনের আবির্ভাব। মেরোভিঙ্গীয়েরা যেরূপ টুরিঙ্গীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, শার্লমেনও সেইরূপ সাক্সনদিগের বিরুদ্ধে, রাইন্ নদীর পূর্ব্বতীরস্থ সমস্ত জার্ম্মান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন এই সকল জার্ম্মান্ জাতির পশ্চাতে কে তাড়া দিতেছে? এখন তাড়া দিতেছে ওবোট্রাইট্, বিল্ৎস (Wilzes), সোরাব (Sorabes), বোহীমিয় প্রভৃতি স্লাব্ জাতি। সমগ্র স্লাব জাতি ষষ্ঠ হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত জার্ম্মান জাতিগুলির উপর চাপ দিতে লাগিল ও তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে

পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিল। উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সর্ব্বত্রই এই আক্রমণ-ব্যাপার চলিতে লাগিল ও ইতিহাসের ঘটনাস্রোত নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল।

দক্ষিণেও এইরূপ একটি ব্যাপার দেখা দিল—এই ব্যাপার, মুসলমান আরবের আবির্ভাব। জার্ম্মান ও স্লাব্‌গণ যখন রাইন্‌ ও ডানিউব নদীর তীর অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, আরবরা তখন ভূমধ্যসাগরের সমগ্র উপকূলভাগে তাহাদের বিজয়যাত্রা আরম্ভ করিল।

আরব-আক্রমণের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহার মধ্যে দেশ-জিগীষা ও ধর্ম্মপ্রচারেচ্ছা, এই উভয় ভাব সম্মিলিত ছিল। এ আক্রমণের উদ্দেশ্য এককালে দেশ জয় করা এবং ধর্ম্মপ্রচার করা। জার্ম্মান আক্রমণ ও আরব আক্রমণের মধ্যে অনেকটা প্রভেদ। খৃষ্টীয় জগতে ঐহিক ও পারত্রিক শাসনতন্ত্রের শক্তিকেন্দ্র বিভিন্ন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। যাঁহারা পারত্রিক শাসনতন্ত্রের পরিচালক, ধর্ম্ম-প্রচারেচ্ছা যাঁহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহাদের সহিত দেশজিগীষু ঐহিক-তন্ত্রপরিচালকদিগের কোন সম্বন্ধ ছিল না। একই লোকের পক্ষে এই উভয় প্রকৃতির উদ্যম অভিলাষ পোষণ করা সম্ভব ছিল না। জার্ম্মানরা যখন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, তখন তাহারা তাহাদের পূর্ব্বতন রীতিনীতি, ভাব আদর্শ রুচি সমস্তই বজায় রাখিল; পূর্ব্বের ন্যায় তখনও তাহাদের জীবন পার্থিব বাসনা, পার্থিব আসক্তি দ্বারাই চালিত হইতে থাকিল। তাহারা খৃষ্টপন্থী হইল বটে, কিন্তু মিশনরী হইল না। অপর দিকে আরবেরা এককালে বিজেতা ও ধর্ম্মপ্রচারক। তাহারা একই হস্তে শস্ত্র ও শাস্ত্র ধারণ করিয়া আসিল। পরবর্ত্তী কালে এই শস্ত্র-শক্তি ও শাস্ত্র-শক্তির সম্মিলনে মুসলমান সভ্যতার পরিণতি

শুভকর হয় নাই। মুসলমান সভ্যতার মধ্যে যে একটা জবরদস্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে এই ঐহিক-পারত্রিক শক্তির একত্র সম্মিলন, বাহ্য শাসনতন্ত্র ও নৈতিক শাসনতন্ত্রের বিমিশ্রণ। আমার মনে হয়, এই কারণেই মুসলমান সভ্যতা এখন সর্ব্বত্রই স্থাবর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় এ স্থাবরত্বের কোন লক্ষণই দেখা দেয় নাই। বরং উভয় শক্তির এই সম্মিলনের দরুনই আরব-আক্রমণের বেগ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নৈতিক উদ্যম ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সহায়তা পাইয়া আরবদিগ্বিজয় অতি অল্পকাল মধ্যেই যে বিরাট মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিল, জার্ম্মান আক্রমণের মধ্যে সে বিরাটত্ব, সে মহিমা ছিল না। আরব জাতির যে উৎসাহ উদ্যম, মানব-মনের উপর যে প্রভাব, জার্ম্মানদিগের সে পরিমাণে উৎসাহ উদ্যম প্রভাব মোটেই ছিল না।

পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের এই অবস্থা। দক্ষিণ হইতে আরবদিগের আক্রমণ, উত্তর হইতে জার্ম্মান ও স্লাব জাতিসমূহের, এই উভয় আক্রমণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ইউরোপের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে নিয়ত বিপর্য্যস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া থাকিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। লোকসঙ্ঘ, জাতিসমূহ কেবলই স্থানচ্যুত হইতেছে, একে অপরের স্কন্ধে গিয়া পড়িতেছে; কোন কিছুই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না; চারি দিকে পুনরায় একটা যাযাবর চঞ্চল জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে এ বিষয়ে কিছু কিছু বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের অন্য অন্য অংশ অপেক্ষা জার্ম্মানীতে এই বিশৃঙ্খলা কিছু অধিক ছিল, জার্ম্মানীই হইল এই চলাচলের মূলকেন্দ্র; আবার ইটালী অপেক্ষা ফ্রান্সের অবস্থা অধিক পরিমাণে বিক্ষুব্ধ। কিন্তু কোন স্থানেই সমাজ স্থিরতা লাভ করিতে

পারে নাই, শৃঙ্খলাস্থাপন করিতে পারে নাই—চারি দিকে বর্ব্বরতারই বিস্তার হইতে লাগিল।

এই ত গেল ইউরোপের তাৎকালীন অবস্থার কারণ, ঘটনাপরম্পরার আঘাতসম্ভূত কারণ। এখন আমি আধ্যাত্মিক কারণটির আলোচনা করিব; মানবমনের আভ্যন্তরিক অবস্থা হইতে এই কারণের উদ্ভব, বাহ্য কারণ অপেক্ষা ইহার প্রভাব কিছু কম নহে।

বাস্তবিক পক্ষে বাহ্য ঘটনা যাহাই হউক না কেন, মানুষ নিজেই নিজের জগৎ সৃষ্টি করে। মানুষের ধারণা, অনুভূতি, প্রবৃত্তি, বিচার-বুদ্ধি অনুসারেই জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়, উন্নতিশীল হয়; মানুষের আন্তর প্রকৃতি অনুসারেই সমাজের বাহ্য প্রতিকৃতি গঠিত হয়।

একটা স্থায়ী সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে মানুষের কি চাই? অবশ্যই প্রথমে আবশ্যক যে, সেই সমাজের উপযোগী, তাহার বিচিত্র সম্বন্ধের আলোচনায় প্রযোজ্য কতকগুলি ধারণা ও সিদ্ধান্ত মানুষের মনে থাকিবে। এবং ইহাও আবশ্যক যে, এই সকল ধারণা দুই এক জনের মনে আবদ্ধ না থাকিয়া সমাজভুক্ত অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রসারিত থাকিবে; এবং সর্ব্বশেষে আবশ্যক যে, এই ধারণাগুলি কেবল বুদ্ধির কোঠায় আবদ্ধ থাকিবে না, মানুষের ইচ্ছাশক্তির উপর, কর্ম্মচেষ্টার উপর প্রভাবশালী হইবে।

ইহা সুস্পষ্ট যে, মানুষ যদি নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে কোন বিষয়ের ধারণা করিতে অসমর্থ হয়, তাহাদের নিজ নিজ জীবনের গণ্ডীর মধ্যেই যদি তাহাদের চিন্তারাজ্যের সীমা বদ্ধ হয়, সকলেই যদি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও কামনার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসে, যদি সকলের মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ ধারণা বা অনুভূতি না থাকে, যাহা লইয়া তাহারা একত্র হইতে পারে, তাহা

হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, এরূপ লোক লইয়া কোন সমাজগঠন হইতেই পারে না ; কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজমধ্যে এক একটি বিক্ষোভের বীজ, প্রলয়ের বীজ লইয়া প্রবেশ করিবে।

যেখানেই লোকসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিসর্ব্বস্বতার প্রাধান্য, যেখানেই মানুষ নিজের চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করে না, নিজের প্রবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বের বশ্যতা স্বীকার করে না, সেখানেই তাহার পক্ষে সামাজিক জীবন এক প্রকার অসম্ভব। আমরা যে যুগের আলোচনা করিতেছি, সে যুগের ইউরোপবিজেতৃগণের আধ্যাত্মিক অবস্থা কিন্তু ঠিক এইরূপ। আমি আমার পূর্ব্ব আখ্যানে বলিয়া আসিয়াছি যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাব, মানবব্যক্তিত্বের ধারণা ইউরোপ জার্ম্মানদিগের নিকটই প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অতিমাত্র বর্ব্বর ও অজ্ঞান অবস্থায় এই তত্ত্বটি সামাজিকতাবিহীন পশুধর্ম্মী স্বার্থপরতার রূপ ধারণ করে। পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত জার্ম্মানদিগের মধ্যে ব্যক্তিতত্ত্বের এই পর্য্যন্তই অভিব্যক্তি হইয়াছিল। তাহারা কেবল নিজের স্বার্থ, নিজের প্রবৃত্তি, নিজের কামনাই গ্রাহ্য করিত ; কেমন করিয়া তাহারা উন্নত সমাজবন্ধন দূরে থাক, কোন প্রকার নিয়ম সংযমের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিবে ? সমাজব্যবস্থার মধ্যে তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, তাহারা নিজেরাই অনেকবার প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু প্রবেশমাত্রেই তাহারা হয় কোন অসতর্ক ব্যবহারের দরুন, না হয় কোন উদ্দাম বাসনার উন্মাদনায়, না হয় বা নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় পুনরায় সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে। সমাজ বারবার গড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে ; বারবার মানুষের কার্য্যের ফলে, আধ্যাত্মিক উপাদানের অভাবে গঠনশীল সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। ইউরোপের বর্ব্বর অবস্থার এইটিই প্রধান কারণ। যতদিন

পর্য্যন্ত এই দুই কারণ বর্ত্তমান ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত ইউরোপের এই বর্ব্বর অবস্থা ছিল। এখন দেখা যাউক, কখন ও কিরূপে এই অবস্থার অন্ত হইল।

ইউরোপ এই অবস্থা অতিক্রম করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। মানুষ নিজের দোষেই এইরূপ দশাপ্রাপ্ত হইতে পারে সন্দেহ নাই, তথাপি সে অধিককাল এরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে চাহে না—ইহাই মানুষের স্বভাব। সে যতই অশিষ্ট, অজ্ঞান, স্বার্থনিরত, স্বকামপরায়ণ হউক না, তাহার অন্তরের মধ্যেই এমন একটা সহজ প্রেরণা ও সংস্কার আছে, যাহার বলে সে জানিতে পারে, ইহাতে তাহার জীবনের সাফল্য নাই, তাহার অন্যবিধ শক্তি আছে, তাহার নিয়তিও অন্যবিধ। অশান্তির মধ্যে, বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাহার অন্তর হইতে শৃঙ্খলার জন্য, উন্নতির জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা উঠিতে থাকে, তাহাকে স্থির হইতে দেয় না। পাশবিকতা ও স্বার্থপরতার মধ্য হইতেই ন্যায়ের জন্য, দূরদর্শিতার জন্য, বিকাশ ও পুষ্টির জন্য তাহার একটা উদ্বেগ উপস্থিত হয়। বাহ্য জগৎ, সামাজিক জগৎ, অন্তর্জ্জগৎ, সর্ব্বত্রই সে সংস্কার ও উন্নতিসাধনের প্রেরণা অনুভব করে, এবং কোন্ অভাববোধের প্রেরণায় সে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা না জানিয়াও সে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদিও এই সকল বর্ব্বরজাতি সভ্যতা লাভ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ও অযোগ্য ছিল, যদিও সভ্যতার মূল নীতিসূত্রের সহিত পরিচিত হওয়া মাত্রই ইহার প্রতি তাহাদের একটা বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল, তথাপি ইহা সত্য যে, ইহারা প্রাণে প্রাণে এই সভ্যতার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিয়াছিল।

উপরন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে, রোমসাম্রাজ্যের বিরাট শাসনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ তখনও অনেক পরিমাণে রহিয়া গিয়াছিল। মানুষের

চিত্তপটে, বিশেষতঃ পৌর পরিষদের সদস্য, বিশপ, যাজক প্রভৃতি রোমীয় জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকশ্রেণীর চিত্তপটে সাম্রাজ্যের নাম, সেই বিশাল মহামহিমান্বিত সমাজের স্মৃতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছিল।

বর্ব্বরদিগের মধ্যেই এমন অনেকে ছিল, যাহারা রোমসাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহারা সাম্রাজ্যের সেনাভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, আবার পরে সেই সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে। রোমীয় সভ্যতার নামরূপের মহিমায় তাহাদের চিত্ত অভিভূত এবং অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে এই সভ্যতার অনুকরণ, পুনরু-জ্জীবন ও সংরক্ষণের জন্য তাহারা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতে লাগিল। পূর্ব্ববর্ণিত বর্ব্বর অবস্থা অতিক্রম করিবার পক্ষে এ কারণটিও তাহা-দিগকে প্রেরণা দান করিয়াছিল।

এই দুই কারণ ব্যতীত একটি তৃতীয় কারণের কথা সকলেরই মনে হইবে; সেটি খৃষ্টীয় চর্চ্চ বা যাজকসঙ্ঘ। খৃষ্টীয় চর্চ্চ ছিল একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুব্যবস্থিত সমাজতন্ত্র; ইহার নির্দ্দিষ্ট নীতিপদ্ধতি ছিল, বিধিবিধান ছিল, নিয়ম শাসন ছিল, আর ছিল স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য, বিজেতৃবৃন্দের পরাজয় সাধনের জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই যুগের খৃষ্টানদিগের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁহারা নৈতিক ও রাজনৈতিক সকল বিষয়েই চিন্তা করিয়াছেন, সকল বিষয়েই যাঁহাদের সুদৃঢ় ধারণা ও মতামত ছিল, প্রবল মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, এবং সেই সকল মতামত, সেই সকল ভাব প্রচার করিবার জন্য, বাস্তব রাজ্যে মুখ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, শক্তিশালী করিবার জন্য সজীব আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল। পঞ্চম ও দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে খৃষ্টীয় চর্চ্চ যেমন চতুর্দ্দিকের সমাজে প্রভাববিস্তার

করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সমস্ত জগতের উপর নিজের বিশিষ্ট ছাপ মারিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে, এরূপ কোন সমাজ বা সম্প্রদায় কোন কালেই করে নাই। এই চর্চ্চের ইতিহাস যখন বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে, তখন চর্চ্চ যে কি কি কাজ করিয়াছে, তাহা সমস্তই দেখিতে পাইব। বর্ব্বরতাকে স্বীয় শাসনের অধীনে আনিয়া, তাহাকে সভ্য করিয়া তুলিবে, এই উদ্দেশ্যে বর্ব্বরতাকে সে সকল দিক্ দিয়া আক্রমণ করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে সভ্যতাবিকাশের এক চতুর্থ কারণ উল্লেখ করিব। এ কারণটির যথাযোগ্যরূপে মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব; কিন্তু তাই বলিয়া ইহার যাথার্থ্য, ইহার কার্য্যকারিতা কিছু কম নহে। এ কারণটি হইতেছে মহাপুরুষের আবির্ভাব। বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষের কেন আবির্ভাব হয় এবং জগতের উন্নতিসাধনকল্পে তাঁহারা ঠিক কি সহায়তা করিয়া যান, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেটা বিধাতার এক রহস্য। কিন্তু মহাপুরুষ যে যুগে যুগে আসেন এবং জগতের উন্নতিও যে সাধন করেন, সে সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তা নাই। এমন সব মানুষ আছেন, যাঁহাদের নিকট অরাজকতা ও সামাজিক অবনতির দৃশ্য অতীব পীড়াদায়ক, যাঁহাদের সমগ্র চিত্তবৃত্তি ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাঁহাদের চক্ষে এটা একটা বিসদৃশ বীভৎস ব্যাপাররূপে প্রতীয়মান হয়, এবং এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন জন্য, জগতের মধ্যে একটা নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য, তাহাকে একটা সার্ব্বজনীন, সুনিয়ত স্থায়ী প্রকৃতি দান করিবার জন্য তাঁহাদের অন্তরে একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। এইরূপে এক ভীষণ শক্তির উদ্ভব হয়; এ শক্তি অনেক সময় স্বেচ্ছাতন্ত্র হইতে পারে, সহস্র পাপ, সহস্র পদস্খলনে ইহার গতিপথ কলঙ্কিত হইতে পারে; কারণ, এ শক্তি

ত মানবশক্তি, মানবচরিত্রসুলভ দৌর্ব্বল্যের অতীত ইহা নহে; তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, এ একটা মহাশক্তি, এ শক্তির একটা গৌরব আছে, একটা কল্যাণকারিতা আছে; কারণ, এ মানবজাতিকে মানব উদ্যমের দ্বারাই উন্নতির পথে, ভবিষ্যতের দিকে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দেয়।

এই সকল কারণ ও শক্তির সমবায়ে পঞ্চম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপীয় সমাজকে বর্ব্বরতার কবল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নানা বিচিত্র চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছিল।

প্রথম চেষ্টাটি স্বল্প পরিমাণেই কার্য্যকরী হইয়াছিল, কিন্তু ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; কারণ, এ চেষ্টা বর্ব্বর জাতিদের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। ষষ্ঠ ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন বর্ব্বর জাতির বিবিধ বিধান সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ হইল। ইহার পূর্ব্বে এগুলি কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। রোমীয় সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব্বে বর্ব্বরদিগের জীবনযাত্রা অলিখিত রীতি নীতির দ্বারাই শাসিত হইত। যে সকল বিধি বিধান লিপিবদ্ধ হইল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই উল্লেখযোগ্য—বর্গণ্ডীয় বিধি, সালীয় বিধি, রিপুয়ারীয় ফ্রাঙ্কদিগের বিধি, বিসিগথ্ বিধি, লম্বার্ড বিধি, সাক্সন বিধি, ফ্রিসীয় বিধি, বাভেরীয় বিধি ও আলেমানী বিধি। এখানে স্পষ্টতঃই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইবার একটা প্রথম চেষ্টা দেখা যাইতেছে; সমগ্র সমাজকে একটা সাধারণ বিধিনিয়মের অধীনে আনিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এ চেষ্টার সফলতা যে খুব অধিক হইবে, এরূপ আশা করা যায় না; কারণ, বর্ব্বর সমাজ যখনও রোমীয় সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে আসিয়া বাস করে নাই, যখনও তাহারা যাযাবর সামরিক জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তে স্থাবর ভূসম্পত্তির অধিকারী

হইয়া সুস্থির জীবনযাত্রা আরম্ভ করে না, সেই আদিম সমাজের বিধি-বিধান এখন লিপিবদ্ধ হইল মাত্র। এই সকল বর্ব্বরসংহিতার মাঝে মাঝে কোথাও বা এমন দুই একটা বিধান পাওয়া যায় বটে, যাহাতে বিজিত ভূসম্পত্তির উল্লেখ আছে অথবা প্রাচীন অধিবাসিবর্গের সহিত বিজেতৃবর্গের সম্বন্ধনির্দ্দেশের চেষ্টা আছে; কিন্তু এই সকল বিধির অধিকাংশই জার্ম্মান জাতির প্রাচীন অবস্থার পক্ষেই প্রযোজ্য। নবীন জার্ম্মান সমাজে এই সকল বিধি অধিকাংশ স্থলেই অপ্রয়োজ্য ছিল, এবং এই সমাজের বিকাশ সাধনে ইহাদের কার্য্যকারিতা অতি সামান্য।

এই সময়েই ইটালী ও দক্ষিণ গলে আর এক প্রকার চেষ্টা আরম্ভ হয়। সেখানে অন্য স্থানের মত রোমীয় সমাজ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় নাই। নগরগুলির মধ্যে অন্য দেশ অপেক্ষা কিছু অধিক শৃঙ্খলা ও জীবনী শক্তি ছিল। এই নগরগুলির মধ্যে সভ্যতা পুনরায় মাথা তুলিতে চেষ্টা করিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি থিয়োডোরিকের শাসনকালে ইটালীর অষ্ট্রোগথ্ রাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে দেখিব, বর্ব্বর জাতি ও বর্ব্বর রাজার শাসনেও প্রাচীন পৌরতন্ত্র বেশ টিকিয়া আছে এবং চারি দিকের ঘটনাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। দক্ষিণ গলেও ঐ ব্যাপার দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আলারিক নামক টুলুস্ নগরের একজন বিসিগথ্ রাজার আদেশে রোমীয় ব্যবহার-বিধি সঙ্কলিত হইল; তিনি ঐ সংহিতা গ্রন্থ তাঁহার রোমীয় প্রজাবর্গের জন্য প্রকাশিত করিলেন।

স্পেনে আর এক পক্ষ হইতে সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইল। চর্চ্চই এই চেষ্টার প্রবর্ত্তক। প্রাচীন জার্ম্মান যোদ্ধৃসভার পরিবর্ত্তে টোলেডোর চর্চ্চ-সংসদেরই স্পেনে প্রাধান্য হইল। যদিও সম্ভ্রান্তপদস্থ

বাহিরের লোকও এই সংসদে উপস্থিত হইতেন, তথাপি বিশপদিগেরই তথায় প্রাধান্য। বিসিগথ্‌দিগের ব্যবহার-বিধির আলোচনা করুন; দেখিবেন, তাহা মোটেই বর্ব্বর-বিধি নহে; এ সংহিতা নিশ্চয়ই সে কালের দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক অর্থাৎ যাজকসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সাধারণ নীতির, সাধারণ তত্ত্বের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য, সে সকল নীতি ও তত্ত্বের সহিত বর্ব্বর রীতি নীতির কোনই সম্পর্ক নাই। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। আপনারা জানেন, বর্ব্বরদিগের সমস্ত বিধি বিধান ব্যক্তিগত ও জাতিগত অর্থাৎ এক জাতির লোকের পক্ষেই এক বিধি প্রয়োজ্য। রোমীয়গণের পক্ষে রোমীয় বিধির প্রয়োজন হইবে, ফ্রাঙ্কদিগের পক্ষে ফ্রাঙ্ক বিধির প্রয়োজন হইবে; প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র বিধি, যদিও সকলেই এক দেশে এক রাজশাসনে বাস করিতেছে। ইহারই নাম হইল ব্যক্তিগত বিধান; এবং ইহার উল্টা বিধানের নাম বাস্তব বিধান, যে বিধান জাতিকুল-নির্ব্বিশেষে এক ভূখণ্ডের অধিকারী সকলের পক্ষেই প্রয়োজ্য। এখন বিসিগথ্‌দের বিধান ব্যক্তিগত বা জাতিগত নহে, দেশগত। বিসিগথ্‌ই হউক, রোমীয়ই হউক, স্পেনের সমস্ত অধিবাসী একই বিধানের বশবর্ত্তী। এই আলোচনায় আরও কিছু দূর অগ্রসর হউন, দেখিবেন, দার্শনিকতার আরও নিদর্শন পাওয়া যাইবে। বর্ব্বরদিগের মধ্যে বিভিন্ন লোকের অবস্থা ও পদবী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইত। বর্ব্বর, রোমীয়, স্বাধীন ভূস্বামী, আশ্রিত প্রজা, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের জীবনের মূল্য আইনের চক্ষে এক ছিল না। বিসিগথ্‌দের শাসনকালে আইনের চক্ষে সকলেরই জীবনের এক মূল্য—এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বিচার-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখিবেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বারা ন্যায় পরীক্ষার পরিবর্ত্তে সাক্ষ্যদ্বারা

প্রমাণ, যুক্তিমূলক বিচার প্রভৃতি সভ্যসমাজোপযোগী বিচার-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এক কথায় সমগ্র বিসিগথ বিধির মধ্যে একটা সুচিন্তিত, সুসম্বদ্ধ ও সামাজিক ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়।

অতএব স্পেনে আরব আক্রমণের অব্যবহিত কাল পর্য্যন্ত যাজকতন্ত্রই সভ্যতাকে বাঁচাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

ফ্রান্সে এই একই চেষ্টা আর এক শক্তির দ্বারা আরব্ধ হইল। এখানে মহাপুরুষের চেষ্টা, বিশেষতঃ শার্লমেনের চেষ্টাই উন্নতির মূল। নানা দিক্ হইতে তাঁহার শাসনকালের পর্য্যালোচনা করুন; দেখিবেন, প্রজাবর্গকে সভ্য করিয়া তুলিবার সংকল্পই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয়। প্রথমে তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহের আলোচনা করুন। তিনি সর্ব্বদাই যুদ্ধক্ষেত্রে কাল কাটাইতেছেন, দক্ষিণ হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিক্ পর্য্যন্ত, এব্রোনদী হইতে এল্‌ব্‌ অথবা ওয়েজার নদী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত। আপনারা কি বিশ্বাস করিতে পারেন যে, এ যুদ্ধগুলি সমস্তই খামখেয়ালী ব্যাপার, অথবা কেবলমাত্র বিজয়-লিপ্সার পরিচয়? কিছুতেই না। আমি এ বলিতে চাই না যে, তাঁহার যুদ্ধপ্রণালীর মধ্যে অনেক পরিমাণ চাতুরী, কৌশল বা নীতি-কৌটিল্য ছিল না; কিন্তু তিনি এক বৃহৎ প্রয়োজনের তাড়নায় এই সকল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন; সে প্রয়োজন আর কিছুই না, বর্ব্বরতার উৎসাদন। তাঁহার সমগ্র রাজত্বকাল ব্যাপিয়া তিনি একদিকে মুসলমান আক্রমণ, অপর দিকে স্লাব্‌ আক্রমণ, এই উভয় আক্রমণ প্রতিরোধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শার্লমেনের রাজত্বের যে যুদ্ধবিগ্রহ, ইহাই হইল তাহার প্রকৃতি; সাক্‌সনদিগের বিরুদ্ধে যে তিনি যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়িয়া তাঁহার আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী যদি

আলোচনা করেন, সে ক্ষেত্রেও ঐ একই প্রকৃতি দেখিতে পাইবেন। তাঁহার অধিকারভুক্ত সমস্ত দেশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও একত্ব স্থাপন করা—ইহাই হইল তাঁহার শাসনতন্ত্রের মূলনীতি। শার্লমেনের অধিকার নির্দ্দেশ করিতে হইলে রাজ্য (Kingdom) বা রাষ্ট্র (State) কোন আখ্যাই ঠিক থাকে না; কারণ, ঐ শব্দ দুইটির দ্বারা যে নিয়ম-শৃঙ্খলার ভাব ব্যঞ্জিত হয়, শার্লমেন-শাসিত সমাজের পক্ষে সে ভাব প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু এটা নিশ্চয় যে, এক বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও বর্ব্বরতার দৃশ্য তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি এই বীভৎস দৃশ্যের পরিবর্ত্তন সাধনে সচেষ্ট হইলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র একদল কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন, যাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশের রীতিনীতি লক্ষ্য করিবেন ও সংস্কার করিবেন অথবা তাঁহার নিকট সমস্ত বিজ্ঞাপন করিবেন। পরে তিনি কতকগুলি সাধারণ সম্মিলনীর সাহায্যে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময়ে এই সম্মিলনীগুলির পূর্ব্বাপেক্ষা নিয়মিত অধিবেশন হইতে লাগিল। এই সকল সভায় তাঁহার রাজ্য-মধ্যে গণ্যমান্য যে কেহ আছে, সকলকেই উপস্থিত করাইতেন। সেগুলি অবশ্য জনগণের স্বাধীন সম্মিলনী নহে; অথবা আমরা যেরূপ স্বাধীন আলোচনায় এখন অভ্যস্ত, সেরূপ আলোচনা অবশ্য সেখানে হইত না; এই সম্মিলনগুলি শার্লমেনের নিকট কেবল তথ্যসংগ্রহের ও উচ্ছৃঙ্খল প্রজাবৃন্দের মধ্যে কোন প্রকার শৃঙ্খলা ও একতা স্থাপনের উপায়স্বরূপ ছিল।

শার্লমেনের রাজত্বের যে দিক্ দিয়াই বিচার করুন, সর্ব্বত্রই এই এক ব্যাপার—বর্ব্বরতার উৎসাদন ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ, পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি প্রীতি, যাজকসম্প্রদায়ের পক্ষ

সমর্থন—এক কথায় তিনি সমাজের উন্নতিকল্পে বা ব্যক্তির উন্নতি-কল্পে যাহা কিছু করিতে গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই একই মূল-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছুকাল পরে ইংলণ্ডে রাজা আল্‌ফ্রেড্‌ এইরূপ চেষ্টাই করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা গেল যে, সভ্যতামুখী যে কয়টি শক্তি ইউরোপকে বর্ব্বরতার কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল বলিয়া পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইউরোপের কোন না কোন অংশে পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত সেই সমস্ত শক্তিসমূহের ক্রিয়া চলিতেছিল।

কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটীই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। শার্লমেন তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যশাসনপদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। স্পেনে খৃষ্টীয় চর্চ্চও সেইরূপ যাজকতন্ত্রনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। ইটালী ও দক্ষিণ গলে রোমীয় সভ্যতা বারংবার মাথা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু এই যুগের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে এ সকল চেষ্টার বিশেষ কোন ফল হয় নাই। রোমীয় সভ্যতা যথার্থই কিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি পুনরর্জ্জন করিয়াছিল—অনেক পরে, দশম শতাব্দীর শেষের দিকে। সেই সময় পর্য্যন্ত ইউরোপে বর্ব্বরতার উৎসাদন ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকল্পে যত কিছু চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছিল। সংস্কার চেষ্টার প্রবর্ত্তকগণ জনবৃন্দকে যতখানি উন্নত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, বাস্তবিক পক্ষে মানুষ তখনও তত উন্নত হয় নাই; তাঁহারা সকলেই নানা আকারে এমন একটা সুবিস্তৃত ও সুনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার পক্ষে তাঁহাদের ক্ষমতাও পর্য্যাপ্ত ছিল না, লোকসমূহের মানসিক অবস্থাও উপযোগী

ছিল না। তথাপি তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে নিরর্থক হয় নাই। দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে শার্লমেনের বিশাল সাম্রাজ্যের কথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। টোলেডোর যাজকসংসদেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু বর্ব্বর শাসনেরও যে তখন অন্তিমকাল উপস্থিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; ইতিমধ্যে দুইটী বড় রকমের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।—

১। উত্তর ও দক্ষিণ হইতে বর্ব্বরদিগের আক্রমণ-বেগ নিরুদ্ধ হইয়াছে। শার্লমেনের সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে খণ্ডিত ও বিভক্ত হইয়া গেলে রাইন্ নদীর পূর্ব্বতীরে যে সকল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারা, যে সকল বর্ব্বরজাতি জার্ম্মানী হইতে পশ্চিম দিকে আসিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের পথ রোধ করিয়া বসিল। নর্‌মান আক্রমণের ইতিহাস হইতেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সকল টিউটনজাতি সমুদ্র-পথে ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, এই যুগে সামুদ্রিক অভিযানের দৃষ্টান্ত বড় বেশী পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দী হইতে এই সামুদ্রিক অভিযান নিত্য ও ব্যাপক হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই যে, স্থল-পথে আক্রমণ ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, স্থলপথে রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত তখন স্থায়ী ও সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সকল বর্ব্বরজাতিকে একেবারে ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইল, তাহাদিগকেও বাধ্য হইয়া স্থলপথ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রপথ আশ্রয় করিতে হইল। নরমান আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপের যতই ক্ষতি হউক না কেন, সে ক্ষতি পূর্ব্ববর্ত্তী স্থলপথে আক্রমণের মত সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে নাই, উদীয়মান সমাজকে সেরূপ ব্যাপকভাবে উদ্বাস্ত করিয়া তোলে নাই।

দক্ষিণেও সেই এক ব্যাপার দেখা যায়। আরবরা তখন স্পেনে

আড্ডা লইয়াছে ; তাহাদের সহিত খৃষ্টানদের যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকিল বটে, কিন্তু তাহাতে এমন আর নূতন করিয়া কোন অধিবাসিবর্গের স্থানচ্যুতি ঘটিল না। তখনও সারাসেন্‌দের ভিন্ন ভিন্ন দল ভূমধ্য-সাগরের উপকূলভাগে উপদ্রব করিতেছিল বটে ; কিন্তু মুসলমান আক্রমণের প্রথম বড় বেগটা তখন এক্‌প্রকার রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে।

২। এই যুগে ইউরোপের মধ্যভাগেও সর্ব্বত্র লোকসমূহের চলাচল, বাসভূমির অনুসন্ধানে দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ, এ সমস্ত অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। লোকবর্গ তখন স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে ; তাহাদের সম্পত্তি স্থায়ী ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং মানুষে মানুষে পরস্পর সম্বন্ধ তখন আর আকস্মিক উৎপাত ভিন্ন অন্য কারণে দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে না। মানুষের আভ্যন্তরীণ ও নৈতিক অবস্থার মধ্যেই একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনপ্রণালী যেমন স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তা, ভাব, ধারণা, সমস্তই স্থায়ী নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। যে যে স্থানে সে বাস করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানে যে সকল নূতন নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিল, যে যে ভূসম্পত্তি সে সন্তানবর্গের জন্য রাখিয়া যাইবে বলিয়া সংকল্প করিতে লাগিল, যে বাসগৃহ একদিন সে নিজের দুর্গ (castle) বলিয়া পরিচিত করিবে, যে মুষ্টিমেয় ঔপনিবেশিক ও ক্রীতদাসের সমষ্টি একদিন গ্রামে পরিণত হইবে—এই সকলের প্রতিই সে আসক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে লাগিল, যেন সেগুলি মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির মাপ অনুসারে ছোট করিয়া কাটা। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমশঃ একটি সংহতি-নীতি অনুপ্রবিষ্ট হইল, যাহাতে কোন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য

নষ্ট না হইয়াও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিলিয়া এক একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল। বর্ব্বরদিগের রীতিনীতির মধ্যেই এই সংহতি-নীতির বীজ নিহিত ছিল। একদিকে প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজ নিজ ভূসম্পত্তির মধ্যে পরিবার ও ভৃত্যবর্গ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; অন্য দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সকল যুদ্ধপ্রবণ ভূস্বামিবর্গের মধ্যে একটা দায়াধিকারক্রম গড়িয়া উঠিল। এ ব্যাপারটি কি? ইহা আর কিছুই নহে, বর্ব্বর-সমাজের মধ্য হইতে ভূস্বামিতন্ত্রের, ফিউডালিজ্‌ম্‌-এর উদ্ভব। ইউ-রোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জার্ম্মানীর অংশটুকুই যে প্রথমে প্রাধান্য লাভ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। জার্ম্মানদের হাতেই তখন শক্তি, তাহারা ইউরোপ বাহুবলে জয় করিয়াছে; তাহাদের নিকট হইতেই ইউরোপকে তাহার প্রথম সামাজিক গঠন ও সমাজ-ব্যবস্থা লইতে হইয়াছিল। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ফিউডা-লিজ্‌ম্‌ বা ভূস্বামিতন্ত্র, তাহার প্রকৃতি, ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে তাহার স্থান ও কার্য্যকারিতা কি, ইহাই আমার পরবর্ত্তী বক্তৃতার আলোচ্য বিষয়। এই বিজয়ী ভূস্বামিতন্ত্রের আধিপত্যের মাঝখানেই আমরা পদে পদে দেখিব যে, ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ—রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্র, পৌরতন্ত্র—সকলেই বাঁচিয়া আছে, কেহই বিনষ্ট হয় নাই; এবং আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে, ইহাদের কেহই ফিউডা-লিজ্‌ম্‌-এর চাপে একেবারে তলাইয়া যাইবে না; ফিউডালিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে সংঘর্ষে তাহারা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইবে, ফিউডালিজ্‌ম্‌-এর প্রকৃতি কিয়ৎপরিমাণে আত্মসাৎ করিবে, এবং ভবিষ্যতে তাহাদের অভ্যুদয়কাল কখন আসিবে, তাহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর আধুনিক ইতিহাসের আদিপর্ব্বে অর্থাৎ বর্ব্বর-শাসনযুগে ইউরোপের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, এই বর্ব্বরযুগের অবসান-কালে দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে প্রথম যে শাসননীতি ও শাসনব্যবস্থা বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করিল, সেটি ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ বা ভূস্বামিতন্ত্র। ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ই বর্ব্বরতন্ত্রের প্রথম সন্তান। অতএব এখন এই ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধেই আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

এ কথা অবশ্য বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ঘটনাপরম্পরার ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। ভূস্বামিতন্ত্রের বাহ্য ঘটনার ইতিহাস আমি এখানে দিতে আসি নাই। আমাদের আলোচ্য বিষয় সভ্যতার ইতিহাস। বাহ্য ঘটনার আবরণের মধ্যে সভ্যতার মূল তত্ত্বগুলি কিরূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাই আমাদের সন্ধানের বিষয়।

অতএব বাহ্য ঘটনা বলুন, সমাজ-সঙ্কটই বলুন, আর সমাজের বিচিত্র অবস্থাবিপর্য্যয়ই বলুন, এ সমস্ত সভ্যতার ইতিহাসের দিক্ দিয়াই আমরা আলোচনা করিব। আমরা দেখিব, তাহারা কে কিরূপে সভ্যতার বিকাশে বাধা দিয়াছে বা সহায়তা করিয়াছে, সভ্যতাকে তাহারা কে কি দিয়াছে বা দেয় নাই। আমরা কেবল এই ভাবেই ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার আলোচনা করিব।

আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভেই সভ্যতার মূল প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, সভ্যতার মধ্যে দুইটি মূল তত্ত্ব নিহিত আছে—

একদিকে আত্মার বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মনুষ্যত্বের বিকাশ; অপর দিকে মানুষের বাহ্য অবস্থার ও সামাজিক বেষ্টনীর পুষ্টি ও পরিণতি। সুতরাং আমরা যে কোন নূতন ঘটনা বা নূতন ব্যবস্থা বা জগতের কোন নূতন অবস্থার সম্মুখে উপস্থিত হইব, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, একদিকে সে মানুষের আত্মার বিকাশে কি সহায়তা করিয়াছে বা কি বাধা দিয়াছে, অপর দিকে সে সমাজের পুষ্টি বিষয়েই বা কিরূপে অনুকূল বা প্রতিকূল আচরণ করিয়াছে।

আপনারা আগে হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের কতকগুলি বড় বড় সমস্যা এড়াইয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কোন একটা ঘটনা বা ব্যবস্থা মানুষের আত্মার বা সমাজের পুষ্টি ও বিকাশ সাধনে কি সহায়তা করিল বা না করিল, তাহা জানিতে হইলে তাহার পূর্ব্বেই জানা আবশ্যক যে, মানবাত্মার বা মানবসমাজের প্রকৃত উন্নতি ও পুষ্টি কাহাকে বলে। তবেই আমরা বুঝিতে পারিব, কোথায় উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতেছে, পুষ্টি না হইয়া বিকৃতি ঘটিতেছে, কোন্ উন্নতি উন্নতির মিথ্যা ভাণমাত্র, কোন্ পুষ্টি অস্বাস্থ্য-জনিত অযথা স্ফীতিমাত্র।

আমাদের ইতিহাস ব্যাখ্যানের মধ্যে যখন যখন এইরূপ নৈতিক ও দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসার প্রয়োজন হইবে, তখন সে আলোচনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আধুনিক যুগের চিন্তাস্রোত লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায় যে, দর্শন ও ইতিহাসের সমন্বয়ই হইতেছে আধুনিক আলোচনাপদ্ধতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ। আমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, বস্তুর সহিত বিজ্ঞানের, তথ্যের সহিত তত্ত্বের, চিন্তার সহিত ব্যবহারের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ। এতদিন পর্য্যন্ত মানব ইতিহাসে এই সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় নাই। মানুষের চিন্তা ও মানুষের ব্যবহার

পরস্পর নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র পথে চলিয়া আসিয়াছে। মানুষের চিন্তা যখন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখন সে কেবল ভাবোন্মাদের আকারে উন্মাদনা-শক্তির প্রচণ্ড বেগে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে। মানবসমাজের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে দুইটী বিরুদ্ধ দল পরস্পরনিরপেক্ষভাবে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছে। এক দিকে বিশ্বাসীর দল, তত্ত্ববাদীর দল, ভাবোন্মত্তের দল, অপর দিকে ব্যাবহারিকের দল, যাঁহারা কোন সাধারণ নীতি বা তত্ত্বকে আমল দেন না, যাঁহারা কেবল অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন, ঘটনা-স্রোতের গতি লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত প্রয়োজন অনুসারে সুযোগ সুবিধার অনুবর্ত্তন করিয়া চলেন। এ অবস্থাটা কিন্তু এখন চলিয়া যাইতেছে। এখন হইতে মানবসমাজে শুদ্ধ তত্ত্ববাদীরও আধিপত্য থাকিবে না, শুদ্ধ ব্যবহারবাদীরও আধিপত্য থাকিবে না। এখনকার কালে মানবসমাজ শাসন করিতে হইলে, মানবসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে, তত্ত্বও জানিতে হইবে, তথ্যও জানিতে হইবে, ধর্ম্ম-নীতির গৌরবও স্বীকার করিতে হইবে, প্রয়োজনের মূল্যও মানিতে হইবে, অতএব আমরা উপস্থিত ক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগোচিত চিন্তাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রতিক্ষণেই ঘটনাবলী আলোচনা করিতে করিতে তত্ত্বালোচনায় আসিয়া পড়িব। ব্যবহারক্ষেত্রে ভাবোন্মাদনার বশে তথ্যনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ তত্ত্বের অনুসরণ করিতে গিয়া মানুষ নিজকে কিরূপ আবদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ফেলে, ফরাসী জাতি অল্পদিন হইল, বিগত বিপ্লবের সময় তাহার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতার ফলে ফরাসী জাতির মধ্যে বিশুদ্ধ তত্ত্বের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা তথ্যের দিকে, বাস্তব ঘটনার দিকে, বিশিষ্টক্ষেত্রোপযোগী, বিশিষ্ট বিধিবিধানের দিকে মুখ ফিরাইয়াছি।

ইহাতে আক্ষেপের বিষয় কিছুই নাই। ইহাদ্বারা আমরা সত্যরাজ্যের একটা নূতন পথের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এই বস্তুতন্ত্রতার ঝোঁকে যেন আমরা সামঞ্জস্য হারাইয়া না ফেলি। এ কথা যেন না ভুলিয়া যাই যে, জগতে সত্যই একমাত্র শাসনাধিকারী; বাস্তব ঘটনা যে পরিমাণে সত্যকে প্রকাশ করে, সেই পরিমাণেই তাহার মূল্য; চিন্তার মহত্ত্ব, ভাবের মহত্ত্বই প্রকৃত মহত্ত্ব; ভাবরাজ্যের সফলতাই প্রকৃত সফলতা।

অতএব আমাদের ইতিহাস ব্যাখ্যানের যেখানে যেখানে তত্ত্বমূলক বিচারের প্রয়োজন হইবে, আমরা সে আলোচনায় বিমুখ হইব না। ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের সম্পর্কে ভূস্বামিতন্ত্রের আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে একাধিকবার এইরূপ দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

দশম শতাব্দীতে ভূস্বামিতন্ত্রের যে প্রয়োজন ছিল, সে যুগে অন্য কোন ছাঁচে সমাজ গঠন যে সম্ভব ছিল না, ভূস্বামিতন্ত্রের বিস্তৃতি ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেখানে যেখানেই বর্ব্বরতন্ত্রের অবসান হইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভূস্বামিতন্ত্রের ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমটা লোকে দেখিল, এ ত অরাজকতারই জয়জয়কার চলিতেছে। সমস্ত ঐক্য, সার্ব্বজনীন সভ্যতার সমস্ত উপাদান অন্তর্হিত হইয়া গেল; চারিদিকে বিরাট্ সমাজ ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল এবং তাহার স্থলে কতকগুলি ক্ষুদ্র, নিষ্প্রভ, সঙ্কীর্ণ, বদ্ধ সমাজ মাথা তুলিয়া উঠিল। তখনকার লোকের চক্ষে এ ব্যাপার বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ও প্রলয়ের সূত্রপাত বলিয়া মনে হইল। সে কালের কবি ও ইতিবৃত্তকারদের রচনা পাঠ করুন, দেখিবেন, তাঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস যে, তাঁহারা জগতের অন্তিম কালে উপস্থিত হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তখন এক নূতন সৃষ্টির

সূত্রপাত হইল : সমাজক্ষেত্রে তখন ভূস্বামিতন্ত্ররূপ এক নূতন তন্ত্র, নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল। এ ব্যবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাপরম্পরার একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ; সেই যুগে এইরূপ একটা শাসনতন্ত্রেরই একান্ত প্রয়োজন ছিল ; সুতরাং চারি দিকে সমাজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই ভূস্বামিতন্ত্রের ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি, যাজকতন্ত্র, পৌরতন্ত্র, রাজতন্ত্র প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্য বা সম্পর্ক নাই, তাহারাও ইহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে, ইহার ছাঁচে স্ব স্ব প্রকৃতি পুনর্গঠিত করিয়া লইতে বাধ্য হইল, চর্চ্চগুলি ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার মধ্যে একদিকে প্রভুত্বাধিকারী ভূস্বামী (suzerain), অপর দিকে দায়বদ্ধ ভূভোগী প্রজা (vassal) হইয়া পড়িল। পৌরসঙ্ঘগুলিও এক দিকে প্রভু, অন্য দিকে প্রজা হইল। রাজক্ষমতা এখন ভূম্যধিকারীর অধিকারে মণ্ডিত হইয়া আপনার পূর্ব্বপরিচয় লুকাইয়া ফেলিল। শুধু ভূমিবণ্টন ব্যাপারেই ফিউড্যাল নীতির ক্রিয়া আবদ্ধ থাকিল না। জঙ্গলে গাছ কাটিবার অধিকার, জলে মাছ ধরিবার অধিকার প্রভৃতি অধিকারও ভূস্বত্বের ন্যায় ফিউড্যাল নীতি অনুসারে বণ্টিত হইতে লাগিল। চর্চ্চের যে সমস্ত নানাবিধ আয় ছিল, তাহাও এই ভাবে বিলি করা হইল। সমাজের সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যেমন ফিউড্যালিজম্-এর কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করিল, সেইরূপ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্ত তুচ্ছতম উপকরণ পর্য্যন্ত ফিউড্যা-লিজ্ম্-এর ছাপ গ্রহণ করিল।

ফিউড্যালিজ্ম্-এর বাহ্য আকৃতি যে ভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয় অধিকার করিয়া বসিল, তাহাতে প্রথমটা মনে হইতে পারে যে, ফিউড্যাল নীতির অন্তঃপ্রকৃতি ও প্রাণতত্ত্বও বুঝি সর্ব্বত্র জয়ী হইল। কিন্তু সেটা ভুল। সমাজের যে সমস্ত অঙ্গ, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ফিউড্যালিজ্ম্-এর অন্তঃপ্রকৃতির সহিত

সম্পর্কিত ছিল না, তাহারা ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর বাহ্য আকৃতি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু স্ব স্ব মূল প্রকৃতি বা বিশিষ্ট নীতি বর্জ্জন করিল না। চর্চ্চ, বাহিরে ফিউড্যাল্‌ চর্চ্চ হইল; কিন্তু উহা মূলে যাজকতন্ত্রনীতিদ্বারা শাসিত ও অনুপ্রাণিত হইতে থাকিল; ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর ছদ্মবেশকে সে দাসত্বের চাপরাশ ভিন্ন আর কিছুই মনে করে নাই; তাই কখনও রাজ-শক্তির সহায়তায়, কখনও পোপের সহায়তায়, কখনও বা প্রজাশক্তির সহকারিতায় সে এই ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর উচ্ছেদ সাধনের জন্যই অবিরাম চেষ্টা করিয়াছে। রাজতন্ত্র ও পৌরতন্ত্রের ক্ষেত্রেও ঐরূপ ব্যাপার; মূলে তাহারা স্ব স্ব বিশিষ্ট প্রকৃতি দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইতে থাকিল। ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর চাপরাশ সত্ত্বেও ইউরোপীয় সমাজের এই সমস্ত বিচিত্র অঙ্গ, এই বিরুদ্ধপ্রকৃতি শাসনতন্ত্রের ছাপ মুছিয়া ফেলিয়া নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রকৃতির অনুযায়ী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবার জন্য অনবরত চেষ্টা করিয়াছে।

ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর বাহ্য আকৃতি কিরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তাহা দেখা গেল, কিন্তু তাহার অন্তঃপ্রকৃতি ও প্রাণতত্ত্বও যে সেইরূপ সর্ব্বত্র বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি লাভ করিল, এ সিদ্ধান্ত যেন আমরা না করিয়া বসি। আর যে ক্ষেত্রেই ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর বহিঃসাদৃশ্যমাত্র দেখিব, সেই ক্ষেত্রেই ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর যথার্থ পরিচয় লাভ করিব, এরূপ আশা যেন না করি। ফিউড্যালিজ্‌ম্‌কে ভাল করিয়া বুঝিতে ও জানিতে হইলে, আধুনিক সভ্যতার গঠন সম্পর্কে ইহার প্রভাব ও কার্য্যকারিতা বুঝিতে ও বিচার করিতে হইলে, এমন ক্ষেত্রে ইহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, যেখানে ইহার বাহ্য আকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। যেখানে ইউরোপীয় ভূখণ্ডের বর্ব্বরবিজেতৃবর্গের সম্মিলনে, স্তরে স্তরে উচ্চ নীচ পর্য্যায়ে ভূস্বামী ও ভূসম্পত্তির বিন্যাস ঘটিয়াছে,

সেই ক্ষেত্রেই ইহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইবে। আসুন, আমরা এখন সেই ক্ষেত্রেই প্রবেশ করি।

অনতিপূর্ব্বে আমরা ইতিহাসচর্চ্চায় নীতিতত্ত্বের আলোচনা কিরূপ আবশ্যক হয়, তাহা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতমুখে মানবজীবনের আরও একটা দিক্ আছে, যাহা এ পর্য্যন্ত যথাযুক্তভাবে আলোচিত হয় নাই, একটা নূতন ঘটনা বা বিপ্লব বা নূতন সামাজিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা মানুষের শারীরিক জীবনযাত্রাপ্রণালী, মানুষের বাহ্য জীবনে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সমাজের এই বাহ্য অবস্থার দিক্‌টা আমরা সব সময়ে যথোপযুক্তরূপে আলোচনা করি নাই। অথচ এই সকল বাহ্য পরিবর্ত্তন সমগ্র সমাজের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। ইতিতত্ত্ববিদ্ মঁতেস্কিয়্ (Montesquieu) জল বায়ুর প্রভাব সম্বন্ধে কিরূপ গবেষণা করিয়াছিলেন ও ঐ প্রভাবকে কতখানি মূল্য দিতেন, তাহা কাহার অবিদিত আছে? মানুষের উপর জলবায়ুর মুখ্য প্রভাব হয় ত যতটা ব্যাপক বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন, ততটা নহে; অন্ততঃ সে প্রভাবের ক্রিয়া অস্পষ্ট ও তাহার পরিমাপ নির্দ্দেশ করা কঠিন। কিন্তু জলবায়ুর গৌণ প্রভাব, যদ্দ্বারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোককে মুক্ত বায়ুতে বাস করিতে হয়, শীতপ্রধান দেশের লোককে গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, বিভিন্ন দেশের লোককে বিভিন্ন দ্রব্য আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতে হয়, এই গৌণ প্রভাব তুচ্ছ ব্যাপার নহে; কারণ, এইরূপে বাহ্য অবস্থার সামান্য প্রভেদে সভ্যতার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। বড় বড় বিপ্লবমাত্রেই সমাজের বাহ্য জীবনে এইরূপ অনেক পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলে এবং এই সকল পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়।

ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজের বাহ্যাবস্থায় এইরূপ একটা বড় পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলে। ইতিপূর্ব্বে ভূম্যধিকারিবৃন্দ,

যাহারা দেশের মালিক, তাহারা ঝাঁক বাঁধিয়া হয় স্থাবরভাবে সহরে বাস করিত, নয় যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দলে দলে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইত। ফিউড্যাল্-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে সেই লোকেরাই এখন পরস্পর হইতে বহু দূরে আপন আপন আলয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে লাগিল। সভ্যতার গতিপ্রকৃতির উপর এত বড় একটা পরিবর্ত্তনের প্রভাব যে কতখানি হইবে, তাহা আপনারা সহজেই বুঝিবেন। সমাজের কর্তৃত্ব, সমাজ শাসনের কেন্দ্র এখন সহসা সহর হইতে পল্লীগ্রামে চলিয়া গেল। সামাজিক সম্পত্তির অপেক্ষা এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য বাড়িয়া গেল; সামাজিক জীবন অপেক্ষা ব্যক্তিগত জীবনের আদর বাড়িয়া গেল। ফিউড্যাল সমাজ প্রতিষ্ঠার এইটিই হইল প্রথম ফল। এই ফলের সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই দেখিতে পাইব, এই একটি পরিবর্ত্তনের পরিণাম কত দূরব্যাপী।

এখন এই ফিউড্যাল সমাজেরই একটু বিশেষ পরিচয় লওয়া যাউক এবং দেখা যাউক, সভ্যতার ইতিহাসে এই সমাজ কি ভাবে কাজ করিয়াছে। প্রথমে এই ফিউড্যাল্ সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা সরল, আদিম ও ভিত্তিগত উপাদান লইয়া আরম্ভ করা যাউক। মনে করুন, একটি সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডের একমাত্র ভোগাধিকারী তাঁহার ভূসম্পত্তির মধ্যভাগে একেশ্বর হইয়া বাস করিতেছেন। এখন দেখা যাউক, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সমাজ গঠন করিয়া যাহারা বাস করিতেছে, তাহাদের কিরূপ অবস্থা হয়।

তিনি একটি স্বতন্ত্র সুপরিচ্ছিন্ন উচ্চ স্থান বাছিয়া লইয়া, প্রাকার পরিখাদি দ্বারা তাহাকে সুরক্ষিত করিয়া, তাহার মধ্যে নিজের আবাসের জন্য একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। কাহাদিগকে লইয়া তিনি এখানে

বাসস্থাপন করিলেন? তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া। হয়ত জন কয়েক ভূসম্পত্তিহীন স্বাধীন প্রজা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতে লাগিল ও তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। দুর্গের অভ্যন্তরে ইঁহাদের বাস। বাহিরে দুর্গের পাদমূলে চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি দাস ও অন্যান্য লোক আসিয়া একটি উপনিবেশ স্থাপন করিল; তাহারা ভূম্যধিকারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইল। নিম্নভূমির এই উপনিবেশের মধ্যে ধর্ম্ম আসিয়া একটি গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার মধ্যে একজন যাজক বসাইয়া গেল। ফিউড্যাল্‌তন্ত্রের আদিম অবস্থায় এই যাজক এককালে দুর্গেরও পুরোহিত ছিলেন, গ্রামেরও পুরোহিত ছিলেন; ক্রমশঃ এই দুই পদ স্বতন্ত্র হইয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তির অধিকারে গিয়া পড়ে; গ্রামের যাজক তখন গ্রামের মধ্যেই তাঁহার গির্জ্জাঘরের পাশে বাস করিতে লাগিলেন। এই হইল ফিউড্যাল্‌-সমাজের মৌলিক মূর্ত্তি, ইহাকে একটি ফিউড্যাল্‌ অণু বলা যাইতে পারে। এই মূল বীজটিকেই আমাদিগকে প্রথমে বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে—"তুমি মানুষের আত্মার বিকাশে কি সহায়তা করিলে? তুমি মানবসমাজের পুষ্টিই বা কিরূপে অগ্রসর করিয়া দিলে?"

এখনই যে ক্ষুদ্র সমাজটি বর্ণনা করা গেল, তাহারই নিকট এত বড় দুইটি প্রশ্ন উপস্থিত করায় কিছুমাত্র দোষ হইবে না, এবং সে যে উত্তর দিবে, তাহা মানিয়া লইতে কোন দ্বিধার প্রয়োজন নাই। সে যে সমগ্র ফিউড্যাল্‌-সমাজের মূল আদর্শ ও প্রতিনিধি। ভূস্বামী তাঁহার অধিকারভুক্ত লোকবর্গ ও যাজক ছোট আকারেই হউক আর বড় আকারেই হউক, এই তিন উপাদান লইয়াই ফিউড্যাল্‌-সমাজ। অবশ্য ইহা ছাড়া রাজা আছেন, পৌর সমাজ আছে। কিন্তু রাজতন্ত্র

ও পৌরতন্ত্র, ফিউড্যাল্-সমাজের মৌলিক উপাদান নহে—স্বতন্ত্র উপায়ে স্বতন্ত্র নীতি হইতে তাহাদের উদ্ভব।

এই ক্ষুদ্র সমাজের বিষয় চিন্তা করিলে প্রথমেই একটি জিনিষ চোখে পড়ে। এ সমাজে ভূস্বামীর মর্য্যাদা ও গৌরব তাঁহার নিজের চক্ষে ও তাঁহার অনুচরবর্গের চক্ষে খুব বড় আকার ধারণ করে। ব্যক্তিত্বের ধারণা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাব বর্ব্বরসমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর যে আত্মমর্য্যাদাবোধ, এ একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। বর্ব্বরসমাজে প্রত্যেক মানব, প্রত্যেক যোদ্ধা ব্যক্তিহিসাবে যে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অনুভব করিতেন, এ তাহা নহে। এখানে ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তির মর্য্যাদা নহে, ভূসম্পত্তির অধিকারী হিসাবে অধিকার-গৌরব, গৃহস্বামী হিসাবে স্বামিত্বের গৌরব, দাসবৃন্দের চালক হিসাবে প্রভুত্বের গৌরব। এমন অবস্থার ফলে ফিউড্যাল্-সমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে একটা অপরিমিত আত্মগরিমার সৃষ্টি হইল, যাহার যথার্থ তুলনা অন্য কোন সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায় না। এ কথা প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজের মধ্য হইতে একটা আভিজাত্যের নিদর্শন লওয়া যাউক। যথা, ধরুন রোমের পাট্রিসিয়ান্ আভিজাত্য। ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর মত রোমের পাট্রিসিয়ান্ গৃহস্বামী, প্রভু ও জননায়ক ছিলেন। তাহা ছাড়া স্বপরিবারের মধ্যে তিনি পন্টিফ্ বা ধর্ম্মযাজক ছিলেন।

এখন ধর্ম্মযাজক হিসাবে তাঁহার যে মর্য্যাদা, সে মর্য্যাদা আসিয়াছে বাহির হইতে; এ মর্য্যাদায় তাঁহার কোন ব্যক্তিগত গৌরব নাই; তিনি এখানে দেবতার প্রতিনিধি; তিনি ধর্ম্মমন্ত্রের ব্যাখ্যাতা মাত্র। রোমক পাট্রিসিয়ান্ তাহা ছাড়া সেনেট-নামধারী এক পৌর সঙ্ঘের সভ্য। কিন্তু এ মর্য্যাদাও তাঁহার বাহির হইতে পাওয়া, পৌর সঙ্ঘের

নিকট হইতে ধার করা এ মর্য্যাদা। প্রাচীন অভিজাতবর্গের যে পদ-মর্য্যাদা, তাহা ধর্ম্ম ও রাজনীতিসংশ্লিষ্ট, সমাজ হইতে—সঙ্ঘ হইতে তাহার উদ্ভব, তাহা স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র সম্পত্তি নহে। কিন্তু ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর মর্য্যাদা একেবারে ব্যক্তিগত; ইহা কাহারও নিকট হইতে পাওয়া নহে; তাঁহার সমস্ত অধিকার, সমস্ত ক্ষমতা তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। তিনি ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মনিয়ন্তা ছিলেন না; তিনি কোন সেনেটের ধার ধারিতেন না; তাঁহার সমস্ত গৌরব ও মর্য্যাদা তাঁহার একান্ত নিজস্ব। এমন পদের যিনি অধিকারী হইবেন, তাঁহার চরিত্রের উপর যে ইহার প্রভাব কিরূপ প্রচণ্ড হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার মনের মধ্যে না জানি কি ঔদ্ধত্য, কি অহঙ্কার, কি বিরাট দর্পের উদ্ভব হইবে! তাঁহার মাথার উপরে এমন কেহ নাই, যাঁহার তিনি প্রতিনিধি বা ব্যাখ্যাতা; তাঁহার চারি পাশে এমন কেহ নাই, যিনি তাঁহার সমান-পদস্থ; এমন কোন প্রবল বিধিবিধান নাই, যাহা তাঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে; এমন কোন নীতি নাই, যাহা তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে খর্ব্ব করিতে পারে; তাঁহার শক্তির সাধারণ সীমা ও আসন্ন বিপদ্ ব্যতিরেকে আর কোন বাধাই তিনি মানেন না। মানবচরিত্রের উপর ফিউড্যাল্ তন্ত্রের ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল।

এখন ফিউড্যালিজ্ম্-এর দ্বিতীয় পরিণামের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ফিউড্যালিজ্ম্-এর সম্পর্কে আসিয়া মানুষের পারিবারিক জীবন, পারিবারিক সম্বন্ধ যে নূতন আকার ধারণ করিল, তাহার প্রভাব সাধারণতঃ উপেক্ষিত হইলেও নিতান্ত সামান্য নহে।

এ পর্য্যন্ত যত প্রকারের পরিবার-শাসনপদ্ধতি দেখা গিয়াছে, সেগুলির দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করা যাউক। প্রথমতঃ বাইবেল ও প্রাচ্যগ্রন্থাদিতে যে পিতৃতন্ত্র (patriarchal) পরিবারের আদর্শ পাওয়া

যায়, তাহাই ধরা যাউক। এ জাতীয় পরিবার এক বৃহৎ সমাজবিশেষ। এক একটি পরিবার লইয়া এক এক জাতি (tribe)। কুলাধিপতি এই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে তাঁহার পুত্রকন্যা, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, দাসদাসী লইয়া একত্র বাস করেন। তিনি যে শুধু তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করেন, তাহা নহে, অর্থানর্থ, বৃত্তিব্যসন, জীবনযাত্রা, সকল বিষয়েই তাঁহার সহিত তাহাদের কোন প্রভেদ নাই। আব্রাহমের কথা ভাবুন, পাটি্রয়ার্কদের কথা ভাবুন, আধুনিক কালের আরব দলপতিদিগের কথা ভাবুন, সর্ব্বত্রই কি এই এক চিত্র দেখা যায় না?

ক্লান্-পদ্ধতি বা গোষ্ঠীপদ্ধতি বলিয়া আর এক ধরণের পরিবার দেখা যায়। আয়র্লণ্ডে ও স্কটলণ্ডে এই পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। সমগ্র ইউরোপেই বোধ হয়, অধিকাংশ পরিবার এই ক্লান্পদ্ধতির মধ্য দিয়া আসিয়াছে। এ পদ্ধতির মধ্যে কুলাধিপতি ও সাধারণ জনগণের মধ্যে একটা বৃহৎ পার্থক্য দেখা যায়। তাহাদের জীবনযাত্রা একরূপ নহে। অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্য ও দাসত্ব করিত; সর্দ্দারের কোন কাজ ছিল না, তিনি ছিলেন যুদ্ধপ্রিয়। অথচ তাহারা সকলেই এক বংশের সন্তান, সকলের কৌলিক নাম এক; এবং জ্ঞাতিত্ব, প্রাচীন কুলপদ্ধতি, প্রাচীন কুলগৌরব প্রভৃতি দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত থাকায় ক্লান্ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একপ্রকার সাম্যও দেখা যাইত।

ইতিহাস হইতে এই দুইটি প্রধান পারিবারিক পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এর মধ্যে কি ফিউড্যাল্ পরিবারের পরিচয় পাওয়া গেল? অবশ্যই গেল না। প্রথমে মনে হয়, ফিউড্যাল্ পরিবারের সহিত "ক্লান"-পদ্ধতির পরিবারের বুঝি কিছু সম্বন্ধ আছে। কিন্তু দুইএর মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য অনেক অধিক। ফিউড্যাল্ ভূস্বামী যে ক্ষুদ্র জনসমাজদ্বারা বেষ্টিত হইয়া বাস করেন, তাহাদের সহিত তাঁহার

বংশগত কোন সম্পর্কই নাই। তাহারা তাঁহার কৌলিক নাম ধারণ করে না। তাঁহার জীবনযাত্রা ও বৃত্তির সহিত তাহাদের জীবনযাত্রা ও বৃত্তির কোন সাদৃশ্য নাই; তাঁহার কোন কার্য্য নাই, তাহারা শ্রমজীবী। ফিউড্যাল্ পরিবার ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ; ইহার গণ্ডী বিস্তৃত হইয়া জাতি পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়াই এই পরিবারের গঠন; অবশিষ্ট জনসমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া দুর্গের সঙ্কীর্ণ পরিবারমধ্যেই এই পরিবারের জীবনযাত্রা। দাস ও ঔপনিবেশিকবর্গ এ পরিবারের অন্তর্গত নহে; কারণ, তাহাদের উদ্ভব স্বতন্ত্র, পদমর্য্যাদা হিসাবে তাহাদের সহিত এ পরিবারের পার্থক্য অপরিমেয়। চারি দিকের সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ও উচ্চপদস্থ পাঁচ ছয়টি ব্যক্তি লইয়া ফিউড্যাল্ পরিবারের গঠন। এবং এই গঠনবৈশিষ্ট্যের জন্য ইহার প্রকৃতির মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এ পরিবার সঙ্কীর্ণ ও কেন্দ্রীভূত; কাহাকেও ইহারা বিশ্বাস করিতে পারে না; নিজেদের অনুচরবর্গের হস্ত হইতেও আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে সতত প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। এরূপ পরিবারপদ্ধতিতে পরিবারের আভ্যন্তরীণ জীবন, পারিবারিক আচার-ব্যবহার অবশ্যই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এ কথা অবশ্য মানি যে, ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর উদ্দাম প্রবৃত্তির পাশবতা, অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ ও মৃগয়াতে কালক্ষেপ—ইহা পারিবারিক শিষ্টাচার বিকাশের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ ছিল। কিন্তু এ বাধা অনতিক্রম্য ছিল না। গৃহস্বামী মৃগয়া ও যুদ্ধের অবকাশে সচরাচর গৃহেই ফিরিতেন। সেখানে আসিয়া সর্ব্বদাই স্ত্রীপুত্রকন্যাকে দেখিতে পাইতেন, এবং অনেক সময় কেবলমাত্র তাহাদিগকেই দেখিতে পাইতেন; ইহাদিগকে লইয়াই তাঁহার স্থায়ী সমাজ, ইহাদিগের সহিতই তাঁহার স্থায়ী সংসর্গ, ইহারাই কেবল তাঁহার সুখ দুঃখ, ভাগ্যাভাগ্যের অংশী। কাজে কাজেই পারিবারিক জীবন

পরিপুষ্ট ও প্রভাববান্ হইয়া উঠিল। ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ফিউড্যাল্ পরিবারের মধ্যেই কি স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল না? প্রাচীন কালে যে যে সমাজে পারিবারিক জীবন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোথাও ফিউড্যাল্ সমাজের মত স্ত্রীজাতির প্রভাব ও গৌরব স্বীকৃত হয় নাই। ফিউড্যাল্ সমাজের মধ্যে পারিবারিক শিষ্টাচার বিকশিত ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিল বলিয়াই স্ত্রীজাতির পদমর্য্যাদার এই উন্নতি সম্ভব হইল। কেহ কেহ প্রাচীন জার্ম্মানদিগের বিশিষ্ট আচারব্যবহারের মধ্যে স্ত্রীজাতির এই উন্নতির মূল দেখিতে পান; কারণ, জার্ম্মান জাতি অরণ্যবাসকালেই নাকি স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। টাসিটসের একটি উক্তির উপর নির্ভর করিয়া জার্ম্মান স্বাদেশিকতা, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে জার্ম্মান আচার যে আদিম কাল হইতে পবিত্র ও গরীয়ান্, এইরূপ একটা ধারণা গড়িয়া তুলিয়াছে। এ কেবল কল্পনার কথা। জার্ম্মানদিগের আচারব্যবহার সম্বন্ধে টাসিটসের যে উক্তি, তদনুরূপ শত শত উক্তি বহু পর্য্যটক, অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে প্রাচীনকালোচিত সরলতার কিছুই নাই, বিশেষ কোন জাতির বৈশিষ্ট্যও কিছুই নাই। সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার ফলেই, পারিবারিক শিষ্টাচারের উন্নতি ও প্রভাববৃদ্ধি হইতেই ইউরোপে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার উদ্ভব; এবং এই শিষ্টাচারের বিকাশ অতি অল্পকালের মধ্যেই ফিউড্যাল্ পদ্ধতির একটা প্রধান বিশেষত্ব হইয়া উঠিল।

ফিউড্যাল্-সমাজে পারিবারিক জীবনের প্রাধান্যের আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। কুলপারম্পর্য্যবোধ ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর একটি বিশেষ ধর্ম্ম। পারিবারিক ভাবের মধ্যেই এই কুলস্থিতির আদর্শ জড়িত

হইয়া আছে। কিন্তু এ আদর্শটি ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর আশ্রয়ে যেমন সতেজ ও পরিপুষ্ট হইল, তেমন আর কোথাও হয় নাই। ফিউড্যাল্‌ পদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ যে ভূসম্পত্তি, সেই ভূসম্পত্তির বিশেষ প্রকৃতি হইতেই এই বংশপারম্পর্য্য, বংশস্থিতি আদর্শের উদ্ভব। ফীফ্‌ বা ফিউড্যাল্‌ সম্পত্তি অন্যান্য সম্পত্তি হইতে ভিন্নপ্রকৃতির। ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য, চারি দিকের ভূস্বামিসমাজের মধ্যে ইহার মান মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনবরত একটি কর্ত্তৃশক্তির প্রয়োজন ছিল। তাহার ফলে ভূস্বামী, ভূসম্পত্তি এবং ঐ সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অধিকারিপরম্পরা সকলে মিলিয়া এক বলিয়াই বিবেচিত হইত।

এই সকল কারণে ফিউড্যাল সমাজের পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় ও সবল হইয়া উঠিল।

এখন ভূস্বামীর আবাস হইতে বাহির হইয়া নিম্নভূমিস্থ ক্ষুদ্র উপনিবেশটির মধ্যে প্রবেশ করা যাউক। এখানে সমস্তই অন্যবিধ। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে যে, যে কোন প্রকারের সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষ মানুষের সন্নিহিত হইয়া বাস করিলেই—তা সে সন্নিধান যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন—কিছুকাল পরে পরস্পরের মধ্যে একটা ভাবের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, দয়াদাক্ষিণ্য, প্রীতি, আশ্রিতবাৎসল্যের ভাব ফুটিয়া উঠে। ফিউড্যাল্‌ ব্যবস্থার মধ্যেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। নিম্নভূমির ঔপনিবেশিকবর্গের সহিত দুর্গবাসী ভূস্বামীর মধ্যে অবশ্যই কিয়ৎকালের মধ্যে কতকগুলি নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কতক পরিমাণে প্রীতিসৌহার্দ্দ্যের আদানপ্রদান চলিয়াছিল। কিন্তু এ ব্যাপার সমাজব্যবস্থার গুণে সংঘটিত হয় নাই, সমাজব্যবস্থার বৈষম্য সত্ত্বেই ঘটিয়াছিল। শুদ্ধ সমাজব্যবস্থা হিসাবে বিচার করিতে গেলে এ সমাজের ব্যবস্থা কখনই

অনুমোদন করা যায় না। ভূস্বামী ও দাসবর্গের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোনই নৈতিক আদান প্রদানের সম্বন্ধ ছিল না; তাহারা তাঁহার সম্পত্তির অংশমাত্র ছিল; তিনি তাহাদের ষোল আনা মালিক ছিলেন। একাধারে তিনি রাজা, প্রভু ও স্বত্বাধিকারী। তিনি আইন করিতে পারেন, কর বসাইতে পারেন, দণ্ড দিতে পারেন। আবার দান বিক্রয়ও করিতে পারেন। তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত; তাঁহার সম্মুখে এমন কোন অধিকার, এমন কোন বিধিবিধান, এমন কোন সমাজ-শাসনের ব্যবধান ছিল না, যাহা তাঁহার শক্তির কবল হইতে এই দাসসমাজকে রক্ষা করিতে পারে।

আমার মনে হয়, এই কারণেই সর্ব্বকালে জনসাধারণ ফিউড্যাল প্রথা ও ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর নিদর্শন মাত্রেরই প্রতি গভীর বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। একেশ্বরতন্ত্র অত্যাচারী হইলেও মানুষ তাহা সহ্য করিয়াছে, তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহার শাসনে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, এমন কি, স্বেচ্ছায় তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই—রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র যথেচ্ছাচারী হইয়াও অনেক সময় জনসমাজের সম্মতি, এমন কি, প্রীতিও লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই ফিউড্যাল্ একেশ্বরতন্ত্র চিরকালই লোকের ঘৃণাভাজন ও বিদ্বেষভাজন হইয়া আসিয়াছে। সে লোকসমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে পারে। কিন্তু লোকের আত্মার উপর সে প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই যে, রাজতন্ত্র ও যাজক-তন্ত্র-সমাজে রাজা বা পোপ্ এমন কতকগুলি তত্ত্বের দোহাই মানিয়া শক্তি চালনা করেন, যাহার নিকট রাজা প্রজা উভয়েই মস্তক নত করেন। রাজশক্তি সেখানে এক উচ্চতর শক্তির প্রতিনিধি, সে হয় ভগবানের নামে, না হয় কোন বড় তত্ত্বের নামে আজ্ঞা প্রচার করে,

দণ্ডপুরস্কার বিধান করে, তাহার শাসন শুদ্ধমাত্র মানুষের দ্বারা মানুষের শাসন নহে। ফিউড্যাল একেশ্বরতন্ত্রের প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা এক মানুষের উপর আর এক মানুষের আধিপত্য; একটি মানুষের ব্যক্তিগত যথেচ্ছাচারী ইচ্ছাশক্তির অখণ্ড আধিপত্য। মানুষের পক্ষে এটা গৌরবের কথা যে, সে আর সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারীর আধিপত্য স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু এরূপ নিছক ব্যক্তিমানবের খেয়ালি শাসন সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবে না। যখনই সে দেখে যে, তাহার শাসক শুদ্ধ একটি মানুষ মাত্র; যে ইচ্ছাশক্তি তাহাকে দমাইয়া রাখিতেছে, তাহা শুদ্ধ তাহাদেরই মত একটি মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল-মাত্র, তাহার মন তখন বিদ্রোহী হইয়া উঠে, সে সক্রোধ বিক্ষোভের সহিত সে শাসনভার বহন করে। ফিউড্যাল্ শাসনশক্তির ইহাই প্রকৃত পরিচয়; এবং তাহার বিরুদ্ধে চিরকাল ধরিয়া যে বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই হইল তাহার মূল কারণ।

ফিউড্যাল তন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে যে ধর্ম্মের সংযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাতে তাহার শাসনভার কিছুমাত্র লঘু হয় নাই। আমার মনে হয় না যে, পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে যাজকের প্রভাব খুব বেশী ছিল এবং নিম্নভূমির দাসবর্গের সহিত ভূস্বামীর সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত করিয়া তুলিতে তিনি যে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাও মনে হয় না। খৃষ্টীয় চর্চ্চ যে ইউরোপীয় সভ্যতার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা নিশ্চয়; কিন্তু এ প্রভাব সাধারণ ভাবে কাজ করিয়াছিল, মানুষের মনের গতি খানিকটা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল, সমাজের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিধিবিধান, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, আচার ব্যবহারে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। এ ক্ষুদ্র ফিউড্যাল্-সমাজের একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে

দেখা যাইবে, ভূস্বামী ও দাসবর্গের মধ্যস্থ হিসাবে যাজকের প্রভাব অতি সামান্যই ছিল। অধিকাংশ স্থলে তিনি নিজেই দাসসমাজের মত দাসভাবাপন্ন ও শিক্ষাসৌজন্যবর্জ্জিত ছিলেন, সুতরাং ভূস্বামীর দর্পদম্ভ প্রতিরোধ করিবার মত তাঁহার সামর্থ্যও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। অবশ্য ঐ নিম্ন সমাজের মধ্যে নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনের পুষ্টি ও সংরক্ষণে নিযুক্ত থাকিতে হইত বলিয়া অনেক স্থলেই তিনি ঐ সমাজের প্রীতি আকর্ষণ ও কল্যাণ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন; ঐ সমাজের মধ্যে তিনি কিয়ৎপরিমাণে আশ্বাস ও জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহার যজমানদের ঐহিক ভাগ্যের উন্নতি বিধান পক্ষে তাঁহার সামর্থ্যও ছিল না, তিনি কিছু করেনও নাই।

এখন আমরা ফিউড্যাল সমাজের মূল মূর্ত্তির পরিচয় পাইলাম। ভূস্বামী, তাঁহার পরিবার ও তাঁহার দাসানুচরবর্গের উপর এই সমাজ গঠনের প্রভাব কিরূপভাবে কাজ করিয়াছে, তাহাও দেখা গেল। এখন এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া যাউক। এক এক ভূস্বামীর মহালভুক্ত সকল অধিবাসীই যে ভূমি অবলম্বন করিয়া বাস করিত, তাহা নহে;— এ সমাজের বাহিরে এমন অনেক অনুরূপ বা ভিন্নরূপ সমাজ ছিল; যাহাদের সহিত ভূস্বামীর মহালের সম্বন্ধ ছিল। এই যে বাহিরের বৃহৎ সমাজ, সভ্যতার উপর তাহার প্রভাব কিরূপ, তাহা বুঝা আবশ্যক।

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিব। ভূস্বামী ও যাজক উভয়েই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাহিরের বৃহৎ সমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন। দুর্গ ও মহালের বাহিরে ও দূরে তাঁহাদের অনেক সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু ঐ দাসসমাজ, ঔপনিবেশিক সমাজের পক্ষে এ কথা বলা যায় না। এই যুগে দেশের অধিবাসিসমূহ বুঝাইতে যখনই আমরা

"জনসমাজ" বা "প্রজাবর্গ" বা এরূপ কোন সাধারণ আখ্যার প্রয়োগ করি, তখনই আমরা একটা ভুল করিয়া বসি; কারণ, "জনসমাজ" বলিয়া তখন সাধারণ লোকের দেশব্যাপী কোন সমাজ ছিল না। এক এক ভূস্বামীর মহালভুক্ত দাস ও শ্রমজীবী লইয়া এক একটি স্বতন্ত্র স্থানীয় সমাজ। মহালের বাহিরে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাহাদের পক্ষে কোন বৃহৎ সাধারণ নিয়তি ছিল না; দেশ বলিয়া তাহাদের কিছুই ছিল না; তাহাদিগকে লইয়া একটা দেশব্যাপী জনসমাজ গড়িয়া উঠে নাই। যখনই আমরা সমগ্রভাবে বৃহৎ ফিউড্যাল সমাজের কথা বলি, তখন তাহাতে ভূস্বামি-সমাজকেই লক্ষ্য করা হয়।

এখন দেখা যাউক, পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র ফিউড্যাল-সমাজের সহিত বাহিরের বৃহৎ সমাজের কি সম্পর্ক ছিল, এবং এই সম্পর্কের ফলে সভ্যতার গতি প্রকৃতিই বা কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইল।

ফিউড্যাল ভূসম্পত্তি বা ফীফের অধিকারীদিগের মধ্যে পরস্পর কিরূপ বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ ছিল, তাহা অবশ্য আপনারা অবগত আছেন। নিম্ন স্তরের অধিকারী উচ্চ স্তরের অধিকারীকে যুদ্ধাদিকালে নিজের বাহুবল ও লোকবলের দ্বারা সাহায্য করিবেন, উচ্চাধিকারী তেমনি নিম্নাধিকারীকে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন ও আশ্রয় দিবেন—এই হইল পরস্পরের মধ্যে সর্ত্ত। এই সর্ত্তগুলির বিশেষ বিচার এখানে আবশ্যক নাই। সেগুলি কি ধরণের ছিল, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকিলেই যথেষ্ট। এখন এই সমস্ত সর্ত্তবন্ধন ও দায়বন্ধনের একটা ফল অবশ্যম্ভাবী। ইহার ফলে প্রত্যেক ভূস্বামীর চিত্তে কর্ত্তব্যবোধ, প্রীতিসৌহার্দ্দ্য প্রভৃতি কতকগুলি নৈতিক ভাব ফুটিয়া উঠিল। এ কথা সর্ব্বজনবিদিত যে, এই যুগে ফিউড্যাল

ভূস্বামিবর্গের মধ্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আত্মসমর্পণ, সত্যরক্ষা ও এতৎসদৃশ ভাবসমূহের যথেষ্ট বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

এই সকল দায়, কর্ত্তব্য ও মনোভাব ক্রমশঃ বিধি-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ফিউড্যাল ভূস্বামীর নিকট হইতে তাঁহার উপরিতন ভূস্বামী কি কি সাহায্য পাইবার অধিকারী; নিম্নতন ভূস্বামীই বা তৎপরিবর্ত্তে কিরূপ সাহায্য দাবী করিতে পারেন; নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে কোন্ স্থলে অর্থ সাহায্য করিতে বাধ্য, কোন্ স্থলেই বা সামরিক সাহায্য করিতে বাধ্য; উচ্চাধিকারী যখন নিম্নাধিকারীর নিকট মূল সর্ত্তের অতিরিক্ত সাহায্য চান, তখন কি কি আকারে তাঁহার সম্মতি লইবেন—এই সমস্ত বিষয় ফিউড্যালিজ্‌ম্ আইনে বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন। এইরূপে এমন একটা ফিউড্যাল্ ব্যবহারপদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল, যাহার সাহায্যে উচ্চাধিকারী তাঁহার অধীনস্থ ভূস্বামিবর্গের মধ্যে দাবীদাওয়া লইয়া সমস্ত বিবাদবিসম্বাদ মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেন। এইরূপে বড় বড় ভূস্বামিগণ প্রত্যেকে তাঁহার অধীনস্থ ভূস্বামিবর্গের সম্মতি গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পার্লামেণ্ট বা মন্ত্রণাসভায় আহ্বান করিতেন। এক কথায় রাজনীতি, আইন ও যুদ্ধব্যাপার সম্পর্কিত এমন কতকগুলি উপায় ছিল, যাহার সাহায্যে ফিউড্যাল্ সম্বন্ধগুলিকে সুসম্বদ্ধ বিধি-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু এই সমস্ত বিধি অধিকার ও প্রতিষ্ঠানের কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না, তাহাদের স্থিতির কোন স্থিরতা ছিল না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই স্থিতির স্থিরতা আসে কোথা হইতে? যদি সমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত এমন একটা ঐশ্বর্য্যশালী শক্তি জাগিয়া থাকে

যে, সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা ও শক্তিকে বিধিনিয়ন্ত্রিত করিতে, সাধারণের অধিকার ও সাধারণের স্বার্থ মানিয়া চলিবার জন্য বাধ্য করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ, তবেই সে সমাজের বিধিব্যবস্থার স্থিতির একটা স্থিরতা থাকে।

সমাজের কেন্দ্রে এই শক্তি প্রতিষ্ঠা কেবল দুইটি উপায়ে হইতে পারে। হয় এমন একজন ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিবিশেষ থাকা চাই, যাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি এত প্রবল যে, অন্য কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না, সে শক্তি আসরে নামিলে সমাজান্তর্ব্বর্ত্তী অন্য সকল শক্তিই তাহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করে; অথবা জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা ও সম্মিলিত শক্তি হইতে উদ্ভূত এমন একটা সাধারণ সমাজ-শক্তি থাকা আবশ্যক, যাহা সমাজস্থ প্রত্যেক খণ্ড শক্তিকে শাসনে রাখিতে পারে এবং যাহা সকলের নিকট সমানভাবে সম্মানিত হয়।

লোকস্থিতির এই দুই উপায়;—হয় একেশ্বরতন্ত্র, নয় জনতন্ত্র। বিভিন্ন শাসনপদ্ধতি আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন, সকল পদ্ধতিই একটির, না হয় অপরটির অন্তর্গত।

ফিউড্যাল্ পদ্ধতিতে কিন্তু এ উভয়ের কোনটিরই স্থান নাই।

অবশ্য ফিউড্যাল্ ভূস্বামিগণ সকলেই সমান পর্য্যায়ের ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এমন ক্ষমতাশালী ছিলেন যে, দুর্ব্বলতর ভূস্বামীর উপর অত্যাচার করিতে পারিতেন। কিন্তু সকল ভূস্বামীর ঊর্দ্ধতন ভূস্বামী যে রাজা, তাঁহাকে শুদ্ধ ধরিলেও তাঁহাদের মধ্যে এমন ক্ষমতাশালী কেহই ছিলেন না, যিনি অন্যান্য সকল ভূস্বামীর উপর আইন জারী করিতে বা তাঁহাদিগকে বাধ্য করিতে সমর্থ ছিলেন। শক্তি প্রয়োগের যে সমস্ত স্থায়ী উপাদান ও উপকরণ, ফিউড্যাল্ সমাজে তাহা ছিল না। স্থায়ী সেনা ছিল না, স্থায়ী কর ছিল না, স্থায়ী ধর্ম্মা-

ধিকরণ ছিল না। যখন আবশ্যক হইত, তখন সামাজিক শক্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইত। প্রত্যেক বিচারের জন্য নূতন করিয়া ধর্ম্মাধিকরণ গড়িতে হইত, প্রত্যেক যুদ্ধের সময় নূতন করিয়া সেনা গড়িয়া লইতে হইত, অর্থ আবশ্যক হইলেই নূতন করিয়া কর বসাইতে হইত। সমস্তই ছিল সাময়িক, আকস্মিক, বিশেষ ব্যবস্থা। একটা স্থায়ী স্বাধীন কেন্দ্রবর্ত্তী শাসনব্যবস্থার কোন উপকরণ ছিল না। ইহা সুস্পষ্ট যে, এরূপ অবস্থায় কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে আধিপত্য লাভ করা ও সমাজে শৃঙ্খলা ও শক্তি স্থাপন করা অসম্ভব ছিল। এ দিকে দমন ও শাসন যে পরিমাণে কঠিন, বিদ্রোহ ও তাহার প্রতিরোধ সেই পরিমাণে সহজ ছিল। নিজের দুর্গমধ্যে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারই মত সমপদস্থ ভূস্বামিবর্গের সহজলভ্য সহযোগিতায় যে কোন নিম্নতম ভূস্বামী অতি সহজেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন।

অতএব দেখা গেল যে, সমাজস্থিতির প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ যাহাতে এক পরাক্রান্ত শক্তির দ্বারা সমাজ শাসিত ও সংরক্ষিত হয়—তাহা ফিউড্যাল সমাজে সম্ভব ছিল না।

আবার ওদিকে জনতন্ত্র-পদ্ধতির উদ্ভবও ফিউড্যাল সমাজে সম্ভব ছিল না। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। এখনকার কালে আমরা যখন রাষ্ট্র-শক্তির কথা বলি, রাষ্ট্রপতির অধিকারের কথা বলি, আইন জারী করিবার, কর বসাইবার, দণ্ড দিবার অধিকারের কথা তুলি, তখন আমরা জানি যে, এ অধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষের একান্ত নিজস্ব নহে; আমরা জানি যে, নিজের জন্য নিজের নামে অন্যকে দণ্ড দিবার, অন্যের উপর আইন জারী করিবার অধিকার কাহারও নাই। এ সমস্ত অধিকার সমষ্টিভাবে সমগ্র সমাজের নিজস্ব; সমাজের নামেই এ সমস্ত

অধিকার প্রযুক্ত হয়; সমাজ আবার এ সমস্ত অধিকার নিজের কাছ হইতে পায় নাই, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিকট পাইয়াছে। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তিবিশেষ এইরূপ অধিকারসম্পন্ন কোন শাসনশক্তির সম্মুখীন হয়, তখন তাহার মনের মধ্যে এই ভাবটি অজ্ঞাতসারে জাগিতে থাকে যে, সে এমন একটা সার্ব্বজনীন ন্যায্য অধিকারসম্পন্ন শক্তির সম্মুখে আসিয়াছে, যে দৈব-অধিকারের জোরে তাহার উপর আদেশ চালাইতেছে। এইরূপে তাহার মন পূর্ব্ব হইতেই নত হইয়া থাকে। কিন্তু ফিউড্যাল্-সমাজে একেবারে অন্যরূপ ব্যাপার। ভূস্বামী নিজের এলাকার মধ্যে সমস্ত রাজক্ষমতার অধিকারী ; এ সমস্ত অধিকার তাঁহার ভূসম্পত্তির অংশস্বরূপ, তাঁহার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি। এখন যে সকল অধিকার রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অধিকার বলিয়া গণ্য হয়, তখন সেগুলি ছিল ব্যক্তিগত অধিকার। এখন যে সকল ক্ষমতা সমাজের বা রাষ্ট্রের, তখন সেগুলি ছিল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির করতলগত। ভূস্বামী যখন স্বীয় মহালে স্বনামে রাজক্ষমতা পরিচালন করিয়া, মাঝে মাঝে ঊর্দ্ধতন ভূস্বামীর সম্মুখে পার্লামেণ্টে উপস্থিত হইতেন, তখন সেখানেও তিনি লোকসমষ্টির সম্মিলিত শক্তির কোন পরিচয় পাইতেন না ; সে সব পার্লামেণ্ট অল্প কয়েকটি লোক লইয়া গঠিত, তাঁহারাও আবার তাঁহার সমানপদস্থ ব্যক্তি, তাঁহারাও স্ব স্ব এলাকার মধ্যে তাঁহারই মত রাজশক্তিসম্পন্ন, রাজাধিকারভোগী। দেশের রাজকীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সে এমন কিছু গৌরব বা মহিমা বা সার্ব্বজনীনতা দেখিত না, যাহাতে তাহার শ্রদ্ধা উদ্রেক করিতে পারে। সুতরাং সরকারী ব্যবস্থা মনোমত না হইলেই, সে তাহা মানিতে অস্বীকার করিত এবং বিদ্রোহ করিয়া উঠিত।

ফিউড্যাল্‌তন্ত্রে বাহুবল দ্বারাই অধিকার বজায় রাখিতে হইত।

যাহার যে অধিকার আছে, তাহাকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য, লোক-সমাজে তাহাকে প্রতিষ্ঠা দিবার জন্য সে কেবলই বাহুবল অবলম্বন করিত। সমাজের কোন প্রতিষ্ঠানই কিন্তু এ উপায়ে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না। এবং এ কথাটা সকলে বুঝিত বলিয়াই কেহ কখনও স্বাধিকার সমর্থনের জন্য বিধিপ্রতিষ্ঠানের দোহাই দিত না। যদি ঊর্দ্ধতন ভূস্বামীর বিচারালয় ও নিম্নতন ভূস্বামীদের পার্লামেণ্টের কোন যথার্থ প্রভাব থাকিত, তাহা হইলে ইতিহাসে আরও বেশী করিয়া তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাইতাম, তাহাদিগকে আরও ক্রিয়াশীল দেখিতে পাইতাম। তাহাদের বিরলতাই তাহাদের অক্ষমতার প্রমাণ।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ, পূর্ব্ববর্ণিত কারণ ছাড়াও ইহার আর একটা গভীর ও প্রবল কারণ আছে। সর্ব্বপ্রকার শাসনপদ্ধতির মধ্যে ফেডারেশন্‌পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ঘট। ইহা গড়িয়া তুলিতেও কষ্ট, ইহাকে প্রাধান্য দেওয়াও শক্ত। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক খণ্ড প্রদেশ ও খণ্ড সমাজকে সমস্ত স্থানীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ শাসনাধিকার দেওয়া হয়; কেবল সমগ্র দেশের বৃহৎ সাধারণ সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য যেটুকু দরকার, সেই পরিমাণ শাসনাধিকার স্থানীয় কেন্দ্রগুলির হাত হইতে সরাইয়া লইয়া, সমগ্র রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে লইয়া গিয়া একটা কেন্দ্র শাসনতন্ত্র গড়িয়া তোলা হয়। নৈয়ায়িক হিসাবে এ ব্যবস্থার মত সরল ব্যবস্থা আর কিছুই নাই; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার ন্যায় জটিল পদ্ধতি আর কিছুই নাই। স্থানীয় কেন্দ্রগুলির স্বাধীনতা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি পরিমাণে সমগ্র সমাজের কল্যাণের খাতিরে খর্ব্ব করিয়া, সাধারণ কেন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমাজে সভ্যতার অবস্থা খুব উন্নত থাকা আবশ্যক। এ পদ্ধতিতে মানুষকে বাধ্য করিবার ক্ষমতা, জোর করিয়া

চালাইবার ক্ষমতা অন্যান্য শাসনপদ্ধতি অপেক্ষা অনেক অল্প, সুতরাং এ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য, ইহার বিধান মানিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও সম্মতি থাকা আবশ্যক।

অতএব ফেডারেশন্-পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইলে সমাজে বিচার-বুদ্ধি, ধর্ম্মবোধ ও সভ্যতার বিশেষ উৎকর্ষ থাকা আবশ্যক। অথচ ফিউড্যালিজ্‌ম্ এই ফেডারেশন্ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সমগ্র রাষ্ট্রব্যাপী এক বিরাট ফিউড্যাল্ সমাজের আদর্শ ফেডারেশনেরই আদর্শ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফেডারেশন্ যে মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহারও অবলম্বন সেই নীতি। ফিউড্যালিজ্‌ম্ চাহিয়াছিল যে, প্রত্যেক ভূস্বামী তাঁহার এলাকার মধ্যে যতদূর সম্ভব, শাসনাধিকার প্রয়োগ করিবেন, এবং ইহাতেও শাসন কার্য্যের যেটুকু অবশিষ্ট থাকিবে, সেইটুকু মাত্র হয় ঊর্দ্ধতন ভূস্বামীর হাতে, না হয় বেরন্‌দিগের একটী সাধারণ সম্মিলনীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। কেন্দ্রাধিপতির এটুকু ক্ষমতাও আবার বিশেষ অনিবার্য্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে। ফিউড্যাল্ যুগের অজ্ঞান, পাশবতা ও দুর্নীতির মধ্যে এরূপ একটা শাসনতন্ত্র গড়িয়া তোলা যে অসম্ভব, তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতেছেন। যাহাদের উপর এই বিধির প্রয়োগ হইবে, তাহাদের ধারণা, তাহাদের আচার ব্যবহার, যে কোন প্রকার শাসনতন্ত্রের প্রতি-কূল। সুতরাং শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা আনিবার জন্য যে সব চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা যে ব্যর্থ হইয়া গেল, ইহাতে কে বিস্মিত হইতে পারে?

আমরা ফিউড্যাল্ সমাজকে প্রথমে ইহার সরল মৌলিক মূর্ত্তিতে, পরে ইহার বিরাট সমগ্র মূর্ত্তিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম। এই দুই দিক্ দিয়া আমরা দেখিলাম, ইহার প্রকৃতি কিরূপ, ইহার ক্রিয়াই বা কিরূপ, এবং সভ্যতার গতিনিয়তির উপর ইহার প্রভাব বা কিরূপ।

আমার মনে হয়, আমাদের আলোচনার ফলে দুইটি সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে :—

প্রথমতঃ, ফেডারেশনের আদর্শ মানুষের আত্মার বিকাশে, ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। মানুষের মনে নূতন নূতন তত্ত্বের উন্মেষ হইয়াছে, নূতন নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, নৈতিক বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং চরিত্র ও প্রেম নব নব সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের দিকে দেখিতে গেলে, ফিউড্যালিজ্‌ম্ কোন স্থায়ী বিচার-তন্ত্র বা শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। অবশ্য বর্ব্বর আক্রমণের ফলে প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর পুনর্গঠন যুগে ফিউড্যালিজ্‌ম্ অপেক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিস্তৃত সমাজ গড়িয়া উঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর মূলগত দোষে এ সমাজ নিজকে বাড়াইতেও পারিল না, নিয়ন্ত্রিত করিতেও পারিল না; রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে কেবল প্রতিরোধের অধিকারই ফিউড্যালিজম্ প্রয়োগ করিতে শিখাইল। সে প্রতি-রোধও আবার বৈধ প্রতিরোধ নহে; আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতিরোধ। সমাজে ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির উপর সাধারণের ইচ্ছা-শক্তিকে জয়ী করিয়া তোলা, ব্যক্তিগত প্রতিরোধ-প্রতিহিংসার স্থলে আইনসম্মত বৈধ প্রতিরোধের প্রবর্ত্তন করা—ইহাতেই সমাজের উন্নতি বুঝা যায়। ইহাই সমাজব্যবস্থার মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রধান সার্থকতা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খুব প্রশ্রয় দাও; যখন তাহার পদস্খলন হইবে, তখন সমাজের সম্মিলিত বিচার-বুদ্ধির কাছে তাহার বিচার হউক; ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে কতখানি খর্ব্ব করিয়া দিতে হইবে, সমাজই তাহার বিচার করিয়া দিক—ইহারই নাম বৈধ ব্যবস্থা, ইহারই নাম বৈধ

প্রতিরোধ। ফিউড্যাল্-সমাজে এ প্রকার কিছুই ছিল না। ফিউড্যাল্ ভূস্বামীরা যে প্রতিরোধ-পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন, তাহা ব্যক্তিগত প্রতিরোধ; তাহার অবলম্বন আইন নহে, সমাজের বিচারবুদ্ধি নহে, নিজের বাহুবল। এ প্রতিরোধের মূলনীতি সমাজবিধ্বংসী নীতি। তথাপি মানবপ্রকৃতি হইতে এ নীতি সমূলে উৎপাটিত হউক, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে; কারণ, বাধা দিবার অধিকার বর্জ্জন করিলে অনেক সময় দাসত্বই বরণ করিয়া লইতে হয়। রোমীয় সমাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিরোধ-প্রবৃত্তি মানুষের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল এবং মাথা তুলিতে পারে নাই। খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে যে, এ প্রবৃত্তির পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর ছিল, আমার ত এরূপ মনে হয় না। ইউরোপীয় চরিত্রে এই নীতির পুনঃপ্রবেশের জন্য ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর নিকটই আমরা ঋণী। সভ্যতার গর্ব্ব যে, সে এ নীতিকে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রয়োজন করিয়া রাখিয়া দেয়; ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর গর্ব্ব যে, সে সদাসর্ব্বদা এই নীতি রক্ষা করিয়াছে ও মানিয়া আসিয়াছে।

ফিউড্যাল্-সমাজের মোটামুটি সাধারণ বিচারের দ্বারা, ইতিহাসের ঘটনাবলীর সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়াই আমরা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটি পাইলাম। এখন যদি ঘটনার দিকে, ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিব, আমরা যুক্তি দ্বারা যাহা অনুমান করিয়াছি, ইতিহাস তাহাই দেখাইতেছে। ফিউড্যালিজ্‌ম্-এ ইতিহাস, তাহার ভাগ্য-বিবর্ত্তন, তাহার প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিয়াছে। ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর মূল প্রকৃতি হইতে যে সকল অনুমান ও সিদ্ধান্ত করা গিয়াছে, সে সকলগুলিই ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়।

দশম ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর সাধারণ ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া দেখুন,—ভাবরস, চরিত্র ও তত্ত্ববিকাশের

অনুকূলে ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ যে ঐ সময়ে কত বড় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য না করা অসম্ভব। এই যুগের ইতিহাস খুলিলেই মহৎ ভাব, মহৎ কীর্ত্তি, বিকশিত মনুষ্যত্বের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন চোখে পড়িয়া যায়। সেগুলি অবশ্য ফিউড্যাল্‌ আচারব্যবহার, রীতিনীতির ক্রোড়েই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। শিভাল্‌রী বা "বীরধর্ম্ম" এবং ফিউড্যালিজম্‌ অবশ্য এক জিনিষ নহে; এক না হউক, কিন্তু শিভাল্‌রী যে ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর কন্যা, ইহা কে অস্বীকার করিবে? ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ হইতেই এই উদার ও মহৎ ভাবসমন্বিত আদর্শের উদ্ভব। সন্তানকে ধরিয়া বিচার করিলে জনকের মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আর একদিকে দৃষ্টিপাত করুন। বর্ব্বরতার অন্ধকূপ হইতে বাহির হইয়া ইউরোপীয় কল্পনার প্রথম উন্মেষ, কাব্য-সাহিত্য রচনার প্রথম চেষ্টা, অতীন্দ্রিয় রসের প্রথম আস্বাদ—এ সমস্তই ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর পক্ষপুটের আড়ালে, ফিউড্যাল্‌ দুর্গের অন্তঃপুরে জন্মলাভ করে। মানবতার এমন বিকাশ ঘটিতে হইলে মানবাত্মার আলোড়ন চাই, মানবজীবনে একটা সচলতা আসা চাই, অবকাশ চাই, আরও কত কি চাই, যাহা সাধারণ জনসমাজের শ্রান্তিক্লান্তিময়, অবসাদগ্রস্ত কঠোর কঠিন জীবনযাত্রার মধ্যে দুর্লভ। ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, জার্ম্মানীতে, ফিউড্যাল্‌-যুগের সহিতই ইউরোপের প্রথম সাহিত্য-কলা-সৃষ্টির স্মৃতি বিজড়িত।

এ দিকে আবার যদি ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর সামাজিক প্রভাবের বিষয়ে ইতিহাসকে প্রশ্ন করি, এ ক্ষেত্রেও ইতিহাস আমাদের অনুমানগুলিকে সমর্থন করিবে। ইতিহাস বলিবে, ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ সামাজিক শৃঙ্খলারও শত্রু, সামাজিক স্বাধীনতারও শত্রু। যে দিক্‌ দিয়াই সমাজের উন্নতির ইতিহাস বিচার করিবেন, সর্ব্বত্রই দেখিবেন, ফিউড্যালিজ্‌ম্‌ কেবল বাধা দিতেছে। সেই জন্যই যে দুই প্রচণ্ড শক্তির প্রেরণায় সমাজে শৃঙ্খলা ও

স্বাধীনতার আদর্শ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ফিউড্যাল্-যুগের আরম্ভ হইতেই তাহারা অনবরত ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর সঙ্গে লড়াই করিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটা বিধিবদ্ধ ব্যাপক সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে; ইংলণ্ডে প্রথম উইলিয়াম ও তাঁহার পুত্রগণ এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ফ্রান্সে স্যাঁ লুই চেষ্টা করিয়াছিলেন, জার্ম্মানীতে একাধিক সম্রাট্ এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর স্বভাবই শৃঙ্খলা ও বিধিবিধানের প্রতিকূল। আজকাল কোন কোন বুদ্ধিমান্ লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ফিউড্যাল্ সমাজ বেশ একটা বিধিবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত উন্নতিশীল সমাজ; তাঁহারা ফিউড্যাল্ যুগকে একটা স্বর্ণযুগ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে যদি প্রশ্ন করা যায়, ঠিক কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে এই ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর এই কল্পিত রূপ বাস্তব আকার লাভ করিয়াছিল, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তর দিতে পারিবেন না। তাঁহাদের কল্পিত ভূস্বর্গের সন তারিখ নির্দ্দেশ করা যায় না; অতীতের ইতিহাস খুঁজিয়া এ নাটকের রঙ্গমঞ্চও পাওয়া যায় না, অভিনেতাও পাওয়া যায় না। তাঁহাদের এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ সহজেই পাওয়া যায়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা বিনা অভিসম্পাতে ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন না, তাঁহাদেরও ভ্রমের কারণ বুঝিতে পারা যায়। ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর যে দুইটি বিভিন্ন রূপ আছে, তাহা অনুকূল-প্রতিকূল কোন পক্ষই ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই। একদিকে ব্যক্তিমানবের উপর মানুষের চিন্তা, চরিত্র ও প্রবৃত্তির উপর ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর প্রভাব, অপর দিকে সমষ্টিমানবের উপর, মানুষের সামাজিক অবস্থার উপর ফিউড্যালিজ্‌ম্-এর প্রভাব—এই দুইটা দিক্ তাঁহারা পৃথক্ করিয়া দেখেন নাই। এক পক্ষ মানিতে চান না যে, যে

সমাজের মধ্যে এতগুলি সদ্ভাব ও সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটিয়াছিল, যে সমাজের মধ্য হইতে আধুনিক ইউরোপের সমস্ত সাহিত্যের জন্ম হইল, যে সমাজে আচারব্যবহার ও রীতিনীতি এমন একটা উন্নত আদর্শ লাভ করিল, তাঁহারা মানিতে চান না যে, সে সমাজের ব্যবস্থা বা গঠন-নীতির কোনই গুণ ছিল না। এ দিকে আবার ফিউড্যালিজ্‌ম সাধারণ জনসমাজের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করিয়াছে, সমাজে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা স্থাপনের বিরুদ্ধে সে যে সকল বাধা উপস্থিত করিয়াছে, অপর পক্ষ কেবল তাহাই দেখিতেছেন। সুতরাং ইঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, এমন সমাজব্যবস্থার ফলে সুন্দর চরিত্র বা সদ্‌গুণের বিকাশ হইতে পারে। সভ্যতার মধ্যে যে দুইটি বিভিন্ন স্রোত চলিতেছে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য দুইটি স্রোত যে পরস্পর-নিরপেক্ষভাবে চলিতে পারে, এ কথাটা উভয় পক্ষই বুঝেন নাই।

এখন দেখা গেল, তত্ত্ববিচার করিয়া ফিউড্যালিজ্‌ম্‌'ও তাহার ফল সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়াছিলাম, ইতিহাস তাহা সমর্থন করে। রোম-শাসিত জগৎ যাহারা জয় করিয়া লইল, ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত সত্তার প্রবল উদ্যম—ইহাই তাহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য; সুতরাং তাহারা যে সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিল, তাহাতে সর্ব্বাগ্রে ব্যক্তিত্বেরই বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি ঘটিল। কোন একটা সামাজিক ব্যবস্থা নূতন প্রবর্ত্তন করিবার সময় মানুষ নিজের অন্তঃপ্রকৃতিসম্ভূত যে সমস্ত ভাব, চিন্তা ও গুণরাশি লইয়া প্রবেশ করে, সমাজব্যবস্থার উপর সেগুলির প্রভাব নিতান্ত কম নহে। আবার মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির উপর সমাজ-ব্যবস্থার একটা প্রতিক্রিয়া হয় এবং তাহার ফলে ঐ স্বাভাবিক ভাব-চিন্তা, গুণরাশি আরও পরিপুষ্ট হয়। জার্ম্মান সমাজে ব্যক্তিরই প্রাধান্য ছিল, সুতরাং জার্ম্মান সমাজের সন্তানস্বরূপ সেই ফিউড্যাল্‌ সমাজ, তাহার

প্রভাব ব্যক্তিত্ব পরিপোষণেরই অনুকূল হইল। সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ ও উপাদানের মধ্যেও এই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যাইবে; তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিশিষ্ট ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; তাহাদের গতি ও প্রভাব তাহাদের মূল প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চর্চ্চের ইতিহাস এবং ইউরোপীয় সভ্যতার উপর চর্চ্চের প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া আমরা এই ব্যাপারের আর একটা বড় দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব।

পঞ্চম অধ্যায়

আমরা ফিউড্যাল্ তন্ত্রের প্রকৃতি ও প্রভাব পর্য্যালোচনা করিয়াছি। এখন পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় চর্চ্চের ইতিহাস আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। মনে রাখিবেন, আমরা খৃষ্টীয় চর্চ্চের আলোচনা করিব, খৃষ্টধর্ম্মের নহে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপদ্ধতি ও ধর্ম্ম-মতের কথা আমি বলিতে আসি নাই; খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্র, খৃষ্টীয় যাজক-সম্প্রদায়ের শাসনব্যবস্থার দিকেই আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

পঞ্চম শতাব্দীতে এই যাজকসমাজের গঠন ও ব্যবস্থিতি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; অবশ্য তাহার পর ইহার মধ্যে অনেক বড় বড় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এটা বলা যায় যে, সঙ্ঘ হিসাবে, খৃষ্টপন্থী সমাজের ধর্ম্মশাসনব্যবস্থা হিসাবে চর্চ্চ তখনই একটা সম্পূর্ণ ও স্বাধীন অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল।

পঞ্চম শতাব্দীতে চর্চ্চের অবস্থা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গের অবস্থায় যে কি প্রভেদ ছিল, তাহা দৃষ্টিপাতমাত্রেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, ইউরোপীয় সভ্যতার চারিটি মৌলিক উপাদান—পৌরতন্ত্র, ভূস্বামী-তন্ত্র, রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র। পঞ্চম শতাব্দীতে পৌরতন্ত্র রোমসাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষমাত্র, একটা অস্পষ্ট নির্জীব ছায়ামাত্র। চারি দিকের বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে ফিউ-ড্যালিজ্‌ম্ তখনও মাথা তুলিয়া উঠে নাই। রাজতন্ত্র তখন নামে মাত্র আছে। আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার সমস্ত অঙ্গই তখন হয় জরাজীর্ণ, না হয় শৈশবাবস্থ। সে সময়ে চর্চ্চই কেবল যৌবনবলসম্পন্ন ও সুগঠিত; চর্চ্চের মধ্যেই কেবল গতিবেগ ও শৃঙ্খলা, উদ্যম ও নিয়মের একত্র

সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের উপর প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করিতে হইলে স্বাভাবিক সচলতা ও নিয়মশৃঙ্খলার যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক, তখন কেবল চর্চ্চের মধ্যেই তাহা ছিল। তাহা ছাড়া মানবপ্রকৃতির যে সমস্ত বড় বড় সমস্যা, মানুষের ভাগ্যনিয়তি সম্বন্ধে যত কিছু সম্ভাবনা,—এক কথায় যে সমস্ত বড় বড় প্রশ্নের দিকে মানুষের মন স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়, চর্চ্চ সে সমস্তগুলিই লোকসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিল। এইরূপে আধুনিক সভ্যতার উপর চর্চ্চের প্রভাব অত্যন্ত অধিক,—এত অধিক যে, তাহা চর্চ্চের শত্রু মিত্র, উভয় পক্ষেরই ধারণাতীত।

পঞ্চম শতাব্দীতে খৃষ্টীয় চর্চ্চ একটি স্বাধীন ও সুব্যবস্থিত সমাজরূপে দেখা দেয়। একদিকে রাজশক্তিমণ্ডিত ঐহিক শাসনাধিকারী শাসকবৃন্দ, অপর দিকে সাধারণ জনসমাজ, এই উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থরূপে, যোগসূত্ররূপে, উভয়ত্র প্রভাবশীল শক্তিরূপে চর্চ্চের অবস্থিতি।

অতএব ইহার ক্রিয়া ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপে জানিতে বা বুঝিতে হইলে তিন দিক্ দিয়া ইহার আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমে ইহার নিজস্ব স্বরূপটি কি, ইহার আভ্যন্তরীণ গঠন কিরূপ, ইহার মধ্যে কোন্ কোন্ তত্ত্ব বা নীতির প্রাধান্য, ইহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা দেখিয়া লইতে হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে—রাজা, ভূস্বামী প্রভৃতি চারি দিকের ঐহিক শাসনশক্তির সহিত ইহার সম্বন্ধ কিরূপ; এবং সর্ব্বশেষে দেখিতে হইবে, সাধারণ জনবর্গের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ। এই ত্রিবিধ বিচারের ফলে যখন আমরা চর্চ্চের নীতি, অবস্থান ও অবশ্যম্ভাবী প্রভাব সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ চিত্র খাড়া করিতে পারিব, তখন ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার সহিত আমাদের এই আনুমানিক চিত্রটি মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

সর্ব্বাগ্রে চর্চ্চের স্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

চর্চ্চের অস্তিত্বই একটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার। ঐরূপ একটা ধর্ম্মশাসনের ব্যবস্থা, একটা সঙ্ঘবদ্ধ যাজকসম্প্রদায়, একটা যাজক-প্রধান ধর্ম্ম যে গড়িয়া উঠিতে ও টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল, ইহাই একটা বড় কথা।

আধুনিক চিন্তালোকপ্রাপ্ত অনেকে মনে করেন, "যাজক সম্প্রদায়" ও "ধর্ম্মশাসনব্যবস্থা" এই কথাগুলিদ্বারা ব্যাপারটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। তাঁহারা মনে করেন, যদি কোন ধর্ম্ম কালক্রমে গিয়া একটা যাজকতন্ত্রে বা ঐরূপ কোন একটা শাসনপদ্ধতিতে গিয়া পরিণত হয়, তাহা হইলে মোটের উপর সে ধর্ম্মদ্বারা সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ সাধিত হয়। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম মানুষের সঙ্গে ভগবানের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ মাত্র; এবং যখনই এই ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভাবটুকু নষ্ট হইয়া যায়, যখনই ব্যক্তিমানব, ও ধর্ম্মবিশ্বাসের আধারস্বরূপ ভগবানের মধ্যে কোন বাহিরের কর্ত্তৃত্বশক্তি আসিয়া পড়ে, তখন ধর্ম্মেরও অবনতি হয়, সমাজও সঙ্কটাপন্ন হয়।

এ প্রশ্নটি ভাল করিয়া বিচার না করিলে আমাদের চলিবে না। খৃষ্টীয় চর্চ্চের প্রভাব কিরূপ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে, কোন একটা চর্চ্চ বা যাজকতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি হওয়া উচিত, তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। এই প্রভাবের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে, ধর্ম্ম কি বাস্তবিক পক্ষেই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার? বাস্তবিক পক্ষেই কি মানুষের সঙ্গে ভগবানের ব্যক্তিগত সম্বন্ধমাত্র ব্যতীত ধর্ম্ম হইতে অন্য কোন কিছুর উদ্ভব হয় না?—না ধর্ম্ম হইতে অবশ্যম্ভাবিরূপে মানুষে মানুষে নূতন নূতন সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, একটা ধর্ম্মসমাজ ও ধর্ম্মব্যবস্থা গড়িয়া উঠে?

যদি ধর্ম্ম বলিতে শুধু ধর্ম্মভাব বুঝি—যে ভাব বাস্তব হইলেও অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট ; যাহার প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা একরূপ অসাধ্য, যাহা কখনও বাহ্য প্রকৃতি, কখনও বা মানবাত্মার নিভৃত অন্তঃপুর, কখনও বা কাব্য, কখনও বা জগতের ভাবী রহস্য অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠে, এক কথায় যাহা সর্ব্বত্রই আপনার চরিতার্থতা খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কোথাও বাঁধা পড়ে না—ধর্ম্ম বলিতে যদি শুধু এই ভাবটুকু মাত্র বুঝি, তাহা হইলে অবশ্য ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া মনে হয় না। এরূপ একটা ভাবের প্রেরণায় মানুষে মানুষে একটা ক্ষণিক সম্মিলন ঘটিতে পারে ; মানুষের প্রতি মানুষের পরস্পর সহানুভূতিতে এই ধর্ম্মভাবের কতকটা তৃপ্তি এবং পুষ্টিও সাধিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তার দরুন ইহা কোন স্থায়ী যাজকসমাজ-বন্ধনের মূলসূত্র হইতে পারে না, ইহা কোন একটা উপদেশ-পদ্ধতি বা আচরণ-পদ্ধতির সঙ্গে নিজকে খাপ খাওয়াইতে পারে না ; এক কথায়, ইহা একটা ধর্ম্মসমাজ বা ধর্ম্মশাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে পারে না।

কিন্তু আমার যতদূর মনে হয়, এই ধর্ম্মভাব মানুষের ধর্ম্মপ্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রকাশ নহে। ধর্ম্মভাব হইতে ধর্ম্ম একটি বিভিন্ন ও পূর্ণতর বস্তু। মানবের স্বভাব ও পরিণতির মধ্যে এমন সকল রহস্য আছে, যাহাদের চূড়ান্ত মীমাংসা এ জগতের বাহিরে ; যাহা কতকগুলি অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ, যাহা মানুষের মনকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিতেছে না, যাহাদিগের মীমাংসা উদ্ধার করিবার জন্য মানুষের মন অনবরত লাগিয়া রহিয়াছে। এই সকল সমস্যার মীমাংসা এবং যে সকল মতবাদ ও বিশ্বাসের মধ্যে এই মীমাংসাগুলি আবদ্ধ আছে—ইহাই হইল ধর্ম্মের আদি মূল ও আধার।

মানুষ আর এক পথ দিয়াও ধর্ম্মে উপনীত হইতে পারে। আপনা-

দের মধ্যে যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বোধ হয় স্পষ্ট প্রতীত হইবে, চরিত্রনীতি ও ধর্ম্ম পৃথক্ ও পরস্পর-নিরপেক্ষভাবে থাকিতে পারে। নৈতিক সদসদ্বিচার, অসৎপন্থা বর্জ্জন করিয়া সৎপন্থা অবলম্বন করিবার পক্ষে যে দায়িত্ব—এ সমস্ত তত্ত্ব ন্যায়-শাস্ত্রের তত্ত্বের ন্যায় মানুষ নিজের স্বভাবের মধ্য হইতেই পায়; তাহার প্রকৃতির মধ্যেই ইহার মূল নিহিত, তাহার জীবনক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োগ। কিন্তু চরিত্রনীতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইলেও মানুষের মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠে—চরিত্রনীতি আসে কোথা হইতে? কোথায় বা ইহার পরিণতি? এই যে নৈতিক কর্ত্তব্যবোধ, ইহা কি একটা স্বতঃসিদ্ধ নিরবলম্ব ব্যাপার, ইহার কি কোন বিধাতা নাই, লক্ষ্য নাই? ইহার পশ্চাতে কি মানুষের একটা সংসারাতীত পরিণতির কথা লুকাইয়া নাই? সেই পরিণতির দিকেই কি ইহা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেয় না? এ প্রশ্ন আপনা আপনি উঠিতে বাধ্য এবং এই প্রশ্নের দ্বারাই চরিত্রনীতি মানুষকে ধর্ম্মের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দেয়।

এইরূপে এক দিকে মানবপ্রকৃতিগত রহস্যের মধ্যে, অপর দিকে মানুষের নীতিবোধের প্রামাণ্য, উৎপত্তিমূল ও লক্ষ্যসন্ধানের মধ্যে ধর্ম্মের দুইটি সুনির্দ্দিষ্ট মূল পাওয়া গেল। ধর্ম্ম তাহা হইলে প্রথমতঃ, মানুষের প্রকৃতিগত রহস্যসম্ভূত কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি; দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল মতবাদের অনুযায়ী কতকগুলি উপদেশের সমষ্টি, যাহা মানুষের স্বাভাবিক নীতিবোধকে তাৎপর্য্য ও প্রামাণ্য দিতেছে; এবং তৃতীয়তঃ, মানুষের চরমপরিণতি সম্বন্ধে কতকগুলি আশ্বাসবাণীর সমষ্টি। এইগুলি লইয়াই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের গঠন। ধর্ম্ম কেবল একটা ভাব বা অনুভূতি নহে, কল্পনার খেলা নহে, শুদ্ধ মাত্র কাব্য নহে।

এইরূপে ধর্ম্মের প্রকৃত মূল ও উপাদান এবং যথার্থ প্রকৃতি ধরিয়া দেখিলে ধর্ম্ম আর শুদ্ধ ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে না, ধর্ম্মের মধ্যে একটা প্রবল ও সৃজনশীল সংহতি-শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে কতকগুলি মত ও বিশ্বাসের সমষ্টিরূপে দেখুন :—সে ক্ষেত্রে দেখিবেন, সত্য কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে ; সত্য বিশ্বব্যাপী, স্থানকালপাত্রনির্ব্বিশেষে—মানুষ একাকী নহে, সকলের সহিত মিলিত হইয়াই অলব্ধ সত্যের সন্ধান করিবে, লব্ধ সত্য স্বীকার করিবে। আবার এই সকল মত ও বিশ্বাসের অনুযায়ী উপদেশের সমষ্টি হিসাবে ধর্ম্মকে দেখুন ; সে ক্ষেত্রে দেখিবেন, একজনের পক্ষে যাহা অবশ্য পালনীয় বিধি, সকলের পক্ষেও তাহাই ; এ বিধি-উপদেশ প্রচার করা আবশ্যক, সমস্ত মানুষকে এই বিধির অধীন করিয়া আনা আবশ্যক। মানুষের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে ধর্ম্মের যে আশ্বাসবাণী, সে ক্ষেত্রেও ঐরূপ। এ সকল বাণী চারিদিকে প্রচার করা আবশ্যক : সমস্ত মানুষকেই এই আশ্বাসবাণীর ফল আহরণ করিবার জন্য আহ্বান করা আবশ্যক। অতএব ধর্ম্মের মূলপ্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মসমাজের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। তত্ত্ব-প্রচার ও সমাজবিস্তারের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য 'প্রোজ্‌লিটিজ্‌ম্' (proselytism) বলিয়া যে কথাটি ব্যবহার করা হয়, ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষ্যেই তাহার সৃষ্টি এবং ধর্ম্মপ্রচার ক্ষেত্রেই তাহার যথার্থ প্রয়োগ।

ধর্ম্ম হইতে যখন একটা ধর্ম্মসমাজ জন্মলাভ করে, কতকগুলি লোক যখন কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস, সাধারণ ধর্ম্মোপদেশ ও সাধারণ ধর্ম্মাশ্বাস লইয়া সম্মিলিত হয়, তখন সে সমাজের একটা শাসনব্যবস্থাও প্রয়োজন হয়। শাসনব্যবস্থা ব্যতিরেকে কোন সমাজ এক সপ্তাহ, এমন কি, এক ঘণ্টাকালও টিকিয়া থাকিতে পারে না। সমাজ যখন গঠিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই গঠনব্যাপারটি সম্ভব ও সম্পূর্ণ

করিয়া তুলিবার জন্যই একটা শাসনতন্ত্রের আবশ্যক হয়, যাহা সমাজের বন্ধনস্বরূপ সাধারণ সত্যটিকে প্রচার করিবে, যাহা ঐ সত্যের অনুযায়ী বিধি-উপদেশগুলি শিক্ষা দিবে ও সমর্থন করিবে। অন্যান্য সমাজের ন্যায় ধর্ম্মসমাজের উপরও যে একটা শক্তিকেন্দ্র, একটা শাসনতন্ত্র স্থাপন করা প্রয়োজন, তাহা ঐ সমাজের অস্তিত্ব হইতেই অনুমেয় এবং শুধু যে শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, স্বাভাবিক নিয়মে তাহা গড়িয়াও উঠে। সাধারণভাবে সমাজে কিরূপে শাসনতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়, সে কথা আলোচনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইটুকুমাত্র বলিব যে, স্বাভাবিক নিয়মের গতি সেখানে কোন বাহিরের শক্তিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায় না, সেখানে শক্তি যোগ্যতমেরই হস্তগত হয়, যাহারা সমাজকে তাহার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিবে, তাহারাই সমাজের কর্ত্তৃত্বশক্তি লাভ করে। সামরিক অভিযানে যিনি বীরশ্রেষ্ঠ, তিনিই নেতৃত্ব লাভ করেন। ঐরূপ যদি কোন সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা তদ্বিধ কোন নৈপুণ্য-সাপেক্ষ ব্যাপার, তাহা হইলে যিনি দক্ষতম, তিনিই সঙ্ঘের অধিপতি হইবেন। সর্ব্ববিষয়েই যদি স্বাভাবিক নিয়ম অবাধে কাজ করিতে পায়, তাহা হইলে মানুষে মানুষে যে শক্তিবৈষম্য, তাহা সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং যাহার যেটি যথাযোগ্য স্থান, সে তাহাই অধিকার করিয়া বসে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও প্রতিভা, স্বাভাবিক বৃত্তি এবং ক্ষমতা হিসাবে মানুষে মানুষে কোনই সাম্য নাই ; কেহ বা ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিতে এবং ধর্ম্মমতের দিকে লোকসাধারণকে আকর্ষণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ ; কাহারও বা চরিত্রের মধ্যে এমন একটা নেতৃত্বশক্তি আছে, যাহার দ্বারা সে সমাজকে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ-পালনে সম্মত করিতে পারে ; কেহ বা আবার মানুষের মনের মধ্যে

ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মের আশা জাগাইয়া দিতে ও বাঁচাইয়া রাখিতে বিশেষ পারদর্শী। গুণ ও সামর্থ্যের যে তারতম্যের দরুন ব্যাবহারিক সমাজে কর্ত্তৃত্বশক্তির উদ্ভব হয়, ধর্ম্মসমাজেও সেই তারতম্যের জন্যই কর্ত্তৃত্বশক্তির উদ্ভব হয়। এক একজন মিশনরী বা প্রচারক উঠিয়া পড়ে ও সেনা-নায়কের মতই আত্মঘোষণা করে। এইরূপে একদিকে যেমন ধর্ম্মসমাজের প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের উদ্ভব হয়, অপর দিকে তেমনই এই তন্ত্রের পুষ্টি ও পরিণতি মানুষের গুণকর্ম্মের স্বাভাবিক বৈষম্যবশতঃ স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়। অতএব দেখা গেল, যে মুহূর্ত্তে মানুষের মধ্যে ধর্ম্মের উদ্ভব হয়, সেই মুহূর্ত্তেই একটি ধর্ম্মসমাজ গড়িয়া উঠে; এবং ধর্ম্মসমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমাজের একটি শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠে।

কিন্তু এইখানে একটা গোড়াকার আপত্তি উঠিতেছে। এই ধর্ম্ম-সমাজের ক্ষেত্রে হুকুম চালাইবার বা জোর খাটাইবার, এক কথায় শাসন-ব্যাপারেরই কোন অবকাশ নাই। অবাধ-স্বাধীনতাই যখন এ সমাজের লক্ষণ, তখন ইহার মধ্যে শাসনের স্থান কোথায়?

নিজের বিধিবিধান মানাইবার জন্য ও হুকুম চালাইবার জন্য প্রত্যেক শাসনতন্ত্র যে বাহুশক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে, কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ সেই শক্তির মধ্যেই তাহার যথার্থ সত্তা যদি নিঃশেষিত হইয়াছে মনে করি, তাহা হইলে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত স্থূল ও সঙ্কীর্ণ ধারণা করা হইবে।

ধর্ম্মশাসনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ঐহিক শাসনতন্ত্রের কথাই ধরুন। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেই ঘটনাপরম্পরার সরল স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করিয়া দেখুন। প্রথমে ধরুন একটা সমাজ আছে; সমাজ থাকিলেই সমাজের নাম ও সমাজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটা কিছু কর্ত্তব্য

আছে ; হয় ত একটা বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে, হয় ত একটা বিধান প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, হয় ত বা একটা রায় প্রকাশ করিতে হইবে। এই সমস্ত সামাজিক প্রয়োজন সাধনের জন্য একটা যথাযোগ্য আদর্শ প্রণালীও নিশ্চয় আছে ; আদর্শ বিধিই প্রণয়ন করিতে হইবে, উৎকৃষ্ট বিধানই প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, নির্দ্দোষ সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিতে হইবে। আলোচ্য বিষয় যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেক স্থলেই একটা আদর্শ আছে, একটা জ্ঞাতব্য সত্য আছে, এবং সেই সত্য অনুসারেই সমাজের প্রত্যেক কার্য্যের প্রণালী ও ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই সত্যের সন্ধান লওয়া, কোন্ ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও সমাজের উপযোগী, তাহা আবিষ্কার করা—ইহাই শাসনতন্ত্রের প্রথম কর্ত্তব্য। এই সত্যাদর্শের সন্ধান পাইলেই শাসনতন্ত্র ইহা ঘোষণা করিবে। তখন আবশ্যক হয়, লোকসমাজের মনের মধ্যে এই সত্য মুদ্রিত করিয়া দেওয়া ; শাসনতন্ত্র যাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহাদের অনুমোদন লাভ করা ; তাহার বিধিবিধান যে ন্যায়যুক্তির অনুকূল, লোকের মনে এই ধারণা উৎপাদন করা। ইহার মধ্যে কি বাহুশক্তি প্রয়োগের কোন লক্ষণ পাইলেন ? নিশ্চয়ই না। এখন মনে করুন, যে সত্য দ্বারা সমাজের বিধিবিধান শাসিত হওয়া উচিত, তাহা আবিষ্কৃত ও ঘোষিত হওয়া মাত্র সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা তাহাকে স্বীকার করিয়া লইল, সকলেই তাহার নিকট স্ব স্ব স্বাধীন ইচ্ছা অবনত করিল, সকলেই শাসনতন্ত্রের ন্যায়যুক্তিপরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার বিধিবিধান মানিয়া চলিতে লাগিল। এ ক্ষেত্রেও শাসনপরিচালনের, শক্তিপ্রয়োগের কোন অবসর নাই। তাহা হইলে কি এরূপ স্থলে শাসনতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নাই ? এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে শাসনতন্ত্রের কোন বিশিষ্ট

ক্রিয়া নাই ? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এ ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রও আছে এবং সে তাহার বিশিষ্ট কর্ত্তব্যও সম্পন্ন করিতেছে। বাহ্যশাসন তখনই আবশ্যক হয়, যখন শাসনতন্ত্রাবলম্বিত আদর্শ বা নীতি সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মতি ও স্বতঃপ্রণোদিত বশ্যতা প্রাপ্ত হয় না, যখন সমাজের ব্যক্তিবিশেষে এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসে। শাসনতন্ত্র তখন বশ্যতালাভ করিবার জন্য বাহ্যশক্তি প্রয়োগ করে; ইহা মানুষের স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতার অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং এ অসম্পূর্ণতা সমাজের মধ্যেও আছে, শাসনতন্ত্রের মধ্যেও আছে। এ অসঙ্গতি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয় ত কোন কালেই সম্ভব হইবে না; ঐহিক শাসনতন্ত্র মাত্রই কিয়ৎপরিমাণে বাহ্য শাসনশক্তি প্রয়োগ করিতে চিরকালই বাধ্য হইবে। কিন্তু এই বাহ্যশক্তি দ্বারাই কোন শাসনতন্ত্র গঠিত হয় না; যখনই এই শক্তিপ্রয়োগ পরিহার করা সম্ভব হয়, তখনই সে নিরস্ত হয়, এবং তাহাতে সকল পক্ষেরই প্রভূত কল্যাণ হয়। এমন কি, শাসনতন্ত্র যখন বাহ্যশাসন পরিহার করিতে পারে এবং মানুষের স্বাধীন ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে, তখনই সে যথার্থ সম্পূর্ণতা লাভ করে। অতএব সে যে পরিমাণে বাহ্যশাসন পরিহার করিবে, সেই পরিমাণে সে নিজের যথার্থ প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করিবে। ইহাতে বাস্তবিকপক্ষে তাহার শক্তির হ্রাস বা প্রভাব সঙ্কীর্ণ হয় না; সে তখন আর এক প্রণালীতে কাজ করে মাত্র, এবং সে প্রণালী বাহ্যশক্তি-প্রয়োগ অপেক্ষা শতকোটীগুণ ব্যাপক ও প্রবল। যে সকল শাসন-তন্ত্র সমধিকপরিমাণে বাহ্য শাসন প্রয়োগ করে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা ঐ পদ্ধতি একেবারেই অবলম্বন করে না বলিলেই হয়, তাহারা অধিকপরিমাণে কৃতকার্য্য হয়।

কেবলমাত্র মানুষের বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করাতে, কেবলমাত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়ের উপর নির্ভর করাতে শাসনতন্ত্রের সঙ্কোচ না ঘটিয়া বিস্তৃতি ও উন্নতিই সাধিত হয়। তখনই সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য সাধন করে, মহত্তম ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন করে। বিপরীত পক্ষে, যখন তাহাকে কেবলই বাহ্য শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া চলিতে হয়, তখনই সে ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন সে সামান্যই করিতে পারে, এবং যাহা করে, তাহাও ভাল করিয়া করিতে পারে না।

অতএব দেখা গেল যে, শক্তিপ্রয়োগ ও শাসনদণ্ড পরিচালনই শাসনতন্ত্রের সার তত্ত্ব নহে; শাসনতন্ত্রের প্রধান উপাদান হইতেছে এমন কতকগুলি উপায় ও শক্তির সমষ্টি, যাহা দ্বারা ক্ষেত্রানুযায়ী ব্যবস্থা আবিষ্কার করা যাইবে, যাহা দ্বারা সমাজনীতির সত্য আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই সত্যই সমাজকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে একমাত্র অধিকারী। সুতরাং এই সত্যের আদর্শ সমাজের সমক্ষে ধরিলেই মানুষের চিত্ত স্বভাবতঃই ইহাকে স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে বরণ করিয়া লইবে। অতএব শাসনদণ্ড পরিচালনের কোন অবসর না থাকিলেও শাসনতন্ত্রের একটা প্রয়োজন ও সার্থকতা থাকিতে পারে, ইহা সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে। এখন, ধর্ম্মসমাজের যে শাসনতন্ত্র, তাহা এই প্রকৃতির শাসনতন্ত্র। এ শাসনতন্ত্রের পক্ষে শক্তিপ্রয়োগ অবশ্যই নিষিদ্ধ; এ যদি শক্তিপ্রয়োগ করিতে যায়, তা সে যে উদ্দেশ্যই হউক না কেন, তাহা হইলে ইহার পক্ষে অবৈধ আচরণ হইবে; কারণ, ইহার একমাত্র শাসনাধিকার মানুষের বিবেকের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ শাসনতন্ত্রের একটা অস্তিত্ব আছে, তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ

সমস্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে—কোন্ কোন্ ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বারা মানুষের ভাগ্যসমস্যার সমাধান হয়; অথবা যদি ঐরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সমষ্টি পূর্ব্ব হইতেই থাকে, তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ সকল সাধারণ তত্ত্বের কিরূপ প্রয়োগ হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ ও প্রচার করিতে হইবে; ঐ সকল তত্ত্বের অনুযায়ী উপদেশ ও ব্যবহারবিধি প্রবর্ত্তন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে; জনসমাজে এই সকল উপদেশ শিখাইতে ও প্রচার করিতে হইবে এবং সমাজ পথভ্রষ্ট হইলে পুনরায় তাহাকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কোনরূপ জোর খাটান এখানে চলিবে না; এ শাসনতন্ত্রের কর্ত্তব্য—কেবল ধর্ম্মকর্ত্তব্যের আলোচনা, প্রচার ও শিক্ষণ, এবং প্রয়োজনানুসারে ক্রটি প্রদর্শন ও তিরস্কার। বাহ্য শাসন যতই পরিহার করুন না কেন, তথাপি দেখিবেন, শাসনতন্ত্র গঠনের সমস্ত মূলগত সমস্যাই মাথা তুলিয়া উঠিবে ও সমাধান দাবী করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ প্রশ্নটী সর্ব্বদাই উঠিবে, সর্ব্বদাই আলোচনা করা আবশ্যক হইবে যে, ধর্ম্মের জন্য এক সম্প্রদায় ধর্ম্মশাসকের কোন প্রয়োজন আছে কি না, সমাজভুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ধর্ম্মভাবের প্রেরণার উপর নির্ভর করা সম্ভব কি না। আপনারা জানেন, এই প্রশ্ন লইয়া একদিকে অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়, অপর দিকে কোয়েকারদিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঐরূপ একটা ধর্ম্মশাসকবর্গের প্রয়োজন আছে স্বীকার করিয়া লইলেও, এই সকল ধর্ম্মশাসক পরস্পর সমপদস্থ ও সমানাধিকারী হইবেন, সমানভাবে একত্র সম্মিলিত হইয়া আলোচনা মীমাংসা করিবেন, না উচ্চ নীচ পদাধিকারক্রমে বিন্যস্ত হইয়া একটী জটিল শাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলিবেন—এ প্রশ্নেরও কখনও শেষ মীমাংসা হইবে না; কারণ, কোন

ধর্ম্মশাসকেরই হাতে বাহ্যশক্তি প্রয়োগের অধিকার নাই। অতএব ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে গিয়া ধর্ম্মসমাজের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব উড়াইয়া না দিয়া, বরং ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, ধর্ম্ম-সমাজ স্বাভাবিকরূপেই গড়িয়া উঠে, এবং ধর্ম্মসমাজ হইতে ধর্ম্মশাসন-তন্ত্রের উদ্ভবও তেমনি স্বাভাবিক, এবং কি আকারে এই শাসনতন্ত্রের গঠন হওয়া উচিত, ইহার ভিত্তি কোথায়, ইহার মূলনীতি কি কি, ইহার অধিকারের ন্যায়সঙ্গত সীমা কোথায়—এই প্রশ্নেরই বিচার আবশ্যক। অন্যান্য শাসনতন্ত্রের পক্ষেও যেমন, ধর্ম্মশাসনতন্ত্রেরও পক্ষে তেমনি এই প্রশ্নের বিচারই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিচার।

অন্যান্য শাসনতন্ত্রের যে যে গুণে বৈধতা নিষ্পন্ন হয়, ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের পক্ষেও সেই সেই গুণের আবশ্যক। সে গুণ প্রধানতঃ দুইটি :—প্রথমে আবশ্যক যে, যোগ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির হস্তে শাসনক্ষমতা থাকিবে ; সমাজের মধ্যে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছড়াইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে বাছিয়া আনিয়া তাঁহাদের হাতেই সামাজিক বিধি প্রণয়ন ও শাসনক্ষমতা পরিচালনের ভার দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আবশ্যক যে, বৈধভাবে গঠিত শাসনশক্তি শাসনভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির বৈধ অধিকার মানিয়া চলিবে। একদিকে শাসনশক্তি-গঠনপ্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব, অপর দিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাসংরক্ষণের সুব্যবস্থা, এই দুইটি গুণের দ্বারাই কি ধর্ম্মশাসনতন্ত্র, কি ঐহিক শাসনতন্ত্র, সকল প্রকার শাসনব্যবস্থারই মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়, এই মাপকাঠিদ্বারাই সমস্ত শাসনতন্ত্রের বিচার হওয়া উচিত।

অতএব খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্রের অস্তিত্ব ধরিয়াই বিদ্রূপ না করিয়া, আমাদের দেখা উচিত—ইহার গঠন কিরূপ, উৎকৃষ্ট শাসনপদ্ধতির যে দুইটি লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা গেল, তাহার সহিত মূলনীতির মিল

আছে কি না। এখন এই দুই দিক্ দিয়া খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্রের বিচার করা যাউক।

চর্চ্চের শাসনশক্তির উদ্ভব ও বিস্তার আলোচনার স্থলে খৃষ্টীয় যাজকসম্প্রদায় সম্বন্ধে caste বা জাতি বলিয়া একটা শব্দ প্রয়োগ হয়, আমি ঐ শব্দটি বর্জ্জন করিতে চাই। ধর্ম্মশাসকসম্প্রদায়কে অনেক সময় একটা জাতি বলা হয়। জগতের চারি দিকে তাকাইয়া দেখুন; ভারতবর্ষ বলুন, মিশর বলুন, যেখানে যেখানে জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছে, সর্ব্বত্রই দেখিবেন, জাতি মূলতঃ বংশগত, ইহাদ্বারা পিতার পদ, পিতার অধিকার পুত্রে সঞ্চারিত হয়। যেখানে বংশগত উত্তরাধিকার নাই, সেখানে জাতি নাই, সে সমাজকে জাতি না বলিয়া সঙ্ঘ বলা উচিত। সঙ্ঘগত ভাবের কতকগুলি অসুবিধা আছে, কিন্তু ইহা জাতীয় ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। "জাতি" কথাটা খৃষ্টীয় চর্চ্চ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। যাজকদিগের চিরকৌমার্য্য তাহাদিগকে কখনও "জাতি" গড়িতে দেয় না।

এই বিভিন্নতার ফল আপনারা এখনই কতকটা বুঝিতে পারিতেছেন। জাতিপ্রথা ও উত্তরাধিকারপ্রথা অনেকটা একচেটিয়া ধরণের ব্যাপার। জাতি কথাটার সংজ্ঞার মধ্যেই ঐ একচেটিয়ার ভাব রহিয়াছে। যখন বিশেষ বিশেষ পরিবারের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ও অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তখন ঐ সকল বৃত্তি ও অধিকার যে ঐ ঐ পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইবে, যাহারা ঐ সকল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাদের পক্ষে যে ঐ সকল বৃত্তি ও অধিকার অনধিগম্য হইবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে ইহাই ঘটিয়াছিল। ধর্ম্ম-শাসনতন্ত্র যেখানে যেখানে একটা জাতির হাতে গিয়া পড়িয়াছে, সেই

সেই স্থলেই ইহা একটা বিশিষ্ট অধিকারের আকার ধারণ করিয়াছে; যাহারা ঐ জাতির কোন পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহারা এই শাসনতন্ত্রে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। খৃষ্টীয় চর্চ্চে এতৎসদৃশ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল যে কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না, তাহা নহে, পরন্তু খৃষ্টীয় চর্চ্চ বরাবরই বলিয়া আসিতেছে যে, জন্ম-জাতিনির্বিশেষে সকল ব্যক্তিই চর্চ্চের বৃত্তি অবলম্বন করিতে ও সম্মান পাইতে সমান অধিকারী। বিশেষতঃ পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যাজকবৃত্তির দ্বার সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত ছিল। সমাজের উচ্চ নীচ সকল পদবী হইতেই চর্চ্চ লোকসংগ্রহ করিয়া লইত, অধিকাংশ স্থলে নিম্নশ্রেণী হইতেই লইত। চর্চ্চের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্রই অধিকার-বৈশিষ্ট্যের রাজ্য, চর্চ্চই কেবল সাম্য ও সমানপ্রতিযোগিতার নীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, সেই কেবল সমাজের মধ্যে যে কেহ গুণশ্রেষ্ঠ, জাতিপদবীনির্ব্বিশেষে সকলকেই শাসনক্ষমতা পরিচালনের জন্য আহ্বান করিয়াছিল। চর্চ্চ যে জাতি নহে, সঙ্ঘমাত্র, ইহাই হইল তাহার সর্ব্বপ্রধান ফল।

আবার জাতিভেদ প্রথার মধ্যে একটা অচলতার ভাব আছে। এ কথার কোন প্রমাণ আবশ্যক নাই। যে কোন ইতিহাস খুলিয়া দেখুন, যেখানে যেখানে জাতিভেদ প্রথার প্রাধান্য, সেই সেই সমাজের মধ্যে একটা স্থাবরতার ভাব দেখিবেন। এ কথা অবশ্য সত্য যে, খৃষ্টীয় চর্চ্চের মধ্যেও এক সময়ে কতকপরিমাণে অগ্রগমনভীতি দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এ কথা আমরা বলিতে পারি না যে, ঐ ভীতি চর্চ্চের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছে; এ কথা বলা যায় না যে, খৃষ্টীয় চর্চ্চ অচল ও স্থাণু হইয়া রহিয়াছে; বহু দীর্ঘযুগ ধরিয়া সে সচলভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, কখনও বা বাহিরের আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া, কখনও বা

অন্তর হইতেই আভ্যন্তরীণ পুষ্টি ও সংস্কারপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া। মোটের উপর এ সমাজ কেবলই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইহার ইতিহাস বৈচিত্র্যময় ও অগ্রগামী। সকল শ্রেণীর লোককে যাজকবৃত্তিতে বরণ করিয়া লওয়ার ফলেই, সাম্যনীতি অনুসারে লোকসংগ্রহের ফলেই অবশ্য চর্চ্চের সজীবতা ও সচলতা বরাবর রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থাবরতা-ধর্ম্মের প্রাধান্য ঘটিতে পারে নাই।

চর্চ্চ ত সকল লোকের নিকট শাসনক্ষমতার প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল; কিন্তু এ ক্ষমতা পরিচালনের পক্ষে ন্যায্য অধিকার কাহার আছে, যোগ্যতা ও গুণশ্রেষ্ঠতা কাহার আছে, তাহা সে কি করিয়া আবিষ্কার করিত?

চর্চ্চের মধ্যে দুইটি নির্ব্বাচননীতির প্রাধান্য দেখিতে পাই। একটি শ্রেষ্ঠের দ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন বা মনোনয়ন, অপরটি নিকৃষ্টদ্বারা শ্রেষ্ঠের নির্ব্বাচন, অর্থাৎ আজকাল নির্ব্বাচন বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহাই।

যাজক নিয়োগের ক্ষমতা, কোন লোককে যাজকপদে বরণ করিয়া লইবার ক্ষমতা কেবল সঙ্ঘাধিপতির অধিকারে। এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন হইল। সেইরূপ ফিউড্যাল্-স্বত্ব-সম্পর্কিত কোন কোন যাজকবৃত্তি বণ্টনের সময় রাজা বা পোপ বা ভূস্বামী বৃত্তিভোগীর নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে আবার যথার্থ নির্ব্বাচনপ্রণালীই অবলম্বিত হইত। বিশপ্‌গণ বহু পূর্ব্ব হইতেই, এবং আমাদের আলোচ্য যুগেও, প্রায়শঃ যাজকসঙ্ঘকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন, অনেক সময়ে উপাসকবর্গও এই সকল নির্ব্বাচনে হস্তক্ষেপ করিত। মঠের মধ্যে মঠধারী সন্ন্যাসিবর্গই মঠের আবট্ বা মোহন্ত নির্ব্বাচন করিত। রোমে

কার্ডিনাল্‌সংঘ কর্ত্তৃক পোপের নির্ব্বাচন হইত, এক সময়ে সমগ্র রোমীয় যাজকবর্গ এই নির্ব্বাচনে যোগদান করিত। এইরূপে চর্চ্চের ইতিহাসে, বিশেষতঃ আমাদের আলোচ্য যুগে দুইটি নির্ব্বাচননীতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—এক শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন, আর এক নিকৃষ্টের দ্বারা শ্রেষ্ঠের নির্ব্বাচন। হয় পূর্ব্বোক্ত, নয় শেষোক্ত প্রণালীতে চর্চ্চ ধর্ম্মশাসনক্ষমতার একাংশ পরিচালনের জন্য লোকনির্ব্বাচন করিয়া লইত।

উভয় পদ্ধতি যে একত্র পাশাপাশি বর্ত্তমান ছিল, তাহাই নহে, উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধও ছিল। বহুশতাব্দীব্যাপী বহু পরিবর্ত্তনের পর খৃষ্টীয় চর্চ্চে শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টনির্ব্বাচন-পদ্ধতিই প্রাধান্য লাভ করিল। কিন্তু সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নিকৃষ্টদ্বারা শ্রেষ্ঠের নির্ব্বাচন—এই পদ্ধতিরই অধিক প্রসার ছিল। এইরূপ দুইটি বিরুদ্ধ নীতির একত্র সমাবেশে বিস্মিত হইবেন না। সাধারণসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, জগতের স্বাভাবিক গতি পর্য্যালোচনা করুন, জগতের মধ্যে অধিকার ও ক্ষমতা কিরূপে সঞ্চারিত হয়, দেখুন; এই সঞ্চার ব্যাপার কখনও প্রথমোক্ত নীতি অনুসারে, কখনও বা দ্বিতীয়োক্ত নীতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। চর্চ্চ এ নীতিদ্বয়ের সৃষ্টি করে নাই, মানবব্যাপারে বিধাতার শাসনপদ্ধতির মধ্যেই এই নীতি সে পাইয়াছে এবং তাহা হইতেই সে ইহা গ্রহণ করিয়াছে। উভয়ের মধ্যেই সত্য আছে, উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে; অনেক সময়ে উভয় নীতির সম্মিলনই যথার্থ শাসনাধিকারী নির্ব্বাচনের শ্রেষ্ঠ উপায়। আমার মনে হয়, এ একটা পরম দুর্ভাগ্য যে উভয়ের মধ্যে কেবল একটি নীতি—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠদ্বারা নিকৃষ্টের নির্ব্বাচন, চর্চ্চে প্রাধান্য লাভ করিল। এ নীতি কিন্তু কখনই সম্পূর্ণ একাধিপত্য করিতে পারে

নাই; নানা বিচিত্র নামে, বিভিন্ন যুগে এই দুই নীতির সংঘর্ষ চলিয়া আসিয়াছে—তাহাতে প্রথম নীতিটি পরাজিত হইলেও অন্ততঃ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে ও চিরপ্রতিষ্ঠিত শক্তিকে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমরা যে যুগের আলোচনা করিতেছি, তখন এই সাম্যনীতি অবলম্বন ও যোগ্যতার আদর করায় চর্চ্চের প্রভূত বলবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। চর্চ্চই তখন সর্ব্বজনপ্রিয় সমাজ ছিল; সর্ব্বপ্রকার প্রতিভা ও যোগ্যতার পক্ষে ইহা সহজাধিগম্য ও মুক্তদ্বার ছিল; মানবপ্রকৃতির যত মহদাকাঙ্ক্ষা, তাহা চরিতার্থ করার পক্ষে ইহা একমাত্র সুগম ক্ষেত্র ছিল। ইহাই হইল ইহার শক্তির যথার্থ স্থল; এ শক্তি তাহার অর্থসম্পত্তি হইতেও উদ্ভূত হয় নাই, যুগে যুগে যে সমস্ত অবৈধ উপায় সে অবলম্বন করিয়াছে, তাহা হইতেও হয় নাই।

ব্যক্তিস্বাধীনতার মর্য্যাদাবোধরূপ সুশাসনপদ্ধতির যে দ্বিতীয় লক্ষণ, সে বিষয়ে চর্চ্চের অনেক ত্রুটি ছিল। চর্চ্চের মধ্যে দুইটি কুনীতির একত্র সন্নিবেশ ঘটিয়াছিল:—একটি চর্চ্চের মতবাদের সহিত অনুস্যূত ও অবিচ্ছেদ্য; অপরটি মানুষের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য হইতে উদ্ভূত, চর্চ্চের মতবাদের অনিবার্য্য ফল নহে।

প্রথমটী এই যে, চর্চ্চ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির অধিকার অস্বীকার করে, সে সমগ্র ধর্ম্মসমাজের মধ্যে স্বানুমোদিত ধর্ম্মবিশ্বাস চালাইবার দাবী করে, সে কাহারও স্বাধীনভাবে বিচার করিবার অধিকার স্বীকার করে না। এ নীতি প্রবর্ত্তন করা সহজ, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে চালান তত সহজ নহে। মানুষের বুদ্ধি নিজে স্বীকার করিয়া না লইলে তাহার মধ্যে একটা নূতন মত বা বিশ্বাস প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় না; বিশ্বাসটিকে প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলা চাই। সে যে আকারেই উপস্থিত হউক না কেন, যত বড় নামেরই দোহাই দিক

না কেন, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে বিচার করিয়া লইবে; সে বিশ্বাস যদি লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহা হইলে মানুষের বিচারবুদ্ধি তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে বলিয়াই সে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছে। এইরূপে মানুষের বুদ্ধির উপর যে কোন ধারণা বা বিশ্বাস চাপাইবার চেষ্টা করা হয়, মানুষের বুদ্ধি তাহা লইয়া স্বাধীনভাবে বিচার বিতর্ক করিবেই; ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নানা প্রচ্ছন্ন আকারে আত্মগোপন করিতে পারে,কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ কথা খুব সত্য যে, মানুষের বুদ্ধিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে; সে কিয়ৎপরিমাণে নিজকে বিকলাঙ্গ ও স্বাধিকারভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; তাহাকে নিজের বৃত্তি-গুলির অপব্যবহার বা অসম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে সম্মত করা যাইতে পারে। চর্চ্চ-প্রবর্ত্তিত উল্লিখিত কুনীতির ফলে ইহাই বাস্তবিকপক্ষে ঘটিয়াছিল। কিন্তু এ নীতির বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ প্রভাবের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখিব, ইহা কখনই সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না বা পারে নাই।

চর্চ্চ-প্রবর্ত্তিত দ্বিতীয় কুনীতি এই যে, সে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা লোককে বাধ্য করিবার অধিকার দাবী করে। বাস্তবিকপক্ষে এ অধিকার ধর্ম্মসমাজের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, চর্চ্চের উদ্ভবতত্ত্বের বিরোধী, চর্চ্চের আদিম নীতি ও উপদেশের প্রতিকূল। সেণ্ট আম্ব্রোস্, সেণ্ট হিলারী, সেণ্ট মার্টিন প্রভৃতি চর্চ্চের সুপ্রসিদ্ধ আদিম নেতৃগণ এ অধিকার স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তথাপি ইহা চর্চ্চের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। লোককে শারীরিক দণ্ড দেওয়া, অত্যাচারের দ্বারা পাষণ্ডদলন, মানবচিন্তার স্বাধীন গতির প্রতি অবজ্ঞা,—এ কুনীতি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বেই চর্চ্চে প্রবেশলাভ করিয়াছিল; এবং ইহার জন্য চর্চ্চকে কম দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় নাই।

অতএব যদি চর্চ্চ-শাসনভুক্ত ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতার সম্পর্কে চর্চ্চের বিচার করি, তাহা হইলে দেখিব, এ বিষয়ে চর্চ্চের শাসননীতি তাহার নেতৃনির্ব্বাচন-নীতি অপেক্ষা অবৈধ ও অকল্যাণকর। তাই এ কথা মনে করা উচিত নহে যে, একমাত্র কুনীতিদ্বারা সমস্ত প্রতিষ্ঠানই দূষিত হইয়া যায় বা তাহার মধ্যে যাহা কিছু মন্দ দেখা যায়, সমস্তই ঐ একমাত্র কুনীতি হইতে প্রসূত। বিশুদ্ধ ন্যায়ের যুক্তি যেমন ইতিহাসকে সত্যভ্রষ্ট করে, তেমন আর কিছুতেই করে না। একটা বিশেষ চিন্তা বা ধারণা যখন মানুষের মনকে অধিকার করিয়া বসে, তখন সে ঐ একটি তত্ত্ব হইতে যত কিছু ব্যাপারের উদ্ভব হওয়ার সম্ভব, যুক্তিবলে সবগুলি টানিয়া বাহির করে এবং সবশুদ্ধ ইতিহাসের ঘাড়ে চাপাইয়া বসে। কিন্তু বাস্তব জগতে ঠিক এইরূপ ঘটে না; মানুষের ন্যায়বুদ্ধির নিকট কার্য্যকারণের যেরূপ অব্যবহিত সম্বন্ধ, বাহ্য ঘটনার ক্ষেত্রে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। জগতের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই ভালমন্দের এমন একটা সুনিবিড় সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবসমাজ বা মানবাত্মার সুগভীর প্রদেশে প্রবেশ করিলেও দেখিতে পাইব, এই দুই তত্ত্ব পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিতেছে, পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে; কিন্তু কেহ কাহাকেও নির্ম্মূল করিতে পারিতেছে না। মানবপ্রকৃতি কখনও ভাল মন্দ, কোনটিরই চরম সীমায় পদার্পণ করে না; সে অনবরত একটি হইতে অপরটিতে যাতায়াত করিতেছে, কখনও বা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মাথাখাড়া করিয়া উঠিতেছে, আবার কখনও বা দৃঢ়পদক্ষেপে চলিতে চলিতে হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। যে বৈষম্য, বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্ব আমি ইউরোপীয় সভ্যতার মূলগত প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, এ ক্ষেত্রে আমরা তাহাই দেখিতে পাইব।

চর্চ্চের শাসনতন্ত্রের আর একটা সাধারণ লক্ষণ আছে, সেটা এখানে আলোচনা করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান কালে যখন আমরা কোন শাসনতন্ত্রের কথা ভাবি, তখন এটা আমরা নিশ্চয় জানি যে, মানুষের বাহ্য আচরণ, মানুষে মানুষে যে ব্যাবহারিক সম্বন্ধ, সেই ক্ষেত্রেই ইহার অধিকারের সীমা; এতদতিরিক্ত কোন বিষয়ে শাসনাধিকারের কোন প্রয়োগ নাই। মানুষের চিন্তা, মানুষের বিবেক, মানুষের চরিত্রনীতি, মানুষের ব্যক্তিগত মত ও ব্যক্তিগত আচার আচরণের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র কোন হস্তক্ষেপ করে না; এ সমস্ত ব্যাপারে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

খৃষ্টীয় চর্চ্চের উদ্দেশ্য ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। সে মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের ব্যক্তিগত আচার আচরণ, মানুষের চিন্তা প্রতীতি শাসন করিতে চাহিয়াছিল। যে সমস্ত কার্য্য এককালে নীতিবিগর্হিত ও সমাজের অকল্যাণকর, কেবলমাত্র সেই সকল আচরণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য এবং কেবলমাত্র এই দ্বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত আচরণের দণ্ড-বিধানের জন্য আমরা যেমন একটা ব্যবহারসংহিতা গড়িয়া তুলিয়াছি, চর্চ্চ তাহা করে নাই। সে নীতিবিগর্হিত সমস্ত আচরণের একটা তালিকা প্রস্তুত করিল, এবং সকলগুলিকেই 'পাপ' আখ্যান দিয়া, তাহাদের দমনের জন্য দণ্ডবিধান করিল; এক কথায় চর্চ্চের শাসনতন্ত্র আধুনিক শাসনতন্ত্রসমূহের ন্যায় কেবল বাহ্য মানবকে, মানুষের ব্যাবহারিক সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিল না; সে শাসন করিতে চাহিল মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি, মানুষের বুদ্ধিবিবেক, অর্থাৎ যাহা কিছু মানুষের অন্তরের সামগ্রী, যাহা অবলম্বন করিয়া সে নিজের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে, শাসন-বন্ধন মানিতে চাহে না। অতএব চর্চ্চের উদ্দেশ্যের মধ্যেই, এবং তাহার শাসনতন্ত্রের কতকগুলি মূলনীতির মধ্যেই এমন

একটা সম্ভাবনা রহিল যে, সে অত্যাচারী হইবে, অবৈধভাবে শক্তি পরিচালনা করিবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা বিরুদ্ধশক্তি উঠিয়া চর্চ্চের শক্তিকে প্রতিরোধ করিল যে, চর্চ্চ তাহাকে পরাজয় করিতে পারিল না। মানুষের চিন্তা ও স্বাধীনতার গতি যতই সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ থাকুক না কেন, সে সমস্ত শাসন-চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া করিতে থাকে, অত্যাচারী শক্তিকে প্রতি মুহূর্ত্তেই অধিকারচ্যুত করিতে থাকে। খৃষ্টীয় চর্চ্চের ক্রোড়ে এইরূপ ব্যাপারই সংঘটিত হইয়াছিল। আপনারা দেখিয়াছেন, চর্চ্চ পাষণ্ড-মত দলন করিতে চাহিয়াছে, স্বাধীন চিন্তা অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছে, ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে এবং কর্ত্তৃত্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া মত প্রচার করিতে চাহিয়াছে। উত্তম কথা! কিন্তু চর্চ্চের মধ্যে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি যেমন সতেজে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন আর কোন্ সমাজে ঘটিয়াছে বলুন দেখি? বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়, বিভিন্ন পাষণ্ড মত, এগুলি যদি ব্যক্তিগত মতের বিকাশ নহে, তবে কি? চর্চ্চের মধ্যে যে মানুষের বুদ্ধিবিবেকের একটা স্বাধীন লীলা চলিতেছিল, এইগুলি তাহার অকাট্য প্রমাণ। এ লীলার ইতিহাস ঝটিকাবিক্ষুব্ধ, বিপৎসঙ্কুল, ভ্রমবিড়ম্বিত, পাপকলঙ্কিত; কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে একটা মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য আছে, এবং ইহা হইতে মানব-মনের নানা বিচিত্র সুন্দর বিকাশ ঘটিয়াছে। এই সকল বিরোধী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া চর্চ্চের মূল শাসনতন্ত্রের দিকেই দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন, ইহার গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর সহিত ইহার কোন কোন নীতির সেরূপ মিল নাই। সে স্বাধীন সত্যানুসন্ধানের অধিকার স্বীকার করে নাই, ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা সে কাড়িয়া লইতে চাহিয়াছে; অথচ এই বিচারবুদ্ধির নিকটই সে অনবরত

জবাবদিহি করিয়াছে, স্বাধীনতার মর্য্যাদা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। সে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে, কোন্ কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া আসিয়াছে, দেখুন। প্রাদেশিক সংসদ্, জাতীয় সংসদ্, সাধারণ সংসদ্, ক্রমাগত পত্র-ব্যবহার, পত্রাদি-দ্বারা উপদেশ-অনুযোগ প্রচার, রচনা প্রকাশ—এই সমস্তই ইহার অবলম্বিত উপায়। আর কোন শাসনতন্ত্র কখনও এত অধিক পরিমাণে স্বাধীন বিচার ও সম্মিলিত পরামর্শ দ্বারা শাসনকার্য্য চালায় নাই। এ যেন প্রাচীন গ্রীসের একটা দার্শনিক চতুষ্পাঠী; অথচ এখানে শুধু আলোচনার জন্য আলোচনা নহে, সত্যানুসন্ধানই এ আলোচনার চরম লক্ষ্য নহে; এ আলোচনার ফলে শাসনাধিকার নির্দ্দিষ্ট হইল, বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল, মীমাংসা প্রচারিত হইল—এক কথায় শাসনকার্য্য পরিচালিত হইল। কিন্তু শাসনতন্ত্রের মর্ম্মস্থলেই মানুষের বিচারবুদ্ধির এমন একটা প্রবল ক্রিয়া চলিতেছিল যে, কালক্রমে তাহারই প্রাধান্য ও ব্যাপ্তি ঘটিল, তাহার নিকট আর সকল শক্তিই পথ ছাড়িয়া দিল এবং চারিদিকে বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীনতার আলোকই প্রভান্বিত হইয়া উঠিল।

আমি এ কথা বলিতে চাই না যে, চর্চ্চ-অবলম্বিত কুনীতিদ্বয়ের কোন ফলই ফলে নাই। আমাদের আলোচ্য যুগেই উহারা যথেষ্ট কুফল প্রসব করিয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী যুগে উহারা আরও কুফল প্রসব করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের পক্ষে যতটা অকল্যাণ সাধন করা সম্ভব, ততটা অনিষ্ট তাহারা করিতে পারে নাই; তাহাদের চারি পার্শ্বে একই মৃত্তিকায় যে সমস্ত কল্যাণের অঙ্কুর ছিল, সে সবগুলিকে তাহারা চাপিয়া মারিতে পারে নাই।

এই হইল চর্চ্চের স্বরূপ, তাহার আভ্যন্তরীণ গঠন, তাহার প্রকৃতি।

এখন রাষ্ট্রপতিদের সহিত, ঐহিক শাসকবৃন্দের সহিত চর্চ্চের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, দেখা যাউক।

রোমীয় সাম্রাজ্যের ক্রোড়ে খৃষ্টীয় চর্চ্চের উদ্ভব; রোমীয় শাসনতন্ত্রের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল; উভয়ের রীতিপদ্ধতি, উভয়ের অভ্যাস-সংস্কারে অনেক সাদৃশ্য ছিল। সেই রোমীয় সাম্রাজ্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার পরিবর্ত্তে যখন চারিদিকে বর্ব্বরদলপতি ও রাষ্ট্রপতিগণ কখনও যাযাবর ভাবে, কখনও বা স্ব স্ব দুর্গমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশ শাসন করিতে লাগিল, চর্চ্চ তখন বিপন্ন ও শঙ্কাগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

তখন চর্চ্চের মধ্যে একটিমাত্র প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিল —এই সকল নবাগতবৃন্দকে নিজের অধিকারে আনিতে হইবে, তাহাদিগকে চর্চ্চের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইতে হইবে। চর্চ্চের সহিত বর্ব্বরদিগের প্রথম সম্পর্কের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না বলিলেই হয়। বর্ব্বরদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে, তাহাদের ইন্দ্রিয় ও কল্পনা আকর্ষণ করিতে হইবে। সুতরাং এই যুগে উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে জাঁকজমকসম্পন্ন নানা বিচিত্র অনুষ্ঠান প্রবেশ করিল দেখিতে পাই। ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, চর্চ্চ প্রধানতঃ এই উপায়েই বর্ব্বর সমাজকে বশ করিয়াছিল। তাহারা যখন নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিল, চর্চ্চের সঙ্গে যখন তাহাদের একটা সম্বন্ধবন্ধন ঘটিল, তখনও কিন্তু চর্চ্চ তাহাদের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারে নাই। বর্ব্বরদিগের পাশবতা ও প্রবৃত্তি-প্রবণতা এরূপ প্রবল ছিল যে, নূতন ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব তাহাদের উপর সামান্যমাত্র প্রভাব স্থাপন করিতে পারিল। বর্ব্বরসুলভ অত্যাচার উপদ্রব শীঘ্রই আবার মাথা তুলিয়া উঠিল, এবং সমাজের অন্যান্য অঙ্গের

ন্যায় চর্চ্চও এই উপদ্রবের ফলভাগী হইল। পূর্ব্বে রোমীয় সাম্রাজ্যের শাসনকালেই চর্চ্চ অস্পষ্টভাবে একটি নীতি প্রচার করিয়াছিল যে, ঐহিক শাসনশক্তি ও পারত্রিক শাসনশক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও পরস্পরনিরপেক্ষ। এখন আত্মরক্ষার জন্য চর্চ্চ এই পুরাতন নীতিটি পুনরায় ঘোষণা করিয়া দিল। এই নীতির বলেই চর্চ্চ বর্ব্বরসংসর্গে স্বচ্ছন্দভাবে বাস করিতে পারিয়াছিল; সে প্রচার করিল যে, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মমতের উপর শাসন-শক্তির কোন অধিকার নাই; ব্যাবহারিক জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। এ নীতি সমাজের পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। চর্চ্চের ত ইহাতে সাংসারিক সম্পর্কে উপকার হইলই, তাহা ছাড়া ইহাদ্বারা একটা বড় কাজ এই হইল যে, একই সমাজে বিভিন্ন শাসনশক্তি কিরূপে পৃথক্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরস্পরের ন্যায্য অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে ও পরস্পরকে সংযত করিয়া সমাজকে অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারে, তাহা এই নীতিপ্রবর্ত্তনের ফলেই প্রথম দেখা গেল। পরন্তু সাধারণ-ভাবে সমগ্র চিন্তাজগতের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়া, ইহা ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। চর্চ্চ বলিল, ধর্ম্মবিশ্বাসপদ্ধতির উপর বাহ্যশক্তির জোর খাটে না; ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব চিন্তা ও বিশ্বাসের সম্বন্ধে চর্চ্চ-কথিত নীতি প্রয়োগ করিতে লাগিল। বাস্তবিকপক্ষে চর্চ্চের স্বাতন্ত্র্যনীতি ও ব্যক্তিবিবেকের স্বাতন্ত্র্যনীতি, উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

দুঃখের বিষয় যে, স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা অতি সহজেই প্রভুত্বলিপ্সায় পরিণত হয়। চর্চ্চের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। মানবস্বভাবসুলভ দুরাকাঙ্ক্ষা ও অহঙ্কারের প্রভাবে চর্চ্চ শুধু ধর্ম্মতন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, সে ঐহিক শাসনতন্ত্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে

চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কথা মনে করিবেন না যে, মানবচরিত্রসুলভ দৌর্ব্বল্যই ইহার একমাত্র কারণ; ইহার আরও কতকগুলি গভীরতর কারণ আছে, সেগুলি জানা আবশ্যক।

যখন চিন্তাজগতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছে; যখন মানুষের বুদ্ধি ও বিবেক এমন কোন শক্তির অধীন নহে যে তাহার বিতর্ক মীমাংসার অধিকার অস্বীকার করে বা তাহার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে; যখন সমাজের মধ্যে এমন একটা সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ গঠন-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাসনতন্ত্র নাই যে, লোকের মতামত নির্দ্দেশ করিয়া দিবার অধিকার প্রয়োগ করে; তখন ধর্ম্মব্যবস্থা কর্ত্তৃক ঐহিক ব্যবস্থার উপর আধিপত্যস্থাপন সম্ভবপর নহে। জগতের বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা এইরূপ। কিন্তু যখন দশম শতাব্দীতে যেমন ছিল, সেইরূপ একটা ধর্ম্মশাসনতন্ত্র থাকে, যখন মানুষের চিন্তা ও বিবেক একটা শাসনাধিকার-সম্পন্ন কর্ত্তৃত্বশক্তির বিধিব্যবস্থা দ্বারা আবদ্ধ, তখন এটা স্বাভাবিক যে, এই ধর্ম্মশাসনতন্ত্র ক্রমশঃ ঐহিক ব্যাপারেও আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইবে। সে বলিবে—"এ কি কথা? মানুষের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন, তাহার উপর আমি অধিকার ও প্রভাব প্রয়োগ করিতেছি, আমি মানুষের চিন্তা, মানুষের আকাঙ্ক্ষা, মানুষের বিবেক শাসন করিতেছি; আর মানুষের বাহ্য আচরণ, মানুষের ঐহিক ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না? আমি সত্য ও ন্যায়ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা, অথচ সত্য ও ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারে মানুষের সাংসারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে আমার কোন অধিকার নাই?" এই যুক্তির বলে ধর্ম্মশাসনতন্ত্র যে ঐহিক ব্যাপারে অধিকার বিস্তার করিতে চেষ্টা করিবে, ইহা ত অবশ্যম্ভাবী। তখন আবার মানবচিন্তার সমস্ত গতি চর্চ্চের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল; তখন

ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যাই একমাত্র বিদ্যা ছিল; ধর্ম্মতত্ত্বপদ্ধতিই একমাত্র চিন্তা-পদ্ধতি ছিল; অলঙ্কার বলুন, গণিত বলুন, সঙ্গীত বলুন, অন্য সমস্ত বিদ্যাই ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যার অন্তর্গত ছিল।

এইরূপে চর্চ্চ যখন দেখিল যে, সে মানবচিন্তার সমস্ত বিচিত্র বিকাশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, তখন স্বভাবতঃই সে জগতের সমগ্র শাসনাধিকার দাবী করিয়া বসিল। আর একটি কারণেও এই পরিণতির সহায়তা করিল। ঐহিক শাসনব্যাপারে তখন ভয়ানক বিশৃঙ্খলা; শাসকবৃন্দের উপদ্রব ও অন্যায়াচরণে লোকসমাজ তখন বিধ্বস্ত।

আমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া ঐহিকশাসনতন্ত্রের ন্যায্য অধিকারের পক্ষে অনেক কথা বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য যুগে, ঐহিকশাসন কেবল বাহুবলের উপদ্রবমাত্র, অদম্য দস্যুবৃত্তিমাত্র। চরিত্রনীতি ও ন্যায়ধর্ম্ম সম্বন্ধে চর্চ্চের ধারণা যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, এরূপ ঐহিকশাসনতন্ত্র অপেক্ষা চর্চ্চের শাসনতন্ত্র শতসহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ ছিল; প্রজাবৃন্দের আর্ত্তনাদে অনবরতই তাহাকে ঐ শাসনতন্ত্রের স্থান অধিকার করিতে হইয়াছিল। যখন পোপ কিংবা বিশপ্‌গণ ঘোষণা করিতেন যে, অমুক রাজা অন্যায়াচরণের দরুন স্বাধিকারভ্রষ্ট হইলেন এবং তাঁহার প্রজাবৃন্দ তাঁহার শাসনপাশ হইতে মুক্ত হইল, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের এই মধ্যবর্ত্তিতা ন্যায়সঙ্গত ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইত। সাধারণতঃ মানবজাতি যখনই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তখন ধর্ম্ম আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিবার ভার লইয়াছে। দশম শতাব্দীতে প্রজাবৃন্দের এমন অবস্থা ছিল না যে, তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে; রাজশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে; ভগবানের নাম

লইয়া ধর্ম্ম আসিয়া তখন প্রজারক্ষা করিত। ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির এটি একটি প্রবল কারণ।

আর একটী তৃতীয় কারণ আছে, সেটি প্রায়ই লক্ষ্য করা হয় না। চর্চ্চের নেতৃবৃন্দের সামাজিক পদবী ও অবস্থান অত্যন্ত জটিল; তাঁহারা সমাজে নানা বিচিত্ররূপে নানা বিচিত্র সম্বন্ধে দেখা দিতেন। একদিকে তাঁহারা ধর্ম্মনেতৃ যাজকপ্রধান, ধর্ম্মসমাজের অঙ্গ, ধর্ম্মশাসন-তন্ত্রের পরিচালক,—এ হিসাবে তাঁহারা স্বাধীন। অপর দিকে তাঁহারা ভূম্যধিকারী, সুতরাং সে হিসাবে ফিউড্যাল্-তন্ত্রের বিধিবিধানের অধীন, উর্দ্ধতন ও নিম্নতন ভূম্যধিকারীর সহিত ফিউড্যাল্-দায়বন্ধনে আবদ্ধ। শুধু ইহাই নহে, তাঁহারা আবার রাষ্ট্রপতির প্রজা। প্রাচীন রোমীয় সম্রাট্দিগের সহিত সে কালের বিশপ্ ও যাজকবর্গের যে সম্বন্ধ ছিল, অভিনব বর্ব্বর নৃপতিগণের সহিতও যাজকদিগের কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। নানা কারণে বিশপ্গণ বর্ব্বরনৃপতিগণকে প্রাচীন রোমীয় সম্রাট্দিগের উত্তরাধিকারিস্বরূপ গণ্য করিতে থাকেন। যাজকনেতৃবর্গের তাহা হইলে এই ত্রিবিধ প্রকৃতি—প্রথমতঃ, তিনি যাজক, সুতরাং স্বক্ষেত্রে স্বাধীন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি ফিউড্যাল্ ভূম্যধিকারী, সুতরাং কতকগুলি কর্ত্তব্যের দায়ে আবদ্ধ; এবং সর্ব্বশেষে তিনি রাজার প্রজা, সুতরাং একেশ্বর রাজার আদেশ পালন করিতে বাধ্য। এখন ইহার পরিণাম কি, দেখুন। ঐহিক রাজবৃন্দের অর্থলিপ্সা বা প্রাধান্যলিপ্সা বিশপ্দিগের অপেক্ষা কম ছিল না। তাঁহারা ফিউড্যাল ভূস্বামী বা রাষ্ট্রপতি ছিলেন। স্ব স্ব ক্ষমতা পরিচালন করিয়া অনেক সময় বিশপ্দিগের ধর্ম্মতন্ত্রঘটিত অধিকারেও হস্তক্ষেপ করিতেন; অনেক সময় তাঁহারা নিজেরাই যাজকনিয়োগ বা বিশপ্নিয়োগ বা চর্চ্চের বৃত্তিবণ্টন করিতে চাহিতেন। এদিকে

আবার বিশপ্‌গণও চর্চ্চ-শাসনের অলঙ্ঘ্য গণ্ডীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া ভূম্যধিকারীর দায় ও প্রজার কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন। সুতরাং উভয় পক্ষ হইতেই স্বভাবতঃ চেষ্টা হইতে লাগিল যে, একে অন্যের উচ্ছেদসাধন করিবে। রাষ্ট্রপতি চর্চ্চের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিতে চাহিলেন, যাজকপ্রধানগণ তেমনি চর্চ্চের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া সমাজের সমগ্র শাসনক্ষমতা অধিকার করিতে চাহিলেন।

ইহার পরিণাম যে কি ঘটিয়াছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; একদিকে যাজকবরণ লইয়া কলহ, অপর দিকে সম্রাটের সহিত পোপের কলহ। এ কলহে কাহার ন্যায্য অধিকারের সীমা কতটুকু, তাহা নির্দ্দেশ করা এবং এই সকল বিরুদ্ধ দাবীর মীমাংসা করা যে এত কঠিন ছিল, তাহার যথার্থ কারণ, চর্চ্চের নেতৃবৃন্দের অবস্থানবৈচিত্র্য ও সম্বন্ধবৈচিত্র্য।

চর্চ্চের সহিত রাষ্ট্রপতিগণের আর একটি তৃতীয় সম্বন্ধ ছিল; এই সম্বন্ধ চর্চ্চের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অকল্যাণজনক হইয়াছিল। পাষণ্ডদলনকার্য্যে চর্চ্চ রাষ্ট্রপতিগণের সহকারিতা দাবী করিত; এ কার্য্যসাধনের জন্য তাহার নিজের কোন উপায় ছিল না; তাহার হাতে সৈন্য সামন্ত ছিল না, বলপ্রয়োগের কোন উপকরণ ছিল না; পাষণ্ড বিধর্ম্মীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াই তাহাকে ক্ষান্ত থাকিতে হইত, তাহাকে দণ্ড দিবার কোন উপায় তাহার হাতে ছিল না। সে তখন ঐহিক বাহুবলের সহায়তা ভিক্ষা করিত, ঐহিকতন্ত্রের শক্তি ধার করিয়া লইত। এইরূপে ঐহিক শাসকদিগের সম্পর্কে তাহাকে কতকটা হীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত। ঐহিক সহকারিতা ও উৎপীড়ন-নীতি অবলম্বন করিতে গিয়া তাহাকে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

চর্চ্চের সহিত সাধারণ জনবর্গের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, কোন্ কোন্

নীতিদ্বারা এই সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হইত এবং সভ্যতার ইতিহাসে এই সকল নীতির ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছে—এ সকল কথা এবারকার মত অবশিষ্ট থাকিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই আলোচনার পর আমরা ইতিহাসের ঘটনার সহিত আমাদের যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তগুলি মিলাইয়া দেখিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় চর্চ্চের অবস্থা সম্বন্ধে গত অধ্যায়ে আমরা যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা তিন দিক্ দিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিব স্থির করিয়াছি—প্রথমতঃ, চর্চ্চের অন্তঃপ্রকৃতি ও আভ্যন্তরীণ গঠনের আলোচনা; দ্বিতীয়তঃ, চর্চ্চের সহিত রাজশক্তি বা ঐহিক শাসনশক্তির সম্বন্ধ-বিচার; এবং তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের সহিত চর্চ্চের সম্বন্ধবিচার। ইহার মধ্যে আমরা প্রথম দুইটি বিভাগেরই আলোচনা শেষ করিয়াছি। এখন প্রজাসাধারণের সহিত চর্চ্চের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, সেই আলোচনা অবশিষ্ট আছে। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার উপর চর্চ্চের প্রভাব কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ বিচারের পর আমরা একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিব। সর্ব্বশেষে, আমাদের যুক্তিমূলক সিদ্ধান্তগুলি তথ্যের সহিত, চর্চ্চের ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিয়া লইব।

আপনারা সহজেই বুঝিবেন যে, জনসাধারণের সহিত চর্চ্চের সম্বন্ধ-বিচারে, আমাকে বাধ্য হইয়া কেবল স্থূল ও সাধারণভাবে আলোচনা করিতে হইবে। আমি এখানে চর্চ্চের ক্রিয়ানুষ্ঠানের অথবা যাজকবর্গের সহিত প্রজাবর্গের দৈনন্দিন কারবারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। চর্চ্চের শাসনপদ্ধতি ও জনবর্গের প্রতি চর্চ্চের আচরণ—ইহার মূলনীতি ও স্থূল পরিণামের কথাই আপনাদের সমক্ষে উত্থাপিত করিব।

চর্চ্চের শাসনতন্ত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ ও মূলগত দোষই হইল এই যে, ইহাতে শাস্তা ও শাসিতের একান্ত পার্থক্য। শাসন-ব্যবস্থায় শাসিত-

বর্গের কোনই প্রভাব ছিল না। খৃষ্টীয় যাজকসম্প্রদায় উপাসকবর্গের সম্পর্কে একেবারে স্বাধীন!

নিশ্চয়ই তখনকার মানুষের ও সমাজের অবস্থার মধ্যেই এমন কিছু ছিল, যাহা হইতে এই দোষের উদ্ভব ঘটিয়াছে; কারণ, অতিপ্রাচীনকালেই খৃষ্টীয় চর্চ্চের মধ্যে এই দোষ প্রবেশ করিয়াছে দেখিতে পাই। আমরা যে যুগের আলোচনা করিতেছি, তখনও যাজকবর্গ ও উপাসকবর্গের পরস্পরস্বাতন্ত্র্য পূর্ণপরিণতি লাভ করে নাই; তখন কোন কোন ক্ষেত্রে —যথা বিশপ্ নির্ব্বাচন ব্যাপারে—ধর্ম্মশাসনব্যবস্থায় সাধারণ উপাসক-মণ্ডলীকে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায়। কিন্তু এই অধিকার ক্রমশঃ ক্ষীণ ও বিরল হইয়া আসিতে লাগিল; খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই সুস্পষ্টরূপে ও দ্রুতবেগে ইহা লোপ পাইতে থাকে। যাজকবর্গের এই স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতার ইতিহাসই একরূপ চর্চ্চের ইতিহাস। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের আলোচ্য যুগে এবং আরও বেশী পরিমাণে পরবর্ত্তী যুগে যে সমস্ত দুর্নীতি ও দুষ্টাচার চর্চ্চকে অনেক দুর্ভোগ ভোগাইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই এই স্বাতন্ত্র্যনীতি হইতে উদ্ভূত। তাই বলিয়া এ কথা বলা ঠিক হইবে না যে, এই স্বাতন্ত্র্যনীতিই ইহাদের একমাত্র মূল বা এই স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা কেবল খৃষ্টীয় যাজকবর্গেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। ধর্ম্মসমাজের স্বভাবই এই যে, তাহার মধ্যে শাসকবর্গকে শাসিত-সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে স্থাপন করিবার দিকে একটা প্রবণতা থাকে; শাসকবর্গের মধ্যে একটা বিশিষ্ট দৈব অধিকার আরোপ করিবার দিকে ঝোঁক থাকে। তাঁহারা যে দৈবকার্য্যে নিযুক্ত, লোকনয়নে তাঁহাদের চরিত্র যেরূপ দিব্যবিভূতিমণ্ডিত হইয়া প্রতিভাসিত হয়, তাহাতেই এইরূপ ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মসমাজে এই স্বাতন্ত্র্য-নীতির ফল যত বিষময়, তেমন আর কোন সমাজে নহে। কারণ,

এক্ষেত্রে শাসন-ব্যাপারের উপর শাসিত সম্প্রদায়ের জীবনের কতখানি শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে ভাবিয়া দেখুন। তাহাদের বুদ্ধিবিবেক, তাহাদের ভাবী নিয়তি, অর্থাৎ যাহা কিছু তাহাদের অন্তরের বস্তু, যাহা কিছু তাহাদের একান্ত নিজস্ব, যাহা কিছু তাহাদের মধ্যে স্বাধীন ও মুক্ত, তাহাই নির্ভর করিতেছে। আমরা বরং এটা বেশ ধারণা করিতে পারি যে, প্রভূত ক্ষতি ও অকল্যাণের সম্ভাবনা থাকিলেও মানুষ বাহিরের একটা প্রভুশক্তির হাতে তাহার সমস্ত ঐহিক ব্যাপার পরিচালনার ভার দিয়া থাকিতে পারে। একজন দার্শনিককে সংবাদ দেওয়া হইল যে, তাঁহার ঘরে আগুন লাগিয়াছে; তিনি বলিলেন, "যাও, আমার স্ত্রীকে সংবাদ দাও; আমি গৃহস্থালীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না।" এই দার্শনিকের মনের ভাব আমাদের বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু এই বৈরাগ্যের ভাব যদি বিবেক পর্য্যন্ত গড়ায়, মানুষের চিন্তা ও অন্তর্ব্যাপারেও যদি ইহা প্রসার লাভ করে, মানুষ যদি এক্ষেত্রেও আত্ম-শাসনের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া বাহ্যশক্তির নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসে, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, ইহা নৈতিক আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এ দাসত্ব শারীরিক দাসত্ব বা ভূমিসম্পর্কীয় দাসত্ব অপেক্ষা শতগুণ হেয়। অথচ খৃষ্টীয় চর্চ্চের মধ্যে যাজক-উপাসক সম্পর্ক ক্রমশঃ এই দুর্নীতি দ্বারাই আক্রান্ত হইয়া পড়িল। অবশ্য এই দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। আপনারা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছেন যে, চর্চ্চের গণ্ডীর মধ্যেই যাজকদিগের নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। চর্চ্চের বাহিরে সাধারণ লোক-সমাজের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। যাজকবৃন্দের মধ্যে অন্ততঃ বিচারবিতর্ক আলোচনা ছিল, ব্যক্তিগত শক্তিসামর্থ্য প্রকাশের একটা ক্ষেত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতা ছিল না বটে, কিন্তু বিচার-

বিতর্কের উত্তেজনাই কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনতার স্থান পূরণ করিত। কিন্তু যাজকবৃন্দের সম্পর্কে সাধারণ লোকসমাজের এরূপ কোন স্বাধীনতা ছিল না। সাধারণ লোক চর্চ্চের শাসনকার্য্যে কেবল দর্শকভাবেই যোগদান করিত। এইরূপে অতি প্রাচীন কালেই এই ধারণাটি অঙ্কুরিত ও ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে, ধর্ম্মমত, ধর্ম্মসমস্যা ও ধর্ম্মসম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারই যাজকসম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত; ধর্ম্মালোচনায় শুধু চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার নহে, যোগদান করিবার অধিকারও যাজকবর্গ ভিন্ন আর কাহারও নাই! সাধারণ লোকের এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রকার অধিকার নাই। আমাদের আলোচ্য যুগের প্রারম্ভেই দেখা যায় যে, তৎপূর্ব্বেই এই ধারণাটী সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; ইহার পরাভব ঘটাইতে, অর্থাৎ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিজ্ঞানকে লোকসাধারণের বিচারক্ষেত্রে নামাইয়া আনিতে বহু শতাব্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল, বহু ভীষণ বিপ্লবের আবশ্যক হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা গেল, তত্ত্বের দিক্ দিয়াও বটে, তথ্য হিসাবেও বটে, যাজকসম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে এই পার্থক্যের প্রাচীর দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই সম্পূর্ণরূপে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া আপনারা এ কথা মনে করিবেন না যে, এই শেষোক্ত সময়েও ধর্ম্মশাসন ব্যাপারে খৃষ্টীয় জনমণ্ডলীর কোনই প্রভাব ছিল না। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অবশ্য তাহাদের আইন-গত কোন অধিকার ছিল না, কিন্তু তাহাদের প্রভাব কিছু না কিছু ছিলই। শাসনতন্ত্র যেমনই হউক না কেন, লোকসাধারণের এই প্রভাব কিছুতেই একেবারে লুপ্ত হইতে পারে না, বিশেষতঃ যেখানে শাসনতন্ত্র শাসক ও শাসিতের সাধারণ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানেই উভয় পক্ষের মত ও বিশ্বাসের এই সমতা গড়িয়া উঠিয়াছে, অথবা যেখানে শাসনতন্ত্রের

ও প্রজাবর্গের মধ্যে একইরূপ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, সেখানেই শাসনব্যাপারে প্রজাবর্গের প্রভাব থাকা অবশ্যম্ভাবী; শাসনব্যবস্থার কোন দুর্নীতিই এ প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে পারে না। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য রাজনীতিক্ষেত্র হইতে একটা নিকট দৃষ্টান্ত লইব। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে চতুর্দ্দশ লুই ও পঞ্চদশ লুইর রাজত্বকালে শাসনব্যাপারে প্রজাসাধারণের আইনগত বা প্রতিষ্ঠানগত অধিকার যত অল্প ছিল, ফ্রান্সের ইতিহাসে আর কোন যুগেই তত অল্প ছিল না।

সকলেই জানেন যে, এই সময়ে শাসনব্যাপারে দেশের প্রজাবৃন্দের অধিকার খাটাইবার আইনানুমোদিত সরকারী ব্যবস্থাগুলি প্রায় সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছিল। তথাপি ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, দেশের প্রজাবৃন্দ অন্যান্য যুগ অপেক্ষা এই যুগেই শাসনতন্ত্রের উপর বেশী করিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এমন কি, যে সমস্ত যুগে সাধারণ প্রজাসঙ্ঘকে ঘন ঘন আহ্বান করা হইত, যখন পার্লিয়ামেণ্ট্ রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকিত, যখন শাসনশক্তি পরিচালনায় জনসাধারণের বৈধ অধিকার আরও অনেক বেশী ছিল, সে সমস্ত যুগ অপেক্ষাও এই যুগে প্রজাদিগের যথার্থ প্রভাব অধিক ছিল।

ইহার কারণ এই যে, এমন একটা শক্তি আছে, যাহা আইন দিয়া ঘিরিয়া রাখা যায় না, যাহা আবশ্যক হইলে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না। সে শক্তি চিত্ত-শক্তি, সাধারণ মনের ও সাধারণ মতের শক্তি। ফ্রান্সের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সাধারণ মত অন্যান্য যুগ অপেক্ষা অনেক বেশী প্রবল ছিল। যদিও এমন কোন উপায় ছিল না, যাহা দ্বারা এই সাধারণ মত আইনের জোরে শাসনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত, তথাপি ইহা রাজা-প্রজা-সাধারণ যে চিন্তার সাম্রাজ্য

তাহারই বলে গৌণভাবে কাজ করিত। শাসকবৃন্দ বেশ বুঝিতেন যে, শাসিতবর্গের মত একেবারে উপেক্ষা করা অসম্ভব। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে খৃষ্টীয় চর্চ্চের মধ্যে এইরূপ ব্যাপারই দাঁড়াইয়াছিল। যদিও খৃষ্টীয় জনবর্গ আইনগত অধিকারে দরিদ্র ছিল, তথাপি ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া তখন সাধারণ লোকসমাজে বেশ একটা আন্দোলন ছিল। এই ব্যাপক আন্দোলনের ফলে যাজক-উপাসকের সংযোগ ঘটিয়াছিল। এবং এই উপায়েই সাধারণ লোক যাজকবৃন্দের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ইতিহাস চর্চ্চাকালে সর্ব্বত্রই মনে রাখিতে হইবে যে, এই গৌণ প্রভাবগুলি অবহেলনীয় নহে; পরন্তু ইহাদের মূল্য ও কার্য্যকারিতা, এবং অনেক স্থলে ইহাদের উপকারিতা, সাধারণতঃ যাহা মনে করা যায়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। মানুষ অবশ্য স্বভাবতঃই প্রত্যক্ষ-ভাবে ও ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করিতে চায়, সে শীঘ্র শীঘ্র স্বীয় কার্য্যের সুফল ভোগ করিতে চায়, সে কৃতকার্য্যতার দরুন আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে চায়, কর্ম্মার্জ্জিত শক্তি সম্ভোগ করিতে চায়, বিজয়গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে চায়! ইহা কিন্তু সব সময়ে সম্ভব হয় না, সব সময়ে সুফলপ্রদও হয় না। এমন অনেক সময় ও অবস্থা আসে, যখন কেবলমাত্র গৌণ ও অপ্রত্যক্ষ উপায়ে কাজ করাই বাঞ্ছনীয় ও সম্ভবপর। আমি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে আর একটি দৃষ্টান্ত লইব। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট একাধিকবার (বিশেষতঃ ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে) প্রধান প্রধান রাজমন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিনির্ব্বাচনের অধিকার দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, রাজ্যশাসন ব্যাপারে এইরূপ মুখ্য অধিকার থাকিলে প্রজাবর্গের স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে সুরক্ষিত থাকিবে। পার্লামেণ্ট কখনও কখনও এ অধিকার কাজেও খাটাইয়াছেন, কিন্তু কখনই ইহার

ফল ভাল হয় নাই, কোন সময়েই নির্ব্বাচন সুসিদ্ধ হয় নাই, রাজ্য সুশাসিত হয় নাই। কিন্তু এখন ইংলণ্ডের অবস্থা কিরূপ? এখন কি পার্লামেণ্টের প্রভাবেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয় না? প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় না? নিশ্চয়ই হয়; কিন্তু এ প্রভাব বিশেষ কোন আইনের প্রভাব নহে; এ প্রভাব একটা অনির্দ্দিষ্ট অপ্রত্যক্ষ প্রভাব। ইংলণ্ড দীর্ঘকাল ধরিয়া যে উদ্দেশ্য অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ভিন্ন উপায়ে; প্রথমে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাতে সুফল ফলে নাই।

ইহার একটা কারণ আছে, এবং সেই কারণ সম্বন্ধে এই স্থলে একটা কথা বলিব। আইনগত মুখ্য অধিকার যাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহাদের অনেকখানি বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। তাহারা যখন যাহা সঙ্কল্প করে, তখনই অবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, সুতরাং এটা নিশ্চয় থাকা আবশ্যক যে, তাহারা সঙ্কল্পগঠনকালে কোন ভুল করিবে না। অনির্দ্দিষ্ট গৌণ প্রভাব কিন্তু অন্য ভাবে কাজ করে; তাহাকে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হয়, অনেক পরীক্ষা দ্বারা মার্জ্জিত হইয়া, তবে সে কাজ করিবার অবকাশ পায়; শক্তিশালী হইবার পূর্ব্বে তাহাকে বিচার-বিতর্কের বাধাবিরোধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়; তাহারা ধীরে ধীরেই জয়লাভ করে, এবং তাহাও সমগ্রভাবে নহে। এই জন্য, যখন সাধারণ লোকের মন এমনভাবে গঠিত হয় নাই যে, তাহাদের হাতে মুখ্য অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ, তখন সাধারণ লোক-মতের যে গৌণ প্রভাব, তাহা যথেষ্ট না হইলেও শ্রেয়স্কর। এইরূপেই খৃষ্টীয় জনমণ্ডলী তাহাদের ধর্ম্মশাসনব্যাপারে কথঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশ্য এ প্রভাবের কার্য্যকারিতা অত্যন্ত

অপর্য্যাপ্ত ছিল, ইহার ক্ষেত্রও অতিশয় সঙ্কীর্ণ ছিল, কিন্তু তথাপি ইহাকে চর্চ্চ একেবারে উপেক্ষা করিতে পারে নাই, চর্চ্চ যে এ প্রভাবের দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও শাসিত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চর্চ্চ ও জনবর্গের মধ্যে সন্নিকর্ষসাধনের পক্ষে আর একটি কারণ ছিল। সমাজের উচ্চনীচ সর্ব্ববিধ স্তরের মধ্যে খৃষ্টীয় যাজকবর্গের বিন্যাস—ইহাই সেই দ্বিতীয় কারণ। প্রায় সর্ব্বত্রই, যেখানেই উপাসকসমাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে যাজকসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, সেইখানেই প্রায় সমাবস্থ লোক লইয়াই যাজকসমাজ গঠিত হইয়াছে; তাঁহাদের মধ্যে যে সামাজিক বৈষম্য একেবারেই ছিল না, তাহা নহে; তবে মোটের উপর ধর্ম্মশাসনের অধিকার একাশ্রমবর্ত্তী যাজকসঙ্ঘের হাতেই ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহারা মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে তাঁহাদের শাসনভুক্ত লোকমণ্ডলীকে শাসন করিয়া আসিয়াছেন। খৃষ্টীয় চর্চ্চের গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর দুর্গপাদমূলে যে দাসবর্গের কুটীর, সেখান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই একজন করিয়া যাজক থাকিতেন। মানবসমাজের সকল প্রকার অবস্থার সহিতই যাজকবর্গের সংযোগ ছিল। খৃষ্টীয় যাজকবর্গের অবস্থানের এই যে বৈষম্য, সকল প্রকার অবস্থার লোকের সহিত তাঁহাদের এই সংযোগ, সাধারণ লোকসমাজের সহিত যাজকবর্গের মিলনসাধনপক্ষে ইহা একটা প্রধান যোগসূত্র। শাসনশক্তিসম্পন্ন অনেক চর্চ্চের মধ্যেই এই সূত্রের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া আপনারা দেখিয়াছেন যে, বিশপ প্রভৃতি খৃষ্টীয় চর্চ্চের নেতৃগণ ভূম্যধিকারসূত্রে ফিউড্যাল্ শাসনতন্ত্রেও স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তাঁহারা এককালেই ঐহিক ও পারত্রিক শাসনশৃঙ্খলার অঙ্গীভূত ছিলেন। এই কারণে এই দুই সমাজের মধ্যে একই প্রকার রীতিনীতি আচারপদ্ধতির প্রাদুর্ভাব

ঘটিয়াছিল। বিশপ্‌গণ যুদ্ধে গিয়াছেন, যাজকগণ সাধারণ বৈষয়িক লোকের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এ লইয়া অনেক অভিযোগ শুনা গিয়াছে, এবং এ সকল অভিযোগের যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণও আছে। বাস্তবিক পক্ষে, এটা একটা ঘোর অনাচার, কিন্তু অন্যান্য সমাজে যে যাজকবর্গ মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সাধারণ সমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করিতেন, তাহা অপেক্ষা এ অনাচারও ভাল। যে যাজকসমাজ সাধারণ লোকসমাজের জীবনযাত্রা রীতি নীতি সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ থাকিতেন, তাহা অপেক্ষা বৈষয়িক বিবাদবিসম্বাদে লিপ্ত এই সকল খৃষ্টীয় বিশপ্‌দ্বারা সমাজের কাজ বেশী হইত। এই যোগসূত্র ধরিয়া যাজকসমাজ ও লোকসমাজের মধ্যে যে অবস্থাসাদৃশ্য ও নিয়তিসাদৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা শাসকশাসিতের মূলগত ব্যবধান একেবারে লুপ্ত না করুক, অন্ততঃ হ্রাস করিয়াছিল।

যাহা হউক, এই ব্যবধানের অস্তিত্ব একবার স্বীকার করিয়া লইয়া এবং এই ব্যবধানের দৌড় কতটুকু ছিল, তাহাও বিচার করিয়া লইয়া দেখা যাউক, খৃষ্টীয় চর্চ্চের শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহার শাসনাধীন জনবর্গের উপর সে কি ভাবে কাজ করিয়াছে। একদিকে দেখিতে হইবে, ব্যক্তিমানবের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে সে কিরূপে সহায়তা করিয়াছে, অন্য দিকে দেখিতে হইবে, কিরূপে সে সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছে।

আমার মনে হয়, আমাদের আলোচ্য যুগের চর্চ্চ ব্যক্তিমানবের পুষ্টি ও উন্নতি লইয়া বড় একটা মাথা ঘামায় নাই। সমাজের মধ্যে যাহারা পরাক্রমশালী, তাহাদের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে কোমলতর ভাব জাগাইয়া তুলিতে এবং দুর্ব্বল ব্যক্তির সম্পর্কে ন্যায়পরতার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে

চর্চ্চ চেষ্টা করিয়াছিল; এবং যাহারা দুর্ব্বল, তাহাদের মধ্যে একটা নৈতিক জীবন জাগাইয়া রাখা এবং তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা ও সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে কতকগুলি মহত্তর ভাব ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া রাখা—এ বিষয়েও চর্চ্চ সচেষ্ট ছিল। তথাপি আমি মনে করি না যে, মানবব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিস্ফুরণকল্পে, মানবের ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিকাশ ও বিস্তারকল্পে চর্চ্চ এ সময়ে বড় বেশী একটা কিছু করিয়াছিল। অন্ততঃ সাধারণ লোকসমাজের মধ্যে করে নাই। এ দিক্ দিয়া চর্চ্চ যাহা করিয়াছিল, তাহা যাজকসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যাজকদিগের শিক্ষা, যাজকবর্গের মানসিক উন্নতি, এ বিষয়ে চর্চ্চ বেশ সচেষ্ট ছিল; তাহাদের জন্য বিদ্যালয় প্রভৃতি যে কোন প্রতিষ্ঠান সমাজের তদানীন্তন শোচনীয় অবস্থার পক্ষে সম্ভব ছিল, চর্চ্চ সমস্তই জোগাইয়াছিল। কিন্তু সে বিদ্যালয়গুলি সমস্তই ধর্ম্মশিক্ষার বিদ্যালয়, যাজকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাহারা গঠিত। ইহা ছাড়া চিন্তা ও রীতিনীতির উন্নতিকল্পে চর্চ্চ যাহা করিয়াছিল, তাহা কেবল গৌণভাবে এবং বিলম্বিত উপায়ে। অবশ্য সমাজের সম্মুখে চর্চ্চ যাজকবৃত্তিরূপ যে একটা নূতন কর্ম্মপথ খুলিয়া দিয়াছিল, তাহাতে লোকসাধারণের মনের মধ্যে একটা উদ্যম ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু এ সময়ে সাধারণ লোকের মানসিক উন্নতির জন্য চর্চ্চ আর কিছুই করে নাই।

ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের উন্নতির দিকে চর্চ্চ অধিক পরিমাণে ও অধিকতর সফলতার সহিত কাজ করিয়াছিল। সমাজের মধ্যে দাসত্বপ্রথার ন্যায় যে সমস্ত বড় বড় পাপ ছিল, তাহার বিরুদ্ধে চর্চ্চ যে দৃঢ়সংকল্পের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। এ কথা প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, আধুনিক জাতিগণের মধ্যে দাসত্বপ্রথার বিলোপ কেবল

খৃষ্টপন্থীদিগের দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে। আমার মনে হয়, ইহা অতিশয়োক্তি মাত্র। দাসত্বপ্রথা বহুকাল ধরিয়া খৃষ্টপন্থী সমাজের অন্তঃস্থলেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, সমাজ তাহাতে বিশেষ কোন বিস্ময় বা বিরক্তি প্রকাশ করে নাই। এই নিকৃষ্ট পাপাচারের বিলোপসাধনে বহু বিভিন্ন কারণের সংযোগ আবশ্যক হইয়াছিল, সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গের, অন্যান্য নীতির বহুল বিকাশ আবশ্যক হইয়াছিল। তথাপি ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই প্রথাকে দমন করিবার জন্য চর্চ্চ স্বীয় শক্তি ও প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছিল। ইহার একটা অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেখাইতে পারি। বিভিন্ন যুগের দাসবর্গকে যে সকল মুক্তিপত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলিতেই ধর্ম্মনীতির দোহাই দেখা যায়। প্রায় সব সময়েই ধর্ম্মের নামে, পরকালের নামে, ধর্ম্মের চক্ষে মানুষে মানুষে যে কোন বৈষম্য নাই—এই নীতির দোহাই দিয়া দাসগণের মুক্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। এ ছাড়া অনেক বর্ব্বরপ্রথা দমন করিবার জন্য এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধির উন্নতিকল্পেও চর্চ্চ সমান উদ্যমের সহিত চেষ্টা করিয়াছে। আপনারা জানেন, তখনকার সেই আইন কি ভয়ানক, কি অদ্ভুত ছিল ; আপনারা ইহাও জানেন যে, বিচারক্ষেত্রে কেবল বাহুযুদ্ধ বা দুই একটি লোকের শপথবাক্যই সত্যনির্দ্ধারণের পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইত। চর্চ্চ এই সকল বিচারপ্রণালীর পরিবর্ত্তে যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত প্রণালী প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিল। প্রধানতঃ, টোলেডো হইতে প্রচারিত বিসীগথ্‌দিগের আইন এবং অন্যান্য বর্ব্বর আইনের মধ্যে যে একটা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, তাহার কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই আইনগুলি তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আইন ও ন্যায়বিচার সম্বন্ধে এবং সত্যানুসন্ধানসম্পর্কিত সকল বিষয়েই চর্চ্চের ধারণা কত শ্রেষ্ঠ

ছিল। অবশ্য এই সকল ধারণার মধ্যে অনেকগুলি রোমীয় আইন হইতে ধার করা হইয়াছিল; কিন্তু চর্চ্চ যদি সেগুলিকে রক্ষা ও সমর্থন না করিত, তাহাদের বহুলপ্রচারের জন্য চেষ্টা না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেগুলি লোপ পাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিচারপ্রণালীতে শপথপ্রয়োগের ব্যবস্থা দেখুন; বিসীগথ্‌দিগের আইন খুলুন; দেখিবেন, কি বিচক্ষণতার সহিত এই শপথগ্রহণ-প্রথার ব্যবহার করা হইয়াছে :—

"বিচারক বিবাদের বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য প্রথমে সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন করিবেন, পরে আরও নিশ্চয়তার সহিত সত্যনির্দ্ধারণ-কল্পে এবং যাহাতে বৃথা কাহাকেও শপথ গ্রহণ করান না হয়, সেই উদ্দেশ্যে লিখিত দলিলপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। সত্যনির্দ্ধারণের পক্ষে উভয় পক্ষের দলিল ভাল করিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক, এবং শপথ গ্রহণের প্রয়োজন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আসা আবশ্যক। বিচারক যখন দলিল বা অন্য কোন নিশ্চয় প্রমাণ না পাইবেন, তখনই কেবল শপথ গ্রহণ করাইবেন।"

ফৌজদারী ব্যাপারে অপরাধ হিসাবে দণ্ডের পরিমাণ ও প্রকৃতি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে ও ধর্ম্মনীতি অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সকল আইন পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যেন একজন মার্জ্জিতবুদ্ধি জ্ঞানী বিধিপ্রণেতা বর্ব্বর-রীতিনীতির নৃশংসতা ও অবিবেচনার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া যাইতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহাদের নরহত্যা সম্বন্ধীয় আইন দেখুন। অন্যান্য বর্ব্বরজাতির আইনের মধ্যে ক্ষতির মাত্রাদ্বারাই অপরাধের পরিমাপ হয়। আর্থিক ক্ষতিপূরণই অপরাধের দণ্ড। বিসীগথ্‌দের আইনে কিন্তু অপরাধের যে যথার্থ নৈতিক মূল অর্থাৎ উদ্দেশ্য, তাহা লইয়াই অপরাধের মাত্রা বিচার করা

হইয়াছে। পাপের যে সমস্ত সূক্ষ্ম ক্রম আছে, যথা—একেবারে অনভিপ্রেত নরহত্যা, অসাবধানতাজনিত আকস্মিক নরহত্যা, উত্তেজনার বশে নরহত্যা, পূর্ব্ব হইতে অভিসন্ধি করিয়া নরহত্যা, পূর্ব্বাভিসন্ধি ব্যতিরেকে নরহত্যা—নরহত্যার এই সমস্ত ক্রম প্রায় বর্ত্তমান কালের আইনের মতই বিশুদ্ধ, যথাযথভাবে সুনির্দ্দিষ্ট ও সুবিভক্ত হইয়াছে, এবং অপরাধের গুরুত্বানুপাতে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। আইনের চক্ষে বিভিন্ন লোকের মূল্য বিচারে যে বৈষম্য অনেক বর্ব্বরজাতির আইনের মধ্যে পাওয়া যায়, বিসীগথ্ আইনে সে বৈষম্য বিলোপ করিতে না পারুক, হ্রাস করিবাব একটা চেষ্টা আছে। কেবল একটা বৈষম্য বজায় রাখা হইয়াছে, সেটা দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে বৈষম্য। স্বাধীন সমাজের মধ্যে কিন্তু নিহত ব্যক্তির বংশ বা পদমর্য্যাদা হিসাবে দণ্ডের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, কেবল হত্যাকারীর নৈতিক অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হয়। দাসদিগের জীবন মরণের উপর তত্তৎপ্রভুর যে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, বিসীগথ্ আইন তাহা কাড়িয়া লইতে সাহস করে নাই, কিন্তু ইহাকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ প্রণালী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আইনের কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য :—

"যে কোন অপরাধী বা তাহার সহযোগীকে বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত নহে—এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যাহারা কেবল-মাত্র জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া হেলায় নরহত্যা করে, তাহাদিগকে দণ্ডিত করা কত বেশী কর্ত্তব্য! অতএব প্রভুগণ যে অনেক সময়ে বিনা অপরাধে কেবলমাত্র দর্প চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদের দাসদিগের প্রাণহরণ করিয়া থাকে, এই যথেচ্ছাচার একেবারে সমূলে উৎপাটিত করাই ন্যায়সঙ্গত, এবং তজ্জন্য আমরা বিধান করিতেছি যে, এই আইন

চিরকাল ধরিয়া সকলে মানিয়া চলিবেন। কোন প্রভু প্রকাশ্য বিচার ব্যতিরেকে কোন দাসদাসী বা কোন অধীনস্থ ব্যক্তির প্রাণনাশ করিতে পারিবে না। যদি কোন ক্রীতদাস বা ভৃত্য এমন কোন অপরাধ করিয়া থাকে, যাহার শাস্তি প্রাণদণ্ড, তাহা হইলে তাহার প্রভু বা অভিযোক্তা অবিলম্বে স্থানীয় বিচারক বা কাউণ্ট বা ডিউকের নিকট সংবাদ দিবে। তদন্তের পর যদি অপরাধ সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে অপরাধী বিচারকের হাত দিয়াই হউক বা তাহার নিজের প্রভুর হাত দিয়াই হউক, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু বিচারক যদি নিজে প্রাণদণ্ড দিতে স্বীকার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; এবং তারপর তাহার প্রাণহরণ করা হইবে, কি না হইবে, সে বিষয়ে তাহার প্রভুর সম্পূর্ণ অধিকার। এদিকে আবার ক্রীতদাস যদি দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া প্রভুকে অস্ত্রদ্বারা বা লোষ্ট্রদ্বারা আঘাত করে বা আঘাত করিতে চেষ্টা করে, এবং প্রভু যদি আত্মরক্ষা করিতে গিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে হত্যা করে, তাহা হইলে প্রভু নরহত্যার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে না। কিন্তু ইহা প্রমাণ করা চাই যে, বাস্তবিকই এইরূপ ঘটিয়াছিল; এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্য দাসদাসীর এবং হত্যাকারীর নিজের শপথবাক্যের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হওয়া চাই। যে কেহ শুদ্ধমাত্র বিদ্বেষবশবর্ত্তী হইয়া স্বহস্তে বা পরহস্তদ্বারা বিনা প্রকাশ্য বিচারে তাহার দাসকে হত্যা করিবে, সে দুষ্কৃতকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে, সে কখনও বিচারালয়ে সাক্ষ্য দান করিতে পারিবে না, অবশিষ্ট জীবন তাহাকে নির্ব্বাসন বা প্রায়শ্চিত্তে কাটাইতে হইবে, এবং তাহার ধনসম্পত্তি তাহার নিকটতম ন্যায্য উত্তরাধিকারীর হস্তে ন্যস্ত হইবে।"

চর্চ্চের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি ব্যবস্থা আছে, যাহা সচরাচর

তেমন লক্ষ্য করা হয় না। সেটি প্রায়শ্চিত্তপ্রথা। বর্ত্তমান কালে বরং এই প্রথার আলোচনা অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক হওয়া উচিত; কারণ, দণ্ডবিধিক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তপ্রথার যে ভাবে প্রয়োগ হইত, তাহার সহিত আধুনিক চিন্তার অনেকটা মিল আছে। চর্চ্চের দণ্ডবিধি ও প্রকাশ্য প্রায়শ্চিত্তের যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, অপরাধীর মনে অনুতাপের উদ্রেক করা এবং দৃষ্টান্তদ্বারা দর্শকবৃন্দের মনে নৈতিক ভীতির সঞ্চার করিয়া দেওয়াই প্রধান লক্ষ্য। ইহার সঙ্গে আর একটা উদ্দেশ্য মিশ্রিত ছিল—অপরাধীর পাপক্ষালন। দণ্ডবিধিমাত্রেই অনুতাপ উদ্রেক ও ভীতি-সঞ্চার ছাড়া এই পাপক্ষালনের ধারণা অনুস্যূত আছে কি না, এই দুইটি তত্ত্বের পৃথক্‌করণ সম্ভব কি না—সাধারণভাবে এ প্রশ্নের উত্তর কি হইবে, জানি না। কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা স্থগিত রাখিয়া এটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায় যে, চর্চ্চ তাহার প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থার মধ্যে দুইটি লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াছে—অপরাধীর পক্ষে অনুতাপ, অন্যের পক্ষে দৃষ্টান্ত। যথার্থ বৈজ্ঞানিক দণ্ডবিধিরও কি ইহাই লক্ষণ নহে? বর্ত্তমান ও বিগত শতাব্দীর প্রধান প্রধান বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা ইউরোপীয় দণ্ডবিধির সংস্কার প্রস্তাব করিতে গিয়া এই দুইটি নীতিরই কি দোহাই দেন নাই? তাঁহাদের গ্রন্থ খুলিয়া দেখুন, যথা বেন্থামের গ্রন্থ দেখুন,—তাহার মধ্যে যে সকল দণ্ডপ্রণালী প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহার সহিত চর্চ্চের দণ্ডপ্রণালীর সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই চর্চ্চ হইতে সেগুলি ধার করিয়া লন নাই, চর্চ্চও কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই যে, ভবিষ্য কালের একজন নিষ্ঠাভক্তিহীন জড়বাদী দার্শনিকের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সমর্থনের জন্য চর্চ্চের দৃষ্টান্ত টানিয়া আনা হইবে।

সর্ব্বশেষে সমাজের উন্নতি সম্পর্কে চর্চ্চের আর একটি চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। সমাজের মধ্যে পশুবলের অবাধ লীলা এবং যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি দমন করিবার জন্য চর্চ্চ সর্ব্ববিধ উপায়ে চেষ্টা করিয়াছে। "দৈবরাজ্যের শান্তি" এবং ঐরূপ যে সকল ব্যবস্থা দ্বারা চর্চ্চ বাহুবল প্রয়োগের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল এবং সমাজের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ও নম্রতা আনিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার কথা সকলেই জানেন। এ তথ্য এত সুপরিচিত যে, এ বিষয়ে বিস্তার করিয়া বলিবার কোন আবশ্যক নাই। চর্চ্চের সহিত লোকসমাজের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রধান কথাগুলি এখন বলা হইল। যে তিন দিক্ দিয়া চর্চ্চের বিচার করিব বলিয়াছিলাম, তাহা করা হইল; এবং চর্চ্চের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি ও বাহ্য গঠন, দুই বিষয়েই কিছু জ্ঞানলাভ করা গেল। এখন বাকী রহিল, অনুমান ও যুক্তি সাহায্যে বিচার করা যে, ইউরোপীয় সভ্যতার উপর চর্চ্চের সাধারণ প্রভাব কিরূপ ও কতখানি। আমার মনে হয়, এ কাজটাও প্রায় সম্পন্ন করা হইয়াছে; কারণ, চর্চ্চের প্রধান প্রধান নীতি ও ব্যবস্থার উল্লেখ করিবামাত্র চর্চ্চের প্রভাব সম্বন্ধেও একটা ধারণা জন্মিয়া যায়। আপনারা কারণাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যফলেরও আভাস পাইয়াছেন। তথাপি যদি সংক্ষেপে এই সকল কার্য্যফলের পুনরুল্লেখ করিতে হয়, তাহা হইলে দুইটি সাধারণ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যায়।

প্রথমটি এই যে, আধুনিক ইউরোপের চিন্তারাজ্যে ও নীতিরাজ্যে, সামাজিক ভাব, সামাজিক চিন্তা ও সামাজিক রীতিনীতি-ক্ষেত্রে চর্চ্চ প্রভূত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এ ত প্রত্যক্ষ ব্যাপার; ইউরোপের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ আসলে ধর্ম্মতত্ত্বের দিক্ দিয়াই ঘটিয়াছে। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী

পর্য্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করুন; দেখিবেন, ধর্ম্মতত্ত্বই তখন মানুষের মনকে অধিকার করিয়া আছে ও পরিচালন করিতেছে; সমস্ত মতবাদেই ধর্ম্মতত্ত্বের ছাপ; দার্শনিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রশ্ন—সমস্তই ধর্ম্মতত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার হইতেছে। চিন্তারাজ্যে চর্চ্চের এমন অখণ্ড প্রতাপ যে, গণিতবিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানকেও চর্চ্চের ধর্ম্মমতের অধীন করিয়া রাখা হইয়াছে। বেকন ও দেকার্ত্তের সময় পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সমাজের শিরায় শিরায় ধর্ম্মতত্ত্বের রক্তই প্রবাহিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে বেকন ও ফ্রান্সে দেকাৎ (Descartes) মানববুদ্ধিকে ধর্ম্মতত্ত্বের গণ্ডীর বাহিরে আনিয়াছিলেন।

সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই একই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়; পদে পদে ধর্ম্মতত্ত্বসুলভ সংস্কার, ভাব ও ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়।

মোটের উপর এই প্রভাব কল্যাণপ্রদই হইয়াছে। ইহা যে শুধু ইউরোপের চিন্তাজগতে সজীবতা ও উর্ব্বরতা দান করিয়াছে, তাহা নহে, যে সকল মতবাদ ও উপদেশ লইয়া সে দাঁড়াইল, তাহা প্রাচীন জগতের শিক্ষা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইউরোপের চিন্তা শুধু যে গতিবেগ লাভ করিল, তাহা নহে; সে গতি উন্নতির দিকে প্রধাবিত হইল।

তাহা ছাড়া চর্চ্চের অবস্থানবৈশিষ্ট্যের গুণে আধুনিক জগতে মানবচিত্তের বিকাশ এমন একটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য লাভ করিল, যাহা পূর্ব্বে তাহার ছিল না। প্রাচ্যদেশে মানবচিত্ত কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ছাঁচে গঠিত ছিল; গ্রীকসমাজে তেমনি কেবলমাত্র মানবিকতারই আধিপত্য। প্রাচ্যচিন্তায় মানুষের বাস্তব প্রকৃতি ও বাস্তব নিয়তির কথা একেবারে লুপ্তপ্রায়; গ্রীকচিন্তায় তেমনি কেবলমাত্র প্রাকৃত

মানব, মানুষের বাস্তব প্রবৃত্তি, বাস্তব ভাব, বাস্তব স্বার্থই সমগ্র রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়া আছে। আধুনিক জগতের চিন্তায় ধর্ম্মভাব সমস্ত ব্যাপারের সহিতই জড়িত হইয়া আছে, কিন্তু মানব-জীবনের কোন ব্যাপারকেই একেবারে বাদ দেয় নাই। আধুনিক মানবিকতার মধ্যে মানবিকতার ছাপ আছে, দেবত্বেরও ছাপ আছে। আধুনিক সাহিত্যে মানুষের প্রাকৃত মনোভাব ও প্রাকৃত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে; তথাপি এদিকে আবার মানুষের ধর্ম্ম-প্রকৃতি, মানুষ যে অংশে অন্য একটা নিত্যলোকের সহিত সম্পৃক্ত, তাহারও সন্ধান প্রতি পদে পাওয়া যায়। এইরূপে মানুষের বিকাশ ও উন্নতির যে দুইটি প্রধান মূল প্রস্রবণ মানবিকতা ও ধর্ম্ম, এই দুইটিই একসঙ্গে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়াছে; এবং চর্চ্চের সহিত যত দুর্নীতি দুরাচারই জড়িত থাকুক না কেন, চিন্তাজগতে বার বার সে যতই অত্যাচার উৎপীড়নে লিপ্ত থাকুক না কেন, সে সমস্ত সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, চর্চ্চের প্রভাবে ইউরোপের চিন্তাস্রোত বরং পুষ্টিই লাভ করিয়াছে, নিষ্পিষ্ট হয় নাই,—ব্যাপ্তিই লাভ করিয়াছে, আবদ্ধ হয় নাই।

রাজনৈতিক হিসাবে কিন্তু চর্চ্চের প্রভাব অন্যরূপ। ইহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই যে, লোকসমাজের মনোভাব ও আচারব্যবহারে কোমলতা ও শিষ্টতা আনিয়া এবং বহু বর্ব্বর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতঃ তাহাদের বিলোপসাধন করিয়া চর্চ্চ সামাজিক অবস্থার উন্নতি-কল্পে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে; কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শাসক শাসিতের পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয় বিষয়ে, রাজক্ষমতা ও জনস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনবিষয়ে, আমি মনে করি না যে, চর্চ্চের প্রভাব মোটের উপর কল্যাণপ্রদ হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে চর্চ্চ সর্ব্বদাই দুইটি বিভিন্ন

শাসনপদ্ধতির ব্যাখ্যাতা ও সমর্থকরূপে দেখা দিয়াছে—একটি যাজকতন্ত্র, অপরটি রোমীয়-সাম্রাজ্য। দুইটিরই মূলনীতি যথেচ্ছ শাসন,—একটি ধর্ম্মের নামে, অপরটি ঐহিক অধিকারের নামে। চর্চ্চের সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, বিধিব্যবস্থা দেখুন; চর্চ্চের আইনকানুন ও কার্য্যপ্রণালী দেখুন; সর্ব্বদাই দেখিবেন, হয় যাজকতন্ত্রনীতি, না হয় সাম্রাজ্যনীতি, মূলে এই দুইএর একটি আছে। চর্চ্চ যখন দুর্ব্বল, তখন সে সম্রাট্‌দিগের অখণ্ড প্রতাপের আশ্রয় লইয়াছে; যখন সে সবল, তখন নিজেই আধ্যাত্মিক অধিকারের দোহাই দিয়া, সেই অখণ্ড শাসনাধিকার দাবী করিয়া বসিয়াছে। আমরা কোন বিশেষ ঘটনা বা দৃষ্টান্তে আবদ্ধ থাকিব না। চর্চ্চ অবশ্য অনেকবার রাজগণের কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সময় প্রজাদিগের ন্যায্য অধিকারের দোহাই দিয়াছে; এবং অনেক সময় প্রজাবিদ্রোহে উত্তেজনা ও সম্মতি প্রদান করিয়াছে; রাজাদিগের মুখের সম্মুখে অনেকবার প্রজাদিগের অধিকার ও স্বার্থ লইয়া তাহাদের পক্ষসমর্থনও করিয়াছে। কিন্তু যখনই প্রজাদিগের স্বাধীন অধিকার সংরক্ষণের জন্য কোন স্থায়ী ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কথা উঠিয়াছে, যাহাতে করিয়া প্রজাদিগের স্বাধীন অধিকারে হস্তক্ষেপ করা রাজশক্তির পক্ষে বাস্তবিকই অসম্ভব হইয়া পড়ে,—তখনই চর্চ্চ সাধারণতঃ যথেচ্ছাচারী রাজশক্তির পক্ষই গ্রহণ করিয়াছে।

ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই, এবং যাজকসমাজের অত্যধিক মাত্রায় মানবদৌর্ব্বল্য আরোপ করার বা এটাকে খৃষ্টীয় চর্চ্চেরই একটা অনন্যসাধারণ দোষ মনে করার কোন প্রয়োজন নাই। ইহার একটা গভীরতর কারণ আছে। ধর্ম্ম কি দাবী করে? ধর্ম্ম বলে, "আমি মানুষের কামনাপ্রবৃত্তি, মানুষের ষড়রিপুকে শাসন করিব, দমন করিব, নিয়ন্ত্রিত করিব।" ধর্ম্মমাত্রই একটা সংযম,

একটা শক্তি, একটা শাসন। ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতিকে দমন করিবার জন্য দৈববিধি, দৈব অধিকার লইয়া অবতীর্ণ হয়। মানুষের স্বাধীনতা লইয়াই তাহাকে নাড়াচাড়া করিতে হয়; মানুষের স্বাধীনতাই তাহাকে বাধা দেয়, এবং এই স্বাধীনতাকেই সে অতিক্রম করিতে চায়। ইহাই ধর্ম্মের কার্য্য, ইহাই তাহার লক্ষ্য ও আশা।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, স্বাধীনতা লইয়াই যদিচ ধর্ম্মের কারবার, যদিচ মানুষের ইচ্ছাপ্রবৃত্তির সংস্কারসাধনই ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা, তথাপি মানুষের সেই ইচ্ছাশক্তির ভিতর দিয়াই তাহাকে স্বীয় প্রভাব খাটাইতে হয়, ইহা ভিন্ন অন্য কোন নীতিসঙ্গত উপায় তাহার হাতে নাই। ধর্ম্ম যখন মানুষের স্বাধীন সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া বল-প্রয়োগ, প্রবঞ্চনা বা অন্য কোন বাহ্য উপায় অবলম্বন করে, যখন সে মানুষকে জলবায়ুর ন্যায় জড়শক্তিরূপে গণনা করে, তখন সে নিজের লক্ষ্য হইতেই ভ্রষ্ট হয়, সে তখন মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে শাসন করা দূরে থাকুক, স্পর্শও করিতে পারে না। ধর্ম্ম যদি স্বলক্ষ্য সাধন করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে এমন ভাবে উপস্থিত হইতে হইবে, যাহাতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাই তাহাকে বরণ করিয়া লয়; মানুষ তাহার শাসন মানিয়া লইবে, ইহা আবশ্যক বটে, কিন্তু ইহাও আবশ্যক যে, মানুষ তাহাকে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে বরণ করিয়া লইবে, মানুষ তাহার অধীনতার মধ্যেই স্বাধীনতা বজায় রাখিবে। ধর্ম্মকে এই দ্বৈতসমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

ধর্ম্ম কিন্তু অনেক সময়েই এদিকে দৃক্‌পাত করে নাই; সে মানুষের স্বাধীনতাকে বাধাই মনে করিয়াছে, সহায় মনে করে নাই। মানুষের আত্মা যে একটা জড়শক্তি নহে, সে কথা অনেকবার ভুলিয়াছে। এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই সে মানবস্বাধীনতার বিরুদ্ধে যথেচ্ছাচারী রাজ-

শক্তির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। স্বাধীনতাকে সে শত্রু মনে করিয়া দমন করিতেই চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকে স্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করে নাই। ধর্ম্ম যদি নিজের যথার্থ উপায় উপকরণ ভাল করিয়া কাজে লাগাইত, সে যদি একটা স্বাভাবিক মোহের বশে পথভ্রষ্ট হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত যে, স্বাধীনতাকে নৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে অগ্রে তাহাকে রক্ষা করা আবশ্যক; বুঝিত যে, ধর্ম্ম নৈতিক উপায় ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারে না; ধর্ম্ম তাহা হইলে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে শাসন করিতে গিয়া তাহাকে সম্মান করিতে শিখিত। এ কথা ধর্ম্ম অনেকবার ভুলিয়াছে, এবং পরিণামে স্বাধীনতারও যেরূপ দুর্গতি হইয়াছে, ধর্ম্মেরও সেইরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার উপর চর্চ্চের সাধারণ প্রভাব সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে চাহি না। আমি এই প্রভাবের দুইটী দিক্ দেখাইয়াছি—একদিকে সামাজিক ও নৈতিক জীবনের পক্ষে কল্যাণকর প্রভাব, অন্য দিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অশুভকর প্রভাব। এখন আমাদের যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তগুলি ইতিহাসের তথ্যের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। এখন পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় চর্চ্চের ভাগ্যনিয়তির ক্রম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক, আমরা যে সকল তত্ত্বের যে সকল পরিণাম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ইতিহাসের মধ্যেও সেই সকল পরিণামের সন্ধান পাই কি না।

এ পর্য্যন্ত চর্চ্চের প্রকৃতির যে সমস্ত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি ও তাহাদের যে যে পরিণাম সিদ্ধান্ত করিয়াছি, সেগুলি সমস্তই যে একই সময়ে সমানভাবে প্রকট হইয়াছে, তাহা মনে করিবেন না। বহু শতাব্দীর

অন্তরালে যে কোন প্রাচীন যুগের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে, ইতিহাসে একটা ক্রমবিন্যাস আছে, ইতিহাসের ঘটনাবলী কালক্রমে পরে পরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্রমোয়েল বা গষ্টেবস্ আডল্‌ফাস্ বা কার্ডিনাল রিশলিয় বা যে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনী ধরুন। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হন ও উন্নতিলাভ করেন; তাঁহার প্রভাবে বড় বড় ঘটনা ঘটে, তিনিও আবার ঐ সকল ঘটনাদ্বারা প্রভাবান্বিত হন; শেষে তিনি লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন। তখন আমরা তাঁহাকে জানিতে পাই; কিন্তু তখন আমরা তাঁহাকে সমগ্র সম্পূর্ণভাবে দেখি, বিধাতার কারখানায় গড়াপেটা হইয়া তিনি যেরূপে বাহির হইলেন, আমরা তাঁহার সেই মূর্ত্তিই দেখিতে পাই। কিন্তু যাত্রাপথের আরম্ভে তিনি কিন্তু এমনটি ছিলেন না; তাঁহার জীবনের কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে তিনি কখনই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে দেখা দেন নাই; তিনি ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছেন। মানুষের শরীর যেমন ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিও সেইরূপ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে; সে দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার অন্তরাত্মা অনবরত স্বতঃই রূপান্তরিত হইতে থাকে। ১৬৫০ অব্দের ক্রমোয়েল আর ১৬৪০ অব্দের ক্রমোয়েল নহেন। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের একটা পাকা ভিত থাকে; সর্ব্বদা একই ব্যক্তি অধ্যবসায় করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার ধ্যানধারণা, আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা চেষ্টার কি পরিবর্ত্তন! তিনি কত জিনিষ হারাইয়াছেন, আবার কত জিনিষ নূতন পাইয়াছেন! মনুষ্য-জীবনের যে কোন মুহূর্ত্তেই আমরা দৃষ্টিপাত করি, কাল পূর্ণ হইলে সে জীবন কি আকার ধারণ করিবে, তাহা কখনই দেখিতে পাই না।

এইখানেই কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন;

মানুষ সম্বন্ধে তাঁহারা একটা সম্পূর্ণ ধারণা লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাহার জীবনেতিহাসের সর্ব্বত্রই তাঁহারা সেই সুপরিণত মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে ১৬২৮ অব্দে পার্লামেণ্টে প্রবেশকালেও যে ক্রমোয়েল, ত্রিশ বৎসর পরে হোয়াইট্ হল প্রাসাদে মৃত্যুশয্যায় শয়ান সেই একই ক্রমোয়েল। সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন অপ্রত্যক্ষ ব্যাপক শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহারা অনবরত এই একই ভুল করিয়া থাকেন। আমরা যেন সে ভুল না করিয়া বসি। আমি চর্চ্চের যে সমস্ত লক্ষণ ও পরিণাম নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা চর্চ্চের সমগ্র ইতিহাস ধরিয়া। কিন্তু মনে রাখিবেন যে, এ চিত্র ঐতিহাসিক হিসাবে নির্ভুল নহে; আমি যাহা একত্র অখণ্ডভাবে দেখাইয়াছি, ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাহা খণ্ডিত ও ক্রমবিন্যস্ত, বিভিন্ন দেশকালের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যে এই শৃঙ্খলা, কার্য্যকারণের এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখিতে প্রত্যাশা করিবেন না। দেখিব, এখানে এক লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে, ওখানে অন্য লক্ষণ; সমস্তই অসম্পূর্ণ, অসমান, বিক্ষিপ্ত। চর্চ্চের ইতিহাসের শেষসীমায় অর্থাৎ আধুনিক কাল পর্য্যন্ত আসিয়া না পড়িলে তাহার সমগ্র পরিণাম দেখিতে পাইব না। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চর্চ্চ যে যে অবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়াছে, এখন আমি সেইগুলি আপনাদের নিকট বিবৃত করিব। আমার সমস্ত উক্তির প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া দিতে পারিব না, কিন্তু যাহা দিব, তাহা হইতে এটা বেশ ধারণা হইবে যে, আমার সিদ্ধান্তগুলি অযৌক্তিক নহে।

প্রথম যখন পঞ্চম শতাব্দীতে চর্চ্চ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন সে সাম্রাজ্য-গৌরবে মণ্ডিত; চর্চ্চ তখন রোমীয় সাম্রাজ্যের চর্চ্চ। রোমীয় সাম্রাজ্য যখন পতনোন্মুখ, তখন চর্চ্চ ভাবিতেছিল,

সে তাহার জীবনলীলার চরমসীমায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, তাহার বিজয়যাত্রা সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহা অবশ্য সত্য যে, চর্চ্চ তখন রোমের প্রাচীন ধর্ম্মকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মানুসারে রোমের সম্রাট্‌গণ প্রধান পন্টিফ বা পুরোহিত আখ্যা ধারণ করিতেন। সর্ব্বশেষ যে সম্রাট্ এই পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রাশিয়ান খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অবসানকালে প্রাণত্যাগ করেন। অগষ্টস্ ও টাইবেরিয়াসের ন্যায় গ্রাশিয়ান প্রধান পন্টিফ আখ্যায় অভিহিত হইতেন। খৃষ্টপন্থীদিগের মধ্যে যে সমস্ত বিকৃত পাষণ্ড মত প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সকল পাষণ্ডসম্প্রদায়ের পরাজয়সাধনও তখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট্ থিওডোশিয়স "আরিয়ান" নামক প্রধান পাষণ্ড-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক কঠোর আইন প্রণয়ন করিলেন। চর্চ্চের দুই প্রধান শত্রুপক্ষ তখন চর্চ্চের পদানত ও শাসনাধীন। এমন সময় চর্চ্চ অকস্মাৎ দেখিল, রোমীয় সাম্রাজ্য আর তাহাকে আশ্রয় দিতে অক্ষম, সে নিজেই ধ্বংসমুখে পতিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে গথ, ভ্যাণ্ডাল, বর্গাণ্ডিয়ান, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি নানা বর্ব্বরজাতি, নানা নূতন বিধর্ম্মিসম্প্রদায়, নানা নূতন নূতন পাষণ্ড মত চর্চ্চের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। চর্চ্চ একবারে অতল জলে পড়িয়া গেল। চর্চ্চের মধ্যে রোমসাম্রাজ্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বহুদিন ধরিয়া সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই জন্যই রোমীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ যেটুকু অবশিষ্ট ছিল অর্থাৎ পৌরতন্ত্র ও যথেচ্ছশাসনতন্ত্র—চর্চ্চ তাহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিল। এবং সে যখন বর্ব্বর জাতিগুলিকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল, তখন পুনরায় রোমসাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনকল্পে চেষ্টা করিতে লাগিল। চর্চ্চ বর্ব্বররাজগণকে সম্বোধন করিয়া

সম্রাট্‌পদবী ধারণের জন্য বারবার আহ্বান করিতে লাগিল। সে বলিল —"তোমরা সম্রাট্‌পদবী ধারণ কর, সম্রাট্‌দিগের সমস্ত অধিকার গ্রহণ কর এবং রোমসাম্রাজ্যের সহিত চর্চ্চের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধ পুনরায় স্থাপন কর।" পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে ইহাই ছিল বিশপ্‌দিগের প্রধান কার্য্য। এই গেল চর্চ্চের প্রথম অবস্থা।

এ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বর্ব্বরবৃন্দ লইয়া রোমীয় রাষ্ট্র গঠন করার কোন উপায় ছিল না। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় চর্চ্চও বর্ব্বরতার পঙ্কে ডুবিয়া গেল। ইহাই চর্চ্চের দ্বিতীয় অবস্থা। অষ্টম শতাব্দীতে যাজকতন্ত্রের পক্ষ হইতে যে সমস্ত ইতিবৃত্ত রচিত হইয়াছিল, তাহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ইতিবৃত্তকারদিগের রচনা তুলনা করিলে দেখিবেন, কত বিষম পার্থক্য। রোমীয় সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন, এমন কি, ভাষা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে; সমস্তই যেন বর্ব্বরতার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। একদিকে বর্ব্বরগণ যাজকসমাজে প্রবেশ করিয়া যাজক ও বিশপ্‌ হইতেছে; অন্য দিকে বিশপ্‌গণ বর্ব্বরোচিত জীবনযাত্রা অবলম্বন করিতেছেন; তাঁহারা নিজ নিজ এলাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই দল সংগ্রহ করিয়া লুণ্ঠন করিতেছেন, যুদ্ধাদি করিতেছেন ও দেশের মধ্যে উপদ্রব অশান্তির সৃষ্টি করিতেছেন। তুর(Tours)বাসী গ্রেগরীর গ্রন্থে সালোনস্‌, সাজিটারিয়স্‌ প্রভৃতি কতকগুলি বিশপের উল্লেখ পাইবেন, যাঁহারা এই ভাবেই জীবন যাপন করিতেন।

বর্ব্বর চর্চ্চের মধ্যে দুইটি প্রধান ব্যাপার সংঘটিত হইল। প্রথমটি হইতেছে ঐহিক ও পারত্রিক শাসনশক্তির পার্থক্যসাধন। এই সময়েই এই নীতির উদ্ভব হয় এবং ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। চর্চ্চ যখন রোমীয় সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, তাহার পরাক্রমের অংশীদার হইতে

পারিল না, তখন সে বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য স্বাধীনতালাভ করিতে উৎসুক হইল। তখন তাহার চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে বিপদাশঙ্কা, সেই জন্য চারিদিক্ হইত তাহাকে তখন আত্মরক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক যাজক, প্রত্যেক বিশপ্ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার বর্ব্বর প্রতিবেশীগণ কেবলই চর্চ্চের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছে, কেবলই জোর করিয়া চর্চ্চের ভূমিসম্পদ্ ও ক্ষমতা অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। চর্চ্চের তখন আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় এই কথা বলা যে, "ধর্ম্মজগৎ বৈষয়িক জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তোমাদের নাই।" বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার পক্ষে এই নীতিই ছিল চর্চ্চের প্রধান অস্ত্র।

চর্চ্চের ইতিহাসে এই যুগের দ্বিতীয় প্রধান ব্যাপার হইতেছে প্রতীচ্য ইউরোপের মঠধারী ভিক্ষুসম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও পুষ্টি। ইহা সকলেই জানেন যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভেই সেণ্ট বেনেডিক্ট্ প্রতীচ্য ইউরোপের ভিক্ষুদিগের মধ্যে নিজের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তখন ভিক্ষুসংখ্যা অতি সামান্যই ছিল, যদিও পরবর্ত্তী কালে তাহাদের অত্যন্ত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এই সময়ে ভিক্ষুদিগকে যাজকসমাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হইত না, তাঁহারা তখন সাধারণ লোকের ন্যায়ই পরিগণিত হইতেন। অবশ্য বিশপ্ বা যাজক নিয়োগকালে অনেক সময় ভিক্ষুসমাজের মধ্য হইতেই যোগ্য লোক অনুসন্ধান করিয়া লওয়া হইত, কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর অবসান ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভকালেই সাধারণভাবে সমস্ত ভিক্ষুকেই যাজকসমাজের অন্তর্গত বিবেচনা করা হইতে লাগিল। তখন আমরা দেখিতে পাই, যাজক ও বিশপ্‌গণ ভিক্ষু হইতেছেন ও মনে করিতেছেন যে, এইরূপে তাঁহারা ধর্ম্মজীবনে নূতন করিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়া

গেলেন। এইরূপে ইউরোপে ভিক্ষুসম্প্রদায় অসামান্য বিকাশলাভ করিল। সাধারণ যাজক অপেক্ষা এই সকল ভিক্ষুরাই বর্ব্বরদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনপ্রণালীও যেমন আসাধারণ, তাঁহাদের সংখ্যাও সেইরূপ অপরিসীম। সাধারণ যাজক ও বিশপ্ বর্ব্বরদিগের কল্পনায় কোন বিশেষ ছাপ দিতে পারেন নাই; তাঁহাদের মধ্যে ত কোন নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই; বর্ব্বরগণ ত বরাবরই তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের উপর কত অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া আসিয়াছে, কতবার তাঁহাদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে। এদিকে ভিক্ষুদিগের একটা মঠ আক্রমণ করা তেমন সহজ ব্যাপার নহে; সেখানে কত কত সাধু পুরুষ একত্র দল বাঁধিয়া থাকেন। বর্ব্বরযুগে এই মঠগুলি চর্চ্চের আশ্রয়স্বরূপ ছিল; যেমন চর্চ্চ আবার সাধারণ লোকসমাজের আশ্রয়স্থল ছিল। প্রাচ্যখণ্ডে যেমন কনষ্টাণ্টিনোপলের বিলাসপ্রলোভন ও বৈষয়িক জীবনের গণ্ডগোল হইতে পলায়ন করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ থিবাইডের মরুভূমিতে আশ্রয় লইতেন, প্রতীচ্যখণ্ডে সেইরূপ তাঁহারা এই সকল মঠের মধ্যে আশ্রয় পাইতেন।

বর্ব্বরযুগে চর্চ্চের ইতিহাসে এই দুইটি প্রধান ব্যাপার—একদিকে ধর্ম্মশাসন ও ঐহিক শাসনের স্বাতন্ত্র্যস্থাপন, অপর দিকে প্রতীচ্য ইউরোপে ভিক্ষুসম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বিকাশ।

বর্ব্বরযুগের শেষভাগে শার্লমেন কর্তৃক রোমীয় সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবার দিকে একটা নূতন চেষ্টা হয়। চর্চ্চ ও রাজশক্তির মধ্যে পুনরায় একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। এ সময়ে পোপ-শক্তি সম্রাটের সহিত মিত্রভাবে চলিয়া অনেক পরিমাণে উন্নতি ও পুষ্টিলাভ করিল। এ চেষ্টাও কিন্তু ফলবতী হইল না, শার্লমেনের সাম্রাজ্য

ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু এই সন্ধিসূত্রে চর্চ্চ যে সুবিধা ও শক্তি লাভ করিল, তাহা রহিয়া গেল। পোপ্ শক্তি এখন খৃষ্টপন্থী সমাজের শীর্ষদেশ অধিকার করিয়া বসিল।

শার্লমেনের মৃত্যুর পর অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ঘটিল; সাধারণ সমাজের ন্যায় চর্চ্চও এই আবর্ত্তে নিপতিত হইল, এবং কালক্রমে ফিউড্যাল্ পদ্ধতির আশ্রয় পাইয়া তবে উদ্ধার পাইল। এই হইল চর্চ্চের তৃতীয় অবস্থা। শার্লমেনের সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার ফলে সাধারণ সমাজের ভাগ্যে যাহা ঘটিল, চর্চ্চের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল; সমস্ত একতাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, সমস্ত ব্যাপারই এখন স্থানীয়, খণ্ডিত, ব্যক্তিগত হইয়া পড়িল। তখন যাজকসমাজে, অবস্থাবৈগুণ্যে এমন একটা বিরোধের সূত্রপাত হইল, যাহার তুল্য কিছুই এতদিন দেখা যায় নাই। এক দিকে ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর স্বার্থ ও মনোভাব, অন্য দিকে সাধারণ যাজকের স্বার্থ ও মনোভাব, এই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যাজকতন্ত্রের অধিনেতৃবর্গ এই দুই প্রতিকূল পক্ষের মাঝখানে পড়িলেন, কখনও এক পক্ষ, কখনও অপর পক্ষ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। যাজকসমাজের ঐক্যসূত্র তেমন প্রবল ছিল না; ব্যক্তিগত স্বার্থই এখন প্রবল হইয়া উঠিল; স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা ও ফিউড্যাল্‌সমাজ-সুলভ স্বাতন্ত্র্যমুখী রীতিনীতি অভ্যাসের ফলে যাজকসমাজের শৃঙ্খলা-বন্ধন এখন অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় এই শিথিলতার প্রতিরোধকল্পে চর্চ্চের মধ্যেই একটা চেষ্টার সূত্রপাত হইল। যাজকেরা নানা স্থানে সভাসমিতির সাহায্যে এক একটা জাতীয় চর্চ্চ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। এই সময়ে ভূস্বামিতন্ত্রের আমলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সংসদ্, সঙ্গীতি, প্রাদেশিক ও জাতীয় যাজক-সম্মিলনী দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া ফ্রান্সেই এই একতা-

বন্ধনের চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্যম ও উৎসাহের সহিত চালান হয়। র‍্যাঁ নগরীর আর্চ্চবিশপ্ হিঙ্কমার এই চেষ্টার প্রধান প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ফরাসী চর্চ্চকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার দিকেই তাঁহার প্রধান যত্ন ছিল। বিভিন্ন যাজকসম্প্রদায়ের পরস্পর ভাব-বিনিময়ের যত প্রকার উপায় অনুষ্ঠান ছিল, তাহা তিনি সন্ধান করিয়া বাহির করিতেন ও কাজে লাগাইতেন, যেন এই উপায়ে ফিউড্যাল্ চর্চ্চের মধ্যে একটা একতাবন্ধন ফিরাইয়া আনা যায়। হিঙ্কমার এক দিকে রাজশক্তির সম্পর্কে চর্চ্চের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেন, অন্য দিকে পোপের সম্পর্কেও জাতীয় চর্চ্চের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন। যখন পোপ ফ্রান্সে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ও ফরাসী বিশপ্‌দিগকে সমাজচ্যুত করিবার ভয় দেখাইলেন, তখন হিঙ্কমারই বলিয়াছিলেন,—"তিনি যদি সমাজচ্যুত করিতে আসেন তাহা হইলে নিজেই সমাজচ্যুত হইবেন।" কিন্তু পূর্ব্বে সাম্রাজ্য সম্পর্কে চর্চ্চকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা যেমন নিষ্ফল হইয়াছিল, ফিউড্যাল্ চর্চ্চ গড়িবার এই চেষ্টাও সেইরূপ নিষ্ফল হইল। এ চর্চ্চের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কোন উপায় ছিল না। ইহার ভাঙ্গন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছিল। প্রত্যেক বিশপ্ ও মঠধারী মোহন্ত নিজ নিজ এলাকা বা মঠের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হইতে লাগিলেন। ইহাতে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়া চলিল। এই সময়ে চর্চ্চের মধ্যে যাজকপদ বণ্টন বিষয়ে এত অধিক মাত্রায় অন্যায় পক্ষপাত ও আত্মীয়কুটুম্বপোষণের ভাব প্রবেশ করিল, এবং যাজকবৃন্দের জীবনে দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার এত প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল যে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া সাধারণ লোকের মনে ও ধর্ম্মপরায়ণ যাজকদিগের মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। এই জন্য অনতিবিলম্বেই চর্চ্চের মধ্যে একটা সংস্কারের

আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল; চর্চ্চের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একত্র করিয়া সকলকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, এমন একটা কর্ত্তৃত্বশক্তির জন্য ব্যাকুলতা জন্মিল। তুরীনের বিশপ্ ক্লোদ এবং লিয়োঁর বিশপ আগোবার্ড তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকার মধ্যে এইরূপ কিছু কিছু চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দেন। কিন্তু এরূপ একটা কার্য্য সাধন করিবার মত তাঁহাদের অবস্থা ছিল না। সমস্ত চর্চ্চের মধ্যে কেবল একমাত্র শক্তি এই কার্য্য সাধনে সক্ষম ছিল, সে রোমের পোপ। সুতরাং পোপের প্রভাব বাড়িয়া উঠিতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। একাদশ শতাব্দীতে চর্চ্চ তাহার চতুর্থাবস্থায় পদার্পণ করিল—চর্চ্চ এখন রীতিমত ভিক্ষু-প্রধান যাজকতন্ত্র চর্চ্চ। পোপ সপ্তম গ্রেগরীকে এই রূপান্তরিত চর্চ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে।

আমাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, সপ্তম গ্রেগরী একজন উন্নতিবিরোধী, তিনি সমস্ত জিনিষকে স্থাবর করিয়া রাখিতে চাহিয়া-ছিলেন, সামাজিক উন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির তিনি বিরোধী, সমস্ত জগৎকে নিশ্চল বা পশ্চাৎগামী করিয়া রাখাই তাঁহার কামনা ছিল। ইহা অপেক্ষা অসত্য আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি শার্লমেন ও জার পিটারের ন্যায় যথেচ্ছাচারতন্ত্রের পরিপোষক হইয়াও সংস্কারক ছিলেন। তিনি চর্চ্চকে এবং চর্চ্চের মধ্য দিয়া সমাজকে সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সমাজের মধ্যে আরও সুনীতি, আরও ন্যায়ধর্ম্ম, আরও নিয়মসংযম আনিতে চাহিয়াছিলেন। পোপশক্তির সাহায্যে ও পোপশক্তির শ্রীবৃদ্ধিকল্পেই তিনি এ কার্য্য সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন।

এক দিকে তিনি যেমন সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্যই সাধারণ সমাজকে চর্চ্চের শাসনে এবং চর্চ্চকে পোপশক্তির শাসনাধীনে আনিতে

চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভিক্ষুসম্প্রদায়ের মধ্যেও ঠিক এই সময়ে এইরূপই একটা চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয়। কঠোর নিয়ম সংযমের দিকে, নৈতিক শাসনের দিকে ভিক্ষুসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রবল উদ্যম দেখা দেয়। এই সময়েই রোবেয়ার দ্য মোলেম সিটো-বিহারে একটা কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। এই সময়েই সেণ্ট নর্‌বেয়ার, সেণ্ট বেরনার প্রভৃতি বড় বড় ভিক্ষুসংস্কারকের আবির্ভাব হয়। মঠগুলির মধ্যে তখন একটা প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে, প্রাচীন ভিক্ষুগণ প্রাচীন প্রথা সমর্থন করিতে লাগিলেন; বলিলেন, কালধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া চর্চ্চের আদিম বিশুদ্ধরূপে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, এই সকল সংস্কার দ্বারা কেবল আমাদের স্বাধীনতাই খর্ব্ব করা হইবে ইত্যাদি। সংস্কারকদিগকে তাঁহারা উন্মাদগ্রস্ত বাতুলের মত মনে করিতেন। অডেরিক ভিটাল-প্রণীত নর্ম্মাণ্ডীর ইতিহাস খুলিলে পদে পদে এই সকল অভিযোগ দেখিতে পাইবেন।

সুতরাং সমস্তই এখন চর্চ্চের ঐক্যের পক্ষে, ক্ষমতাবৃদ্ধির পক্ষে সুবিধাজনক হইয়া পড়িল। পোপ যখন এইরূপে নিজের ঐহিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ভিক্ষুগণ যখন মঠের মধ্যে নৈতিক সংস্কারের জন্য বদ্ধপরিকর, এমন সময়ে কতকগুলি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি প্রত্যেকে একক ভাবে ব্যক্তিমানবের পক্ষ হইতে এই দাবী তুলিলেন যে, মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধিরও একটা অস্তিত্ব আছে এবং মানুষের মতামত গঠনের পক্ষে তাহার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সর্ব্বজনগৃহীত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাস আক্রমণ করেন নাই; তাঁহারা কেবল বলিলেন, এগুলিকে যাচাই করিবার অধিকার মানুষের আছে, মানুষের বিচারবুদ্ধি নিঃশব্দে এগুলিকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে।

সপ্তম অধ্যায়

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান উপাদান তিনটি—(১) ফিউড্যাল্ ভূস্বামিতন্ত্র ; (২) চর্চ্চের যাজকতন্ত্র ; (৩) পৌরতন্ত্র। দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভূস্বামিতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে। এখন ঐ যুগের পৌরতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে।

যাজকতন্ত্র ও ভূস্বামিতন্ত্রের ইতিহাসের ধারার সহিত পৌরতন্ত্রের ইতিহাসের ধারার মিল নাই। চর্চ্চ ও ফিউড্যাল্ পদ্ধতি যদিও পরবর্ত্তী কালে নব নব ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তথাপি পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই তাহারা সম্পূর্ণ ও সুনির্দ্দিষ্ট স্বরূপ লাভ করিয়াছিল ; ঐ সময়ের মধ্যে কিরূপে তাহাদের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি ঘটিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু পৌরতন্ত্রের ইতিহাস অন্যরূপ। আমাদের আলোচ্য যুগের শেষভাগেই অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতেই পৌরতন্ত্র ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে ; অবশ্য ইহা নহে যে, তৎপূর্ব্বে ইহার কোন আলোচনাযোগ্য ইতিহাস ছিল না ; ইহাও নহে যে, আমাদের আলোচ্য যুগের বহু পূর্ব্বেও ইহার অস্তিত্বের চিহ্ন ছিল না ; কিন্তু কেবল একাদশ শতাব্দীতেই পৌরতন্ত্র আধুনিক সভ্যতার একটা বৃহৎ অঙ্গরূপে সুস্পষ্টভাবে জগতের দৃশ্যপটে প্রকট হইয়া উঠিল। ভূস্বামিতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের ইতিহাসে পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বীজ হইতে ফলে পরিণতি, কারণ হইতে কার্য্যে পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, কার্য্যকারণের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতে সেখানে আমাদের আলোচ্য যুগের বাহিরে চলিয়া যাইতে হয় না। পৌরতন্ত্রের বেলায় আমরা সে

সুবিধা পাইব না। আমাদের আলোচ্য যুগের মধ্যে কেবল তাহার জন্মের ইতিহাস পাওয়া যাইবে, তাহার পরিণতির ইতিহাস নহে। সুতরাং আপাততঃ কেবল ইহার মূল কারণ ও উৎপত্তির কথাই আলোচনা করিব। পৌরতন্ত্রের পরিণামফল ও সাধারণ প্রভাব সম্বন্ধে এখন যাহা বলিব, তাহা কতকটা পরবর্ত্তী ইতিহাসের আনুমানিক পূর্ব্বাভাসরূপে গ্রহণ করিবেন। আমি সে সব কথা এখন সমসাময়িক ঘটনার সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিতে পারিব না। যখন দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিব, তখন দেখিবেন, পৌরতন্ত্র পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিতেছে; তখন দেখিবেন, সে তাহার স্বভাবানুযায়ী ফল ফলাইতেছে; তখন দেখিবেন, ইতিহাসের ঘটনা আমাদের যুক্তিমূলক সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছে। আপনাদের সমক্ষে যে চিত্র উপস্থিত করিতেছি, তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া পাছে আপনারা আপত্তি করেন, সেই জন্যই এ কথাটা বলিয়া রাখিলাম।

এখন মনে করুন, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে, ফ্রান্সের নবজীবনচেষ্টার ভীষণ সূচনাকালে দ্বাদশ শতাব্দীর একজন পৌরপ্রধান হঠাৎ আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। এই সময়ে যে সকল পুস্তিকা লোকচিত্তে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, সেইরূপ একখানি পুস্তিকা তাঁহাকে পড়িতে দেওয়া হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন তাঁহাকে সীয়ে (Sieyes) প্রণীত "থার্ড এষ্টেট্ বা তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গ কাহাকে বলে?" এই নামের পুস্তিকাখানি পড়িতে দেওয়া হইল। পুস্তিকাখানির মূল ভিত্তিস্বরূপ এই কথাটি তাঁহার চোখে পড়িল,—"অভিজাতবর্গ ও যাজকবর্গকে বাদ দিয়া সমগ্র ফরাসী জাতিই রাষ্ট্রের তৃতীয় অঙ্গ।" এ কথাটি পড়িয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইবে, জিজ্ঞাসা করি। আপনারা কি মনে করেন,

তিনি ইহার কোন অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন? না, তিনি "ফরাসী জাতি" কথাটি বুঝিতে পারিবেন না; কারণ, এরূপ কোন পদার্থের সহিত তিনি পরিচিত নহেন, তাঁহার সময়ে "ফরাসী জাতি" বলিয়া কোন বস্তু ছিল না; আর যদিই বা তিনি "ফরাসী জাতি" বস্তুটি কি, তাহা বুঝিতে পারেন, যদি তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান যে, উপরোদ্ধৃত বাক্যে রাষ্ট্রের এই তৃতীয় অঙ্গের হস্তে সমগ্র সমাজের শাসনাধিকার আরোপ করা হইতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হইবে, ইহা একটা ধর্ম্মবিরুদ্ধ উন্মত্ত প্রলাপবাণী; তাঁহার অভিজ্ঞতা, তাঁহার ভাব ও ধারণার সহিত এই আধুনিক তত্ত্বের এত বিরোধ।

এখন এই বিস্ময়াপ্লুত পৌরপ্রধানকে লইয়া র‍্যাঁ (Reims), বোভে (Beauvaix), লাওঁ (Laon) বা নোয়াইয়োঁ (Noyon) এইরূপ কোন আধুনিক ফরাসী নগরে প্রবেশ করুন; এখানে তিনি আর একপ্রকার বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন। তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছেন, এখানে না আছে দুর্গ, না আছে প্রাকার, না আছে পৌরসেনা; পুরীরক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই; সমস্তই উন্মুক্ত, যে কোন আগন্তুক, যে কোন বিজেতা আসিয়া দখল করিলেই হইল। পৌরপ্রধান এ পুরীকে কখনই নিরাপদ্ মনে করিবেন না, তিনি ইহাকে দুর্ব্বল ও অযত্নরক্ষিত বলিয়াই ধরিয়া লইবেন। তিনি নগরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইলেন, সেখানে কি ঘটিতেছে, কি প্রণালীতে পুরী শাসিত হইতেছে, পুরীর অধিবাসী কাহারা, এ সমস্ত সন্ধান লইলেন। তাঁহাকে বলা হইল, পুরীর বাহিরে একটা রাজশক্তি আছে, সে পৌরবর্গের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া স্বেচ্ছানুসারে পুরী হইতে রাজকর আদায় করে, পৌরসেনা সংগঠন করিয়া যথা ইচ্ছা যুদ্ধে পাঠায়। তিনি পৌরকর্ম্মচারীর কথা, পৌরাধিনায়ক মেয়রের কথা, পৌরপ্রধানদিগের

কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; শুনিলেন, তাঁহারা পৌরবর্গের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন না। তিনি আরও শুনিলেন, পুরীর মধ্যেই পৌর ব্যাপারের মীমাংসা হয় না ; পরন্তু একজন রাজকর্ম্মচারী দূর হইতে একাকী পুরীর শাসনকার্য্য চালাইয়া থাকেন। উপরন্তু তিনি শুনিলেন যে, পৌরজনসংক্রান্ত কোনও ব্যাপারের বিচার করিবার জন্য একত্র সম্মিলিত হইবার অধিকার পৌরবর্গের নাই ; পৌরবর্গ গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা সাধারণ সভাস্থলে কখনও আহূত হয় না। দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরপ্রধান একেবারে বিস্ময়বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন। তিনি প্রথমেই বিচকিত হইলেন, যখন দেখিলেন, নেশন বা সমগ্র জাতি রাষ্ট্রের তৃতীয়াঙ্গরূপে নিজকে কত মহিমাশালী মনে করিতেছে। এখন আবার দেখিতেছেন, সেই জাতীয় সত্তা নিজের ঘরেই এত পরাধীন, এত দুর্ব্বল, এতটা নগণ্য যে, তাঁহার সময়ের সমাজের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। তিনি একদিকে দেখিতেছেন, সমাজই রাষ্ট্রের অধিপতি, অন্য দিকে দেখিতেছেন, সমাজ একেবারে শক্তিহীন। এ বৈষম্য তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন ? ইহার সামঞ্জস্যই বা তিনি কি করিয়া করিবেন ? তাঁহার চিত্তবিভ্রম না ঘটাই আশ্চর্য্য।

এখন উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক আমরা একবার দ্বাদশ শতাব্দীতে ফিরিয়া যাই। আমরাও দেখিব, সেখানে এই একইরূপ দ্বৈতসমস্যা। দেশ বা রাষ্ট্র বা শাসনতন্ত্র বা সমগ্র সমাজের ব্যাপার আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাইব, সে ক্ষেত্রে পৌরবর্গের কোন সংশ্রব নাই ; সে ক্ষেত্রে কোন বিষয়েই তাহারা হস্তক্ষেপ করে না, তাহারা গণনার মধ্যেই আসে না। রাষ্ট্রব্যাপারে তাহারা যে নগণ্য, শুদ্ধমাত্র তাহাই নহে ; পরন্তু যদি জানিতে চাই যে, তাহারা নিজেদের এই অবস্থাটা কি চক্ষে দেখে, এ সম্বন্ধে তাহারা

কি বলে, তাহা হইলে তাহাদের ভাষার মধ্যে সম্ভ্রমসঙ্কোচ ও ভীরুতারই আতিশয্য দেখিতে পাইব। যে সমস্ত ভূস্বামী প্রভুর হাত হইতে তাহারা জোর করিয়া স্বাধীন অধিকার আদায় করিয়া লইয়াছে, তাহারা পৌরবর্গের প্রতি এতটা ঔদ্ধত্যের সহিত আচরণ করে যে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়; অথচ ইহাতে সে কালের পৌরবর্গের বিস্ময়ও নাই, ধৈর্য্যচ্যুতিও নাই।

এখন সে কালের একটা পুরীর মধ্যেই প্রবেশ করা যাউক; দেখা যাউক, সেখানে কি ব্যাপার। সেখানে আর এক দৃশ্য; আমরা একটা প্রাকারবেষ্টিত পৌরসেনাসংরক্ষিত দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; পৌরবর্গ এখানে নিজে নিজেই কর বসাইতেছে, শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতেছে, বিচার করিতেছে, দণ্ড দিতেছে, এবং পৌরব্যাপার আলোচনা করিবার জন্য সভাসংসদে সম্মিলিত হইতেছে। এই সকল সম্মিলনীতে সকলেই আসিতেছে; তাহারা স্বাধীনভাবেই ভূস্বামীপ্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে; এবং তাহাদের একটা পৌরসেনা আছে। এক কথায় তাহারা নিজেরাই নিজেদের শাসন করিতেছে, পুরীর এলাকার মধ্যে তাহারাই রাজশক্তি। দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরপ্রধান অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে যে বৈষম্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, এ বৈষম্যও তদনুরূপ; কেবল অঙ্গদ্বয়ের অবস্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। এখন পৌরজন লইয়া যে জাতীয় সমাজ, সেই জাতিই সব, পুরী কিছুই নহে; পূর্ব্বে জাতীয় সমাজ ছিল নগণ্য, পুরীই ছিল সব।

নিশ্চয়ই, দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অনেক অসাধারণ ঘটনা, অনেক বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল, নতুবা পৌরসমাজের অবস্থার এতটা পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারিত না। এই পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে

যে, ১৭৮৯ অব্দের তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গ বা "থার্ড এষ্টেট" রাজনৈতিক হিসাবে দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরসঙ্ঘেরই বংশধর। যে ফরাসী জাতি আজ এত উদ্ধত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যাহার দম্ভোক্তি আজ গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, যে আজ শুধু নিজকে নহে, সমগ্র জগৎকে শাসন করিতে ও নবজীবন দিতে চাহে, নিশ্চয়ই সে সম্পূর্ণভাবে না হউক, প্রধানতঃ সেই প্রাচীন পৌরবর্গেরই সন্তান, যাঁহারা দ্বাদশ শতাব্দীতে সাহসে ভর করিয়া ভূস্বামীদিগের যথেচ্ছ শাসনের বিরুদ্ধে স্ব স্ব পুরীর স্বাতন্ত্র্য-সাধনের জন্য বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়াছিলেন।

অবশ্য দ্বাদশ শতাব্দীর পৌর সমাজের অবস্থা আলোচনা করিয়াই এই পরিবর্ত্তনের রহস্য বুঝিতে পারিব না; দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার দ্বারাই এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, সেই পরবর্ত্তী যুগেই এই পরিবর্ত্তন কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল, দেখিতে পাইব। তথাপি তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গের ইতিহাসে এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহা কেবল তাহার মূল আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং যদিও আমাদের আলোচ্য যুগে তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গের ভবিষ্যৎ পরিণামের কোন আভাস পাওয়া যায় না, তথাপি অন্ততঃ তাহার মূলবীজের সন্ধান পাওয়া যায়; কারণ, সে মূলে যাহা ছিল, তাহার এখনকার পরিণতির মধ্যেও অনেক পরিমাণে পুনরায় তাহাই পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরসমাজের একটা অসম্পূর্ণ চিত্র হইতেও আপনারা এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন।

এই পৌরসমাজের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, পুরীগুলিকে প্রধানতঃ দুই দিক্ দিয়া দেখা আবশ্যক। দুইটী বড় প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে:—প্রথম প্রশ্ন, পুরীগুলি কিরূপে স্বায়ত্তশাসনা-

ধিকার লাভ করিল, কিরূপে ও কি কি কারণে এ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, ইহার ফলে পৌরগণের অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইল, সাধারণ সমাজের উপর, সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর উপর এবং রাষ্ট্রশক্তির উপর ইহার প্রভাব কিরূপ হইল? দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় পুরীর আভ্যন্তরীণ শাসনপদ্ধতি কিরূপ ছিল, স্বায়ত্তশাসনাধিকারপ্রাপ্ত পুরী-গুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা কেমন ছিল, পুরীমধ্যে পৌরগণের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত, এবং পুরীমধ্যে কিরূপ রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

এক দিকে সাধারণভাবে পৌরগণের সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন আসিল, অন্য দিকে তাহাদিগের পৌরশাসনপদ্ধতি যে ভাবে গড়িয়া উঠিল, এই উভয় দিক্ দিয়াই আধুনিক সভ্যতার উপর সে কালের পৌরজীবনের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রভাবের আলোচনা করিতে গিয়া যে কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহার মূলে হয় একটি, না হয় অপরটী আছে। অতএব এই দুইটি দিক্ পর্য্যালোচনা করিলেই সে কালের পৌরতন্ত্রের ইতিহাস আমাদের করায়ত্ত হইবে। এক দিকে বুঝিতে হইবে, পুরীগুলির স্বায়ত্তশাসনলাভের ইতিহাস, অন্য দিকে বুঝিতে হইবে পৌরশাসনপদ্ধতি।

পরিশেষে সমগ্র ইউরোপে পুরীগুলির কিরূপ বিভিন্ন অবস্থাবৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল, সে সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। আমি যে সমস্ত তথ্য ও ঘটনা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিব, সেগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর সমস্ত পুরী সম্বন্ধে,—ইটালী, স্পেন, ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের যে কোন পুরী সম্বন্ধে সমানভাবে খাটিবে না। অবশ্য কতকগুলি ব্যাপার সমস্ত পুরীর মধ্যেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের প্রভেদও সামান্য বা নগণ্য নহে। আমি সেই সকল প্রভেদগুলি দেখাইয়া

যাইব; পরবর্ত্তী যুগের সভ্যতার আলোচনাকালে আবার আমরা সেগুলির দেখা পাইব, এবং তখন আমরা আরও সূক্ষ্মভাবে সেগুলির আলোচনা করিব।

পুরীগুলির স্বায়ত্তশাসনলাভের ইতিহাস বুঝিতে হইলে আপনাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে, পঞ্চম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্থাৎ রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে সামাজিক বিদ্রোহের আরম্ভকাল পর্য্যন্ত নগরগুলির অবস্থা কিরূপ ছিল। তখন নগরগুলির মধ্যে নানারূপ অবস্থাভেদ ছিল; ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের নগরগুলির অবস্থায় বিস্তর প্রভেদ ছিল; তথাপি এমন কতকগুলি সাধারণ ব্যাপার আছে, যাহা প্রায় সকলগুলির সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আমি সেই সকল সাধারণ তথ্য লইয়াই বিচার করিতে চেষ্টা করিব। যেখানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিব, অর্থাৎ যেখানে কোন বিশেষ ব্যাপারের উল্লেখ করিব, তখন বুঝিতে হইবে, আমি বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের এবং আরও বিশেষ করিয়া রোম ও লোয়ার নদীর অপর পারবর্ত্তী উত্তর-ফ্রান্সের পুরীগুলি লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছি। আমি যে চিত্রপট আপনাদের সমক্ষে উন্মুক্ত করিতে চাই, তাহার মধ্যে এই শেষোক্ত পুরীগুলিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত নগরগুলির অবস্থা দাসত্বের অবস্থাও নহে, স্বাধীনতার অবস্থাও নহে। ইতিহাসের ঘটনা বা চরিত্রচিত্রণে যে বিপদ্, শব্দপ্রয়োগেও পদে পদে সেইরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। যখন একটা সমাজ ও তাহার ভাষা প্রাচীনত্ব লাভ করে, তখন ভাষার শব্দগুলি এক একটী সুসম্পূর্ণ সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ লাভ করে। কালক্রমে এক একটি শব্দের অর্থে নানা বিচিত্র ভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়, শব্দটি উচ্চারণ করিলেই সেই সমস্ত বিচিত্র

ভাব মনে উদিত হয়; অথচ এই সকল বিচিত্র ভাব বিভিন্ন যুগে আসিয়া জুটিয়াছে, সুতরাং সর্ব্বকালের ঘটনার পক্ষে সেগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দাসত্ব ও স্বাধীনতা, এই দুইটি কথার বিচার করিয়া দেখুন। এখনকার কালে এই উভয় শব্দদ্বারা যে সম্পূর্ণ ও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবের দ্যোতনা হয়, তাহার সহিত অষ্টম বা নবম বা দশম শতাব্দীর কোন ব্যাপারের সম্পূর্ণ মিল নাই। যদি বলি যে, অষ্টম শতাব্দীতে নগরগুলি স্বাধীন ছিল, তাহা হইলে অনেক বেশী বলা হইল; আজকাল আমারা স্বাধীনতা শব্দের যে অর্থ বুঝি, তাহার অনুরূপ কোন বস্তু অষ্টম শতাব্দীতে ছিল না। আবার যদি বলি, তখনকার নগরগুলির অবস্থা দাসত্বের অবস্থা, তাহা হইলে সেই একই ভ্রমে নিপতিত হইব; কারণ, দাসত্ব-শব্দটি দ্বারা এখন আমারা যাহা বুঝি, তাহার সহিত সে সময়ের পৌরজীবনের কোন মিল নাই।

আমি পুনরায় বলি যে, সে সময়ে নগরগুলির অবস্থা দাসত্বের অবস্থাও নহে, স্বাধীনতার অবস্থাও নহে। দুর্ব্বলকে যতপ্রকার লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়, তাহারা সে সমস্তই ভোগ করিত; সবল পক্ষের অত্যাচার উৎপীড়ন তাহাদিগকে নিয়তই সহ্য করিতে হইত; কিন্তু তথাপি এ সমস্ত ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও, অবিরত ধনক্ষয় লোকক্ষয় সত্ত্বেও তাহারা কতক পরিমাণে নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। অধিকাংশ নগরেই একটি করিয়া যাজকসমাজ ও একজন করিয়া বিশপ্ থাকিতেন। তাঁহার এক দিকে যেমন অসামান্য ক্ষমতা, অন্য দিকে তেমনি সাধারণ জনবৃন্দের উপর অসাধারণ প্রভাব। সুতরাং তিনি পৌরসঙ্ঘ ও ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর মধ্যবর্ত্তী যোগসূত্রস্বরূপ থাকিতেন, এবং এইরূপে ধর্ম্মের আবরণ দ্বারা পৌরজীবনের স্বাধীনতা কতক পরিমাণে রক্ষা করিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া নগরগুলির মধ্যে,

প্রাচীন রোমীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসাবশেষও অনেক পরিমাণে বজায় ছিল। এই যুগে প্রাচীন রোমীয় পদ্ধতি অনুসারে ঘন ঘন "সেনেট" ও "কিউরিয়া" আহূত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়; সাধারণ পৌরসম্মিলন এবং পৌরশাসনকর্ত্তারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রোমীয় পৌরতন্ত্রের রীতি অনুসারে এই যুগের নগরগুলির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, উইল, দানপত্র প্রভৃতি পৌরজীবনের অনেক ব্যাপার পৌরবিচারসভায় পৌর বিচারক কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে। এই সকল পৌরক্রিয়ার অবশেষ ক্রমশঃই অবশ্য লোপ পাইতে থাকে। বর্ব্বর-রীতিনীতির প্রভাব, চারিদিকের বিশৃঙ্খলা এবং উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধনশীল দুর্ভাগ্য-দুর্য্যোগের তাড়নায় দ্রুতবেগে লোকক্ষয় হইতে থাকে। ভূস্বামিগণ পল্লীজনপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং কৃষিজীবনই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল; এই সকল নূতন কারণে পৌর-জীবনের আরও বলক্ষয় হইল। বিশপ্‌গণও যখন প্রথমে ফিউড্যাল্ পদ্ধতির অন্তর্গত হইলেন, তখন তাঁহারা পৌরজীবনের উপর ততটা আস্থা স্থাপন করেন নাই। শেষে যখন ফিউড্যাল্‌পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তখন পৌরসমাজগুলি একেবারে দাসসমাজে পরিণত না হইলেও তাহাদের পূর্ব্বস্বাধীনতা একেবারে হারাইল। প্রত্যেক পুরী এক একজন ভূস্বামীর জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কবলে আসিয়া পড়িল। বর্ব্বর আক্রমণের প্রথম আমলের অশান্তিবিপ্লবের মধ্যেও তাহারা যেটুকু স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, এখন তাহারা তাহাও রাখিতে পারিল না। সুতরাং পঞ্চম শতাব্দী হইতে ফিউড্যাল্ পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকাল পর্য্যন্ত নগরগুলি উত্তরোত্তর অবনতির পথে চলিল।

যখন একবার ফিউড্যাল্ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল,

যখন প্রত্যেক ব্যক্তি এই পদ্ধতির মধ্যে এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ভূমি অধিকার করিয়া বসিল, যখন যাযাবর সমাজ স্থাবর সমাজে পরিণত হইল, তখন কিয়ৎকাল পরেই নগরগুলি আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, আবার তাহাদের মধ্যে সজীবতার লক্ষণ দেখা দিল। আপনারা জানেন, পৃথিবীর শস্যদায়িকা শক্তি যে নিয়মে কার্য্য করে, মানুষের কর্ম্মশক্তিও সেই নিয়মেই কার্য্য করে; বিপ্লববিক্ষোভ যেই বন্ধ হয়, অমনি সৃষ্টিক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয়; চারি দিকে অঙ্কুরোদ্গম হইতে থাকে, চারি দিকে সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। শান্তি ও শৃঙ্খলার সামান্য আভাস পাইবামাত্র মানুষ আবার আশান্বিত হয়, আশান্বিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে। নগরগুলির ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল; যে মুহূর্ত্তে ফিউড্যাল্‌পদ্ধতি কিঞ্চিৎ স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, সেই মুহূর্ত্তেই ভূস্বামীদিগের মনে নূতন নূতন অভাব জাগিয়া উঠিল, উন্নতি ও উৎকর্ষের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। এই অভাব পূরণের জন্য তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত নগরগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ-পরিমাণে শিল্প ও বাণিজ্যের পুনরুত্থান ঘটিল; পুনরায় ধীরে ধীরে তাহাদের লোকবল ও ধনবল বাড়িতে লাগিল। যে সকল কারণে এই পুনরুন্নতি সম্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটির প্রতি সাধারণতঃ তেমন মনোযোগ করা হয় না;—সেটি হইতেছে, ঐহিক শাসনশক্তির কবল হইতে পলায়নপর ব্যক্তির পক্ষে চর্চ্চের ক্রোড়ে নিরাপদ্ আশ্রয় লাভের অধিকার। যখন পর্য্যন্ত পৌরসঙ্ঘ পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, যখন পর্য্যন্ত সে স্বীয় প্রাকারপরিখা ও সম্মিলিত শক্তির প্রভাবে গ্রাম্য জনপদের উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবার সামর্থ্য লাভ করে নাই, যখন পর্য্যন্ত চর্চ্চ ভিন্ন তাহার অন্য কোন নিরাপদ্ আশ্রয় ছিল না, তখন পর্য্যন্ত এই চর্চ্চের আশ্রয় পাইবার জন্যই বহু দুর্ভাগ্য পলাতক

নগরে আকৃষ্ট হইত। তাহারা চর্চ্চের মধ্যে ও চতুষ্পার্শ্বে আশ্রয় লইতে থাকিল। শুধু যে চাষা মজুরের মত নিম্নশ্রেণীর লোকই এইরূপে আশ্রয় লইতে আসিত, তাহা নহে; অনেক সময় ধনমর্য্যাদাসম্পন্ন সমৃদ্ধ ব্যক্তিও আসিত। এই সময়ের ইতিবৃত্তগুলি এইরূপ দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। দেখিবেন, অনেক পরাক্রমশালী ব্যক্তি প্রবলতর প্রতিবেশী অথবা স্বয়ং ভূপতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, স্বাধিকারভুক্ত ভূখণ্ড পরিত্যাগ করতঃ, যথাসর্ব্বস্বসমেত কোন এক নগরে আসিয়া চর্চ্চের আশ্রয় লইতেছেন এবং সেই নগরের পৌর-পদবী গ্রহণ করিতেছেন। নগরের উন্নতির উপর এইরূপ আশ্রিতবর্গের কোন প্রভাব ছিল না, ইহা আমার মনে হয় না। তাঁহারা নগরের মধ্যে ধনসম্পদ্ আনিলেন এবং সাধারণ অধিবাসী অপেক্ষা উচ্চস্তরের লোকসম্পদ্ আনিলেন। তাহা ছাড়া সকলেই জানেন যে, একবার কোন সূত্রে একটা আংশিক সংসর্গ ঘটিলে, লোকে তখন শুধু আশ্রয়ের জন্য নহে, সামাজিকতার প্রলোভনেই এইরূপ মিলনক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়।

এই সকল কারণের একত্র সমবায়ে, ফিউড্যাল্ শাসনপদ্ধতি কিয়ৎ-পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরই, নগরগুলি পুনরায় কিঞ্চিৎ বললাভ করিল। বললাভ করিল বটে, কিন্তু সে পরিমাণে নিরুপদ্রব শান্তিলাভ করিল না। যাযাবরবৃত্তি তখন বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই যাযাবর জীবনযাত্রার মধ্যেই বিজেতা নূতন ভূস্বামিগণ নিজ নিজ দুর্দ্দাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবসর পাইতেন। যখন তাঁহাদের মধ্যে লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিত, তখন তাঁহারা দূরদেশ লক্ষ্য করিয়া বিজয়যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতেন। কিন্তু যখন সকলেই তাঁহারা স্ব স্ব ভূখণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, যখন এই পরিভ্রমণলিপ্সা বর্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল, তখনও তাঁহাদের লোভ, তাঁহাদের অসীম আকাঙ্ক্ষা,

তাঁহাদের দুর্দ্দাম প্রবৃত্তি কিছুই প্রশমিত হইল না। সুতরাং তাঁহাদের প্রবৃত্তির সমস্ত আক্রোশ পড়িল নিকটস্থ নগরগুলির উপর। লুণ্ঠনের জন্য দূরদেশে না যাইয়া তাঁহারা ঘরে বসিয়াই লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। ভূস্বামী অভিজাতবর্গ কর্ত্তৃক পৌরবর্গের অর্থশোষণব্যাপার দশম শতাব্দীর আদি হইতেই দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হইল। যখনই কোন ভূস্বামীর অর্থলিপ্সা জাগিয়া উঠিত, তখনই তিনি স্বীয় অধিকারভুক্ত নগরের পৌরজনের উপর অত্যাচার করিয়াই তাহা চরিতার্থ করিতেন। পদে পদে এই অত্যাচার উপদ্রবের আশঙ্কা বাণিজ্যের পক্ষে যে একেবারে প্রাণঘাতী, এই কথা লইয়া এই যুগেই পৌরবর্গের মধ্য হইতে ঘন ঘন অভিযোগ উঠিতে লাগিল। বণিক্‌গণ বাণিজ্যযাত্রা হইতে ফিরিবার সময় শান্তিতে স্বপুরী প্রবেশ করিতে পারিত না; ভূস্বামী ও তাহার অনুচরবৃন্দ অনবরত পথঘাট আগলাইয়া তাহাদিগকে বাধা দিত। যে সময়ে শিল্পবাণিজ্যের পুনরুত্থান ঘটিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই শান্তি শৃঙ্খলার একেবারেই অভাব ছিল। নিজের কার্য্যে এইরূপ পদে পদে বাধা পাইলে এবং প্রত্যাশিত শ্রমফল হইতে এইরূপে বঞ্চিত হইলে মানুষ যেরূপ বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়, সেরূপ আর কিছুতে নহে। জীবনযাত্রা যখন একঘেয়ে ভাবে একটা বাঁধা পথে চলিতে থাকে, তখন যদি কেহ উপদ্রব করে, যখন পিতৃপিতামহাগত সম্পত্তিই দুর্ব্বৃত্তে লুণ্ঠন করিয়া লয়, নিজের উপার্জ্জনের ধন নহে, তখন মানুষ বিরক্ত ও কুপিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক বেশী কুপিত হয় পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রে। কোন ব্যক্তি বা লোকসমষ্টি যখন উন্নতির পথে, সমৃদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইতেছে, তখন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমন একটা প্রবল বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠে, যেমন আর কোনও অবস্থায় হয় না।

এই ছিল তাহা হইলে দশম শতাব্দীতে নগরগুলির অবস্থা ;—তাহাদের শক্তি বাড়িয়াছিল, মর্য্যাদা বাড়িয়াছিল, অর্থ বাড়িয়াছিল—সুতরাং প্রাণপণে রক্ষা করিবার মত বস্তু তাহাদের অনেক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও তাহাদের এই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল ; কারণ, এই বলবৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধি দেখিয়াই ভূস্বামিগণের মনে হিংসার সঞ্চার হইল। বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্যও তাহাদের যে পরিমাণে বাড়িতে থাকিল, বিপদ্‌ও সেই পরিমাণে বাড়িয়া চলিল। তাহা ছাড়া, যাহারা একবার ফিউড্যাল্ ভূস্বামিতন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছে, তাহারা পদে পদে প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত, বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছে ; এ পদ্ধতি কখনও এমন একটা দৃঢ়সম্বদ্ধ শাসনতন্ত্রের আকারে দেখা দেয় নাই, যাহা অনন্যাপেক্ষিভাবে কেবল নিজের শক্তিতে সকলকে শাসন ও দমন করিতে পারে। বরং ব্যক্তিমানবের স্বাধীন ইচ্ছা কেবলই শাসনতন্ত্রকে উপেক্ষা করিতেছে, ইহার বশ্যতা স্বীকার করিতেছে না, এই দৃশ্যই ফিউড্যাল্ পদ্ধতির ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখা যায়। নিম্নতন ভূস্বামীর সহিত ঊর্দ্ধতন ভূস্বামীর সম্বন্ধ এইরূপই ছিল। সুতরাং নগরগুলি ভূস্বামীদিগের উপদ্রব অত্যাচারে নিপীড়িত হইতেছিল, এই অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যখন তাহাদের একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল, তখন তাহাদের সম্মুখে বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল ছিল না। ফিউড্যাল্ পদ্ধতি মানবজাতির একটা মহৎ উপকার করিয়াছে ; সে অনবরত ব্যক্তিমানবের স্বাধীন ইচ্ছার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছে। এ শিক্ষা নিষ্ফল হয় নাই। পৌর-সমাজের দৌর্ব্বল্য সত্ত্বেও, ভূস্বামিগণের সহিত তাহাদের বিস্তর অবস্থা-বৈষম্য সত্ত্বেও নগরগুলি চারিদিকে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল।

এ ঘটনার যথাযথভাবে সময় নির্দ্দেশ করা কঠিন। সাধারণতঃ

বলা হইয়া থাকে যে, পৌরবর্গের স্বাধীনতালাভ একাদশ শতব্দীতে আরম্ভ হয়; কিন্তু সমস্ত বড় বড় ব্যাপারের মধ্যেই দেখা যায় যে, কত অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যর্থ চেষ্টার পরে তবে একটা চেষ্টা ফলবতী হয়। সমস্ত ব্যাপারেই বিধাতা স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনকল্পে কত সাহস, কত সদ্‌গুণ, কত আত্মত্যাগ, কত মানবজীবন অকুণ্ঠভাবে প্রয়োগ করিয়া যান এবং এইরূপ অগণিত চেষ্টার পর, বহু মহাপ্রাণ পুরুষের হতাশ আত্ম-বলিদানের পর, তবেই কেবল বিধাতার সঙ্কল্প জয়যুক্ত হয়। সাধারণ পৌরসমাজের পক্ষেও নিশ্চয় এইরূপই ঘটিয়াছিল। নিশ্চয়ই অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে অনেকবার বিদ্রোহের চেষ্টা হইয়াছিল, স্বাধীনতার দিকে অনেকবার অগ্রসর হইবার চেষ্টা হইয়াছিল। সে সব চেষ্টা যে শুধু ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহা নহে; সেই সব ব্যর্থ চেষ্টার গৌরবহীন স্মৃতি লোকমনে একটা নৈরাশ্যের ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। তথাপি ইহা সত্য যে, পরবর্ত্তী ঘটনার উপর এই সকল চেষ্টার প্রভাব একেবারে উপেক্ষণীয় নহে; এই সকল চেষ্টাদ্বারাই স্বাধীনতার ভাব পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল, এবং একাদশ শতাব্দীর বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

আমি ইচ্ছা করিয়াই "বিদ্রোহ" শব্দটি ব্যবহার করিতেছি। একাদশ শতাব্দীতে সাধারণ পৌরবৃন্দের স্বাধীনতালাভ বাস্তবিকপক্ষে একটা বিদ্রোহের ফল। এই বিদ্রোহে পৌরবর্গ ভূস্বামিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিল। এই সকল বিদ্রোহের ইতিহাসে প্রথম প্রায়ই দেখা যায়, পৌরগণ হাতের কাছে যে যে অস্ত্র পাইয়াছে, তাহাই লইয়া বিদ্রোহ করিয়া উঠিয়াছে এবং ভূস্বামীর যে সমস্ত অনুচর কোন একটা অন্যায় কর বা বলি আদায় করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। হয়ত ভূস্বামীর দুর্গাবাসই আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে।

এ বিদ্রোহের সমস্ত যুদ্ধেরই এই প্রণালী। বিদ্রোহ যদি ব্যর্থ হয়, তখন বিজেতা কি করেন ? পৌরগণ পুরীর ও স্ব স্ব গৃহের চতুষ্পার্শ্বে যে সমস্ত দুর্গ, প্রাকারাদি তুলিয়াছে, তিনি সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দেন। পৌরগণের সমষ্টিবন্ধনকালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরস্পর সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং পরস্পরকে সাহায্য করিবার শপথ গ্রহণ করিয়া, প্রত্যেক নাগরিক সর্ব্বপ্রথম নিজ নিজ গৃহ প্রাকারাদিদ্বারা দৃঢ়সংরক্ষিত করিতেন। কতকগুলি পুরী এখনকার কালে একেবারে অজ্ঞাত অখ্যাত হইলেও সে সময়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া অক্লান্ত উদ্যমের সহিত ভূস্বামীর সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। নিবের্ণোয়া-র অন্তঃপাতী বেজেলে-নামক ক্ষুদ্র নগরী ইহার একটি দৃষ্টান্ত। বেজেলের মোহন্ত-ভূস্বামীই জয়লাভ করিলেন ; তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন যে, পৌরগণের গৃহ-প্রাকারগুলি ভূমিসাৎ করা হউক। যাঁহাদের প্রাকার-সংরক্ষিত আবাসবাটী এইরূপে বিধ্বস্ত হইল, তাঁহাদের অনেকের নাম এখনও পাওয়া যায়।

এখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আবাস-ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাউক ; তাহাদের গঠনপ্রণালীই বা কিরূপ, এবং তাহা হইতে তাহাদের জীবনযাত্রার ধরণ সম্বন্ধে কি অনুমান করা যায়, দেখা যাউক। দেখিবেন, এখানেও সমস্তই সামরিক জীবনযাত্রার উপযোগী, চারিদিকেই সংগ্রামের আয়োজন।

যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে দ্বাদশ শতাব্দীর পৌর বাসবাটীর গঠন কতকটা এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়,—সাধারণতঃ বাটীগুলি ত্রিতল হইত, প্রত্যেক তলে একটি করিয়া ঘর ; নিম্নতলের ঘরটি সাধারণ ব্যবহারের ঘর, এখানে সমস্ত পরিবার একত্র ভোজন করিত ;

দ্বিতলের ঘরটি নিরাপদ্ করিবার জন্য অনেক উর্দ্ধে নির্ম্মাণ করা হইত, বাটীর গঠনের ইহাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট লক্ষণ। এই দ্বিতল গৃহেই নাগরিক সস্ত্রীক বাস করিতেন। বাড়ীর এক পার্শ্বে প্রায়ই একটি চতুষ্কোণ বুরুজ নির্ম্মিত হইত; ইহাও সামরিক জীবনের পরিচায়ক, আত্মরক্ষাই উহার উদ্দেশ্য। ত্রিতলের ঘরটি কি ভাবে ব্যবহার হইত, তাহা ঠিক জানা যায় না, সম্ভবতঃ বালকবালিকা ও পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি এই ঘরে থাকিত। সর্ব্বোপরি একটি ক্ষুদ্র চবুত্র থাকিত, ইহা নিশ্চয় শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। বাটীর সমগ্র গঠনপ্রণালীর মধ্যে সামরিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। যে আন্দোলনের ফলে পৌরসাধারণ স্বাধীনতা লাভ করিল, তাহাকে সামরিক আন্দোলন ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

সংগ্রাম কিছু দিন পর্য্যন্ত চলিলে পর, উভয় পক্ষ যেই হউক না কেন, এক সময়ে শান্তি আসিবেই। পৌরসমাজ ও শত্রুপক্ষের মধ্যে যে সন্ধিপত্র দ্বারা শান্তি সংস্থাপিত হইত, তাহারই নাম হইল চার্টার (Charter) বা অধিকারপত্র। পৌর অধিকারপত্রগুলি পৌরবর্গ ও ভূস্বামীর মধ্যে সন্ধিপত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এ বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ঘটিয়াছিল। দেশের সমস্ত পৌরসমাজ সম্মিলিত হইয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহা নহে। তবে সাধারণ পৌরবর্গের অবস্থা প্রায় সর্ব্বত্র একই রূপ ছিল, সকলের একই রূপ বিপদ্, একই রূপ অত্যাচারে সকলে প্রপীড়িত হইতেছিল। প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষাকল্পে সকলে একই রূপ উপায় সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং প্রায় একই সময়ে সকলে এই সকল উপায় প্রয়োগ করিয়াছিল। দৃষ্টান্তের দ্বারাও কতকটা ফল ফলিয়া থাকিতে পারে, দুই একটি পুরীর কৃতকার্য্যতায় অন্যান্য সকলে উৎসাহিত হইয়া থাকিতে পারে। কখনও

কখনও অধিকারপত্রগুলিও একই আদর্শে রচিত দেখা যায়; যথা—নোয়াইয়োঁ-পুরীর অধিকার-পত্রের আদর্শে বোবে, সঁ্যা কাঁত্যাঁ প্রভৃতি নগরের অধিকারপত্র রচিত। তথাপি দৃষ্টান্তের প্রভাব যতখানি কাজ করিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে ততখানি করে নাই। তখন দেশের এক অংশ হইতে অন্য অংশে গমনাগমন অত্যন্ত কঠিন ও বিরল ছিল, এবং লোকশ্রুতি কেবল অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্টভাবে মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য ভাসিয়া আসিত, আবার মিলাইয়া যাইত; আমার মনে হয়, এই বিদ্রোহের ব্যাপকতার কারণ অবস্থাসাদৃশ্য এবং একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ব্যাপক আন্দোলন। প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা ঘটিয়াছিল বলিয়াই ইহাকে ব্যাপক আন্দোলন বলিতেছি; ইহার পশ্চাৎ একটা সম্মিলিত চেষ্টা কিম্বা পরামর্শ কিছুই ছিল না; এ আন্দোলনের সমস্ত ঘটনাই বিশেষ বিশেষ স্থান কালে আবদ্ধ; প্রত্যেক পুরী নিজেরই স্বার্থরক্ষার জন্য নিজ নিজ ভূস্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে; এবং এ বিদ্রোহের সমস্ত ব্যাপার সেই সেই পুরীর সন্নিধিতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে।

এই সংঘর্ষের মধ্যে অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। শুধু যে বিজয়লক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া কখনও এ পক্ষ, কখনও অপর পক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা নহে; যখন শান্তিস্থাপন হইয়া গেল বলিয়া মনে করা গেল, উভয় পক্ষ যখন অধিকারপত্র শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইলেন, তখনও আবার সর্ব্ববিধ উপায়ে ইহার সর্ত্ত অমান্য করিবার ও ফাঁকি দিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। এই সংঘর্ষের নানা ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মধ্যে ভূপতিবৃন্দের প্রভাব নিতান্ত সামান্য ছিল না। পরে যখন রাজতন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিব, তখন এ কথা বিস্তার করিয়া বলিব। পৌরসমাজের স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাসে ভূপতিগণের সহায়তা সম্বন্ধে

অনেকে বিস্তর প্রশংসাবাদ করিয়াছেন; অনেকে আবার এ সহায়তার যথাযথ মূল্য দিতেও প্রস্তুত নহেন; আবার কেহ কেহ ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না। আমি এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিব যে, রাজশক্তি এই সংঘর্ষে অনেকবার হস্তক্ষেপ করিয়াছে, কখনও বা পৌরবর্গের নিমন্ত্রণে, কখনও বা ভূস্বামীদিগের নিমন্ত্রণে; অনেক সময়ে সে ক্রমান্বয়ে পরস্পরবিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে; কখনও এক নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছে, কখনও অন্য নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছে; সে নিয়তই উদ্দেশ্য, সংকল্প ও আচরণ পরিবর্ত্তন করিয়াছে; কিন্তু মোটের উপর এ কথা বলিব যে, সে অনেক কাজ করিয়াছে, এবং তাহার কার্য্যের কুফল অপেক্ষা সুফলই অধিক।

এই সমস্ত ভাগ্যপরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, ঘন ঘন অধিকারপত্রের সর্ত্তভঙ্গ সত্ত্বেও, দ্বাদশ শতাব্দীতে পৌরসঙ্ঘগুলির স্বাতন্ত্র্যসাধন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। সমগ্র ইউরোপ, এবং বিশেষ করিয়া ফ্রান্স, এক শতাব্দী ধরিয়া বিদ্রোহবিপ্লবে আচ্ছন্ন ছিল, এখন তাহার স্থানে সর্ব্বত্রই দেখা দিল—কতকগুলি চার্টার বা অধিকারপত্র; কোনটির বা সর্ত্ত কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে পৌরস্বাতন্ত্র্যের অনুকূল, কোনটির বা কিঞ্চিৎ অল্পপরিমাণে। পৌরসঙ্ঘগুলি অল্পাধিক-পরিমাণে নির্বিরোধে এই সকল অধিকার ভোগ করিতে লাগিল। পৌরস্বাতন্ত্র্য এখন একটা বাস্তব ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইল, পৌরাধিকার এখন প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

এই বৃহদ্ব্যাপারের অব্যবহিত ফল কি হইল এবং ইহার ফলে সাধারণ সমাজের মধ্যে পৌরবর্গের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইল, এখন তাহাই দেখা যাউক।

প্রথমতঃ, অন্ততঃ প্রারম্ভকালে এ ব্যাপারের দরুন দেশের সাধারণ

শাসনতন্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির সহিত পৌরবর্গের সম্বন্ধ কিছুই পরিবর্ত্তিত হইল না; তাহারা পূর্ব্বেও রাষ্ট্রশাসনব্যাপারে যেরূপ হস্তক্ষেপ করিত না, পরেও সেইরূপ। তাহাদের যাহা কিছু কারবার, সমস্তই স্থানীয়, নিজ নিজ ভূস্বামীর এলাকার মধ্যে আবদ্ধ। তবে এক বিষয়ে এ কথাটা খাটে না; পৌরবর্গের সহিত রাজগণের একটা সম্বন্ধস্থাপনের সূত্রপাত হইল। কখনও কখনও পৌরগণ ভূস্বামীর বিরুদ্ধে রাজার সহায়তা আমন্ত্রণ করিত; কখনও বা ভূস্বামী যখন একটা অধিকারপত্র অঙ্গীকার করিতেছেন, পৌরগণ তখন রাজার নিকট হইতে সেটি যাহাতে সুরক্ষিত হয়, এই মর্ম্মে একটা প্রতিশ্রুতি লইতেন। কোন সময়ে আবার ভূস্বামীই পৌরবর্গের সহিত বিবাদে রাজার নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেন। এইরূপে নানা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক পক্ষ বা অন্য পক্ষের আহ্বানে রাজা এই বিবাদে অনেকবার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; ইহার ফলে পৌরবর্গের সহিত রাজার প্রায়ই একটা না একটা সম্বন্ধ এবং অনেক সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। এই সম্বন্ধের দ্বারাই পৌরগণ রাষ্ট্রতন্ত্রের কেন্দ্রের সংস্পর্শে আসিল এবং সাধারণ শাসনতন্ত্রের সহিত তাহাদের একটা সংযোগ ঘটিল।

এক একটি পৌরসমাজ নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও এই স্বাতন্ত্র্যলাভের ফলে একটা নূতন ব্যাপক জনশ্রেণী সৃষ্ট হইল। বিভিন্ন পুরীর পৌরবর্গ মিলিত হইয়া একটা বৃহৎ সমাজ বন্ধন করে নাই সত্য, কিন্তু সমস্ত দেশ এমন একদল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, যাহাদের অবস্থা এক, স্বার্থ এক, রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার প্রণালী এক। এই সমস্ত লোকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঐক্যবন্ধন ঘটিয়া বুর্জ্জোয়াসী (Bourgeoisie) বা পৌরসমাজ নামে একটা ব্যাপক সমাজ যে গড়িয়া উঠিবে, ইহা ত অবশ্যম্ভাবী। পৌরবর্গের স্থানীয় পৌরস্বাতন্ত্র্যলাভের

অবশ্যম্ভাবী ফল হইল, পৌরসমাজ বলিয়া একটা বৃহৎ সামাজিক শ্রেণীর গঠন।

এ কথা মনে করিবেন না যে, এই পৌরসমাজ এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, সেই সময়েও তাহাই ছিল। ইহার অবস্থাই যে শুধু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নহে; যে উপাদান লইয়া ইহা গঠিত, সেই উপাদানই তখন বিভিন্ন ছিল; দ্বাদশ শতাব্দীতে পৌরসমাজ কেবল বণিক্ কিম্বা নগরবাসী সামান্য ভূস্বামী ও গৃহস্বামী লইয়া গঠিত ছিল। তিন শতাব্দী পরে পৌরসমাজের মধ্যে উপরোক্ত শ্রেণী ব্যতীত উকীল, বৈদ্য, নানা শ্রেণীর পণ্ডিত, এবং স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃগণ অন্তর্ভুক্ত হইলেন। পৌরসমাজ ক্রমে ক্রমে নানা বিভিন্ন উপাদান লইয়া গঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ পৌরসমাজের ইতিহাসে ইহার এই ক্রমপরম্পরা বা উপাদান-বৈচিত্র্যের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। যেখানেই পৌরসমাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেইখানেই যেন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সব সময়ে একই উপাদানে ইহা গঠিত। এ ধারণা কিন্তু একেবারে অযৌক্তিক। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ইহার যে এই গঠনবৈচিত্র্য, তাহার মধ্যেই বোধ হয়, ইহার ভাগ্যবিবর্ত্তনের রহস্য পাওয়া যাইবে। যে পর্য্যন্ত পৌরসমাজে রাজপুরুষ বা সাহিত্যিকবর্গ প্রবেশলাভ করে নাই, ষোড়শ শতাব্দীতে এ সমাজ যে ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল, যতদিন পর্য্যন্ত সে রূপান্তর ঘটে নাই, ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রমধ্যে এ সমাজ সেরূপ গণ্যতাও লাভ করে নাই, সেরূপ প্রকৃতিও লাভ করে নাই। ইহার ভাগ্যবিবর্ত্তনের ইতিহাস বুঝিতে হইলে, ইহার ক্রোড়ের মধ্যে কেমন করিয়া নূতন নূতন ব্যবসায়, পদমর্য্যাদাসম্পন্ন নূতন নূতন নৈতিক শক্তি, এবং একটা নূতন চিন্তারাজ্য গড়িয়া উঠিল, তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। আমি পুনরায় বলি যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে পৌরসমাজের

অন্তর্ভুক্ত ছিল কতকগুলি সামান্য বণিক্, যাহারা বাহিরে ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন করিয়া নগরের মধ্যে আসিয়া বিশ্রাম করিত; এবং কতকগুলি গৃহস্বামী ও ক্ষুদ্র ভূস্বামী, যাহারা পল্লী ছাড়িয়া নগরে আসিয়া বাস করিত। এই হইল ইউরোপীয় পৌরসমাজের প্রথম উপাদান।

পৌরসমাজের স্বাতন্ত্র্যলাভের তৃতীয় পরিণাম হইতেছে বিভিন্ন জনশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের কাহিনীতে আধুনিক ইতিহাস পরিপূর্ণ। সমাজভুক্ত বিভিন্ন জনশ্রেণীর সংঘর্ষ হইতেই আধুনিক ইউরোপের উৎপত্তি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অন্যত্র এই সংঘর্ষের ফল অন্যরূপ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এশিয়াতে একশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া অন্যান্য শ্রেণীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, শ্রেণী সেখানে জাতিতে পরিণত হইয়াছে, এবং সমাজ সেখানে জড়ত্ব লাভ করিয়াছে। ভগবানের অনুগ্রহে ইউরোপে এরূপ কিছুই ঘটে নাই। কোন এক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীকে পরাজয় করিয়া বশ্যতা গ্রহণ করাইতে পারে নাই। এখানে সংঘর্ষের ফলে জড়ত্ব না ঘটিয়া উন্নতিই ঘটিয়াছে। প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ, তাহারা যে প্রয়োজনের তাড়নায় কখনও বা সংগ্রাম করিতে, কখনও বা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে; তাহাদের রুচি, লক্ষ্য ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য; তাহাদের প্রত্যেকেরই একাধিপত্য লাভের বাসনা অথচ বাসনা চরিতার্থ করিবার পক্ষে ক্ষমতাভাব;—এই সমস্ত কারণের একত্র সমবায়ে ইউরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণী কেবলই পরস্পর সংগ্রাম করিয়াছে, তাহারা পরস্পরকে ঘৃণা করিয়াছে; অবস্থাভেদ, লক্ষ্যভেদ এবং রীতিনীতিভেদের দরুন তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ সঞ্জাত হইয়াছে; এবং তৎসত্ত্বেও তাহারা ক্রমশঃই পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া

হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পরিশেষে আদানপ্রদানও ঘটিয়াছে। প্রত্যেক ইউরোপীয় জাতির ক্রোড়ে ক্রমশঃ একটা সার্ব্বজনীন ভাবের উৎপত্তির বিকাশ ঘটিয়াছে, জাতীয় জীবনে সমস্ত বিরোধবৈচিত্র্যের উর্দ্ধে ধ্যান-ধারণা-ভাবনার একটা সমতা গড়িয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ্রান্সে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট নৈতিক পার্থক্য ছিল; তথাপি মিশ্রণ ক্রিয়া অগ্রসর হইতেছিল; ইহা নিঃসন্দেহ যে, তখন বাস্তবিকপক্ষে ফরাসীজাতি বলিয়া একটা বস্তু দাঁড়াইয়া গিয়াছিল: এই জাতীয় সত্তা কোন একটা বিশেষ শ্রেণী লইয়া গঠিত নহে; সমস্ত সামাজিক শ্রেণীই ইহার অন্তর্ভুক্ত; ইহার মধ্যে সকলেই একটা সার্ব্বজনীন ভাবে অনুপ্রাণিত, এবং সামাজিক জীবনে এই ভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত। এই ভাবের নাম স্বাজাত্যবোধ। এইরূপে বৈচিত্র্য, বিদ্বেষ ও সংগ্রামের মধ্য হইতে আধুনিক ইউরোপে জাতীয় ঐক্যের জন্ম হইল। এই জাতীয় ঐক্যই এখন ইউরোপীয় জীবনের বিশিষ্ট ধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম ক্রমশঃই পরিপুষ্ট ও মার্জ্জিত হইয়া চলিতেছে, দিনে দিনে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য লাভ করিতেছে।

আমরা যে সমাজবিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিয়াছি, এইগুলিই হইল তাহার বাহ্য সামাজিক পরিণাম। এখন ইহার নৈতিক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। দেখা যাউক, পৌরগণের অন্তর্জীবনে ইহার ফলে কি পরিবর্ত্তন ঘটিল; নূতন অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের নৈতিক জীবন কি ভাবে রূপান্তরিত হইল।

শুধু দ্বাদশ শতাব্দীতে নহে, পরবর্ত্তী কালেও দেশের সাধারণ রাষ্ট্রতন্ত্র ও দেশের সাধারণ স্বার্থের সহিত পৌরবর্গের সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া একটা বিষয় বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে হইতেছে দেশের সাধারণশাসনতন্ত্র সম্পর্কে পৌরবর্গের অসাধারণ ভীরুতা, সঙ্কোচ ও

বিনয়নম্রতা। এ ক্ষেত্রে তাহারা অল্পেতেই অতি সহজে সন্তুষ্ট। এ ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যথার্থ রাজনৈতিক ভাবের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হইলেই মানুষ প্রভাব খাটাইতে চায়, সংস্কার সাধন করিতে চায়, শাসনাধিকার লাভ করিতে চায়। এ সময়ের পৌরবর্গের মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবারও সাহস দেখা যায় না, মহৎ আকাঙ্ক্ষারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

রাজনীতিক্ষেত্রে কেবল দুই কারণে মহৎ আকাঙ্ক্ষা বা স্বাধীন চিন্তার উদ্ভব হইতে পারে। হয় নিজের পদমর্য্যাদা ও পরাক্রম সম্বন্ধে বেশ একটা বড় রকম ধারণা থাকা চাই, বহু জনপদের বহু লোকের ভাগ্যাভাগ্য আমার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতেছে, এইরূপ বোধ থাকা চাই—না হয় ব্যক্তিগতভাবে নিজের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অন্তরের মধ্যে অনুভব করা চাই ; আমি যে কোনরূপে কাহারও অধীন নই, আমার ভাগ্যনিয়তি আমার নিজের ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। এই দুই অবস্থা হইতেই কেবল মহৎ আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হইতে পারে, স্বাধীন চিন্তার সাহস আসিতে পারে, বৃহৎ ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার ও বড় বড় কার্য্যফল লাভ করিবার স্পৃহা জন্মিতে পারে।

মধ্যযুগের পৌরবর্গের জীবনে এই দুই অবস্থার কোনটিই মিলে না। আপনারা এই মাত্র দেখিলেন যে, পৌরগণের যে স্বমর্য্যাদাবোধ, তাহা কেবল পুরীর প্রাচীরের মধ্যেই আবদ্ধ; পুরীর বাহিরে বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহাদের কোন প্রভাবই দেখা যায় না। এ দিকে আবার তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাবও অধিক পরিমাণে থাকা সম্ভব ছিল না। বৃথাই তাহারা ভূস্বামীদিগকে পরাজিত করিল, বৃথাই তাহারা অধিকারপত্র আদায় করিল। নগরবাসী নাগরিক নিকটবর্ত্তী

যে কোন সামান্য ভূস্বামীর সহিত তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রত্বই অনুভব করিত। ভূস্বামীর মন যে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধে সঞ্জীবিত, তাহা একজন সামান্য নাগরিকের মনে পরিস্ফুটিত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। যে পৌরস্বাতন্ত্র্যের সে অংশভাগী, তাহা তাহার নিজের একস্ব নহে, অন্যান্য পৌরগণের সহিত একত্র মিলিয়া সে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছে, সকলের সহিত মিলিত হইয়া তবে সে স্বাধীনতা সে ভোগ করিতে পারে। এই সহায়তা তাহার ইচ্ছায়ত্ত নহে, নানারূপে নিজের ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব করিয়া, তবে এ সহায়তা লাভ করা যায়। এই কারণেই শুধু দ্বাদশ শতাব্দীর নহে, পরবর্ত্তী কালেরও পৌরগণের মধ্যে এতটা সংযমসঙ্কোচ, এতটা সাহসাভাব, এই জন্যই যেখানে তাহাদের আচরণে দৃঢ়তা দেখা যায়, সেখানেও ভাষার বিনয়নম্রতা। কোন বৃহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে তাহাদের একেবারে প্রবৃত্তি ছিল না; এবং যখন অদৃষ্টের প্রেরণায় তাহাদিগকে এইরূপ কোন ব্যাপারে বাধ্য হইয়া লিপ্ত হইতে হইত, তাহারা তখন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িত ও অশান্তি বোধ করিত। দায়িত্বের ভার তাহাদিগের পক্ষে এক বিষম ঝঞ্ঝাট হইত, তাহারা যেন স্বকীয় কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, এইরূপ বোধ করিত এবং যথাশীঘ্র পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চাহিত। এই জন্য তাহারা সামঞ্জস্য করিয়া যথাসম্ভব দাবী কমাইয়া সন্ধিবন্ধন করিত। এই জন্যই ইউরোপীয় ইতিহাসে, বিশেষতঃ ফ্রান্সের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পৌরসমাজ অন্য পক্ষের হস্তে শ্রদ্ধা পাইয়াছে, বিচারবিবেচনা পাইয়াছে, তোষামোদ পাইয়াছে, এমন কি, সম্মানও পাইয়াছে; কিন্তু কখনও কেহ তাহাকে ভয় করে নাই। সে যে একটা বিরাট্ শক্তির আধার, রাজনৈতিক শক্তির এক বিপুল ভাণ্ডার, এ ধারণা সে কখনও জন্মাইতে পারে নাই। আধুনিক পৌরসমাজের এই দৌর্ব্বল্যে বিস্মিত

হইবার কিছুই নাই। এই দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ, ইহার উৎপত্তি ও স্বাতন্ত্র্যলাভের ইতিহাসেই নিহিত। লোকসাধারণের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমুদ্গম, ব্যাপকভাবে ও দৃঢ়তার সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিবার ক্ষমতা, মানুষ বলিয়াই মানুষের যে একটা গৌরব, তাহা অনুভব করিবার শক্তি, মানুষের আত্মশক্তিবোধ—এ সমস্ত ভাব ও বৃত্তি ইউরোপে একেবারে আধুনিক ব্যাপার, সম্পূর্ণরূপে আধুনিক সভ্যতার ফল। যে সমুজ্জ্বল বিশ্বজনীনতার আদর্শ আধুনিক সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ এবং যাহার প্রভাবে দেশের শাসনব্যাপারে জনসাধারণের মতামত এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা হইতেই এগুলির উৎপত্তি।

এদিকে আবার সে কালের পৌরগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানীয় স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার্থে সংগ্রাম করিয়া যে পরিমাণ উদ্যম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যগুণ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাঁহাদের সঙ্কল্পসাধনের পথে বাধাবিপত্তি এত ছিল যে, তাহা অতিক্রম করিতে তাঁহাদিগকে অভূত-পূর্ব্ব সাহস দেখাইতে হইয়াছে। আজকাল দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পৌরজীবন সম্বন্ধে একটা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা প্রসারলাভ করিয়াছে। আপনারা সার ওয়াল্টার স্কটের 'কোয়েণ্টিন ডরোয়ার্ড' নামক উপন্যাসে লীজ নগরীর পৌরপ্রধানের বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন; সেখানে তাহাকে রীতিমত একটি প্রহসনের নাগরিক করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে—সে স্থূলকায়, আরামপ্রিয়, না আছে তাহার অভিজ্ঞতা, না আছে সাহস, কেবল বিনা আয়াসে নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন কাটাইবার জন্যই সে সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে সময়ে পৌরপ্রধানদের চেহারা অন্যরূপ; তাঁহাদের বক্ষ সদাই লৌহবর্ম্মে আবৃত, হস্তে টাঙ্গি; তাঁহাদের জীবন যেমন ঝটিকাসঙ্কুল, তেমনি শৌর্য্যপরায়ণ; যে ভূস্বামীদিগের বিরুদ্ধে

তাঁহারা সংগ্রাম করিতেন, তাঁহাদের মতই তাঁহারা শক্ত সমর্থ। এই সকল বিপদ্‌জালের মধ্যেই, বাস্তব জীবনের নানা বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই তাঁহারা এই পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন; আধুনিক কালের শান্তিময় জীবনযাত্রায় তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পৌরস্বাতন্ত্র্যের এই সকল সামাজিক ও নৈতিক পরিণাম কোনটিই দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করে নাই; পরবর্ত্তী শতাব্দীতেই ইহারা পুষ্টভাবে দেখা দেয়। এ পরিণতির বীজ কিন্তু পুরীগুলির মৌলিক অবস্থান এবং স্বাতন্ত্র্যলাভের প্রণালীর মধ্যেই নিহিত। এই জন্যই আমি দুইটি বিষয়ে বিশেষ করিয়া আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম। এখন দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরজীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাউক। দেখা যাউক, পুরীর শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, পৌরগণের পরস্পর সম্বন্ধ কোন্ কোন্ নীতি ও তথ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত।

আপনারা স্মরণ করিবেন যে, রোমীয় সাম্রাজ্য আধুনিক জগৎকে যে পৌরপদ্ধতি দান করিয়া গিয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার সময় আমি বলিয়াছিলাম যে, রোমীয় সাম্রাজ্য মূলতঃ কতকগুলি পূর্ণরাজশক্তি-সম্পন্ন পৌরসঙ্ঘের এক বৃহৎ সমষ্টি। প্রত্যেক পুরীর মূলতঃ রোমের মতই স্বতন্ত্র সত্তা ছিল; তাহারা এক সময়ে এক একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন গণতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল; তাহরা যুদ্ধ করিত, সন্ধি করিত এবং নিজেদের স্বাধীন বুদ্ধি অনু-সারে নিজেদের শাসনকার্য্য নিজেই চালাইত। যে পরিমাণে তাহারা রোমীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদের রাজাধিকার, সন্ধিবিগ্রহ করিবার অধিকার, বিধি প্রণয়ন ও কর স্থাপনের অধিকার রোমের হাতে আসিয়া পড়িল। তখন কেবল রোমই একমাত্র রাজস্বাধিকারসম্পন্ন পুরী রহিল; এবং অন্যান্য পৌরসঙ্ঘগুলি

রাজশক্তি হারাইয়া রোমের শাসনভুক্ত প্রজাসঙ্ঘে পরিণত হইল। পৌরব্যবস্থার এইরূপে প্রকৃতিপরিবর্ত্তন ঘটিল। পৌরপদ্ধতি এখন আর স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্র রহিল না, কেন্দ্রশক্তির অধীন একটা শাসনপ্রণালীমাত্রে পরিণত হইল।

রোম সাম্রাজ্যের শাসনে এই একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। পৌরপদ্ধতি শাসনপ্রণালীমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া কেবল স্থানীয় ব্যাপার ও পৌর স্বার্থের শাসনসংরক্ষণের ভার পাইল। রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃ-পতনকালে পুরী ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির এই অবস্থা ছিল। বর্ব্বরযুগের বিশৃঙ্খলার মধ্যে, সমস্ত বস্তু, সমস্ত তত্ত্বই লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল; পূর্ণ-রাজশক্তি ও খণ্ডশাসনাধিকারের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে দিকে আর কেহ লক্ষ্য করিল না। প্রয়োজনের তাড়নায় সমস্ত ব্যাপার স্থানকালপাত্রভেদে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। অবস্থা বা ঘটনানুসারে প্রত্যেক স্থানে কোথাও বা একটা রাজশক্তি, কোথাও বা একজন শাসনকর্ত্তার আবির্ভাব হইল। নগরগুলি যখন কতকটা স্থিরতা আনিবার জন্য বিদ্রোহ করিয়া উঠিল, তখন তাহারা নিজহস্তে রাজশক্তি আরোপ করিল। তাহারা যে পৌরসেনাগঠন, যুদ্ধের জন্য করস্থাপন এবং শাসনকর্ত্তানিয়োগের অধিকার গ্রহণ করিল, তাহা কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুসরণ করিবার জন্য বা আত্মমর্য্যাদাবোধ চরিতার্থ করিবার জন্য করে নাই, ভূস্বামীদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার উপায় সংগ্রহের জন্যই করিয়াছিল। পুরীর আভ্যন্তরীণ শাসনে অধিকার স্থাপন আত্মরক্ষারই উপায়স্বরূপ ছিল। এইরূপে পৌরতন্ত্রের যে রাজ-ক্ষমতা রোমের দিগ্বিজয়ে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। নগরগুলি আবার স্বরাট্‌ হইয়া উঠিল। পৌরসমাজের স্বাতন্ত্র্য লাভের ইহাই হইল রাজনৈতিক সার্থকতা।

ইহা হইতে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, এই রাজশক্তি পরিপূর্ণ রাজশক্তি। পৌরব্যাপারে বাহিরের রাজশক্তির অধিকার কখনই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই; বরাবরই তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও ভূস্বামী পৌরশাসকবর্গের সহযোগিতায় বিচারাদি করিবার জন্য নগরে একজন করিয়া শাসনকর্তা পাঠাইবার অধিকার রাখিয়া দিতেন; কখনও বা তিনি কিছু রাজস্ব আদায় করিবার অধিকার রাখিতেন; কোন স্থানে বা তিনি একটা কর আদায় করিতেন। কখনও বা রাষ্ট্রপতি অর্থাৎ দেশের রাজা পৌরসমাজের উপর বাহির হইতে রাজশক্তি পরিচালনা করিতেন।

পৌরসঙ্ঘগুলিও ফিউড্যাল্ পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশলাভ করে; তাহাদেরও প্রজা ছিল এবং তৎসম্পর্কে তাহারা ভূস্বামী; এই অধিকারের বলে ভূস্বামীর যে সমস্ত রাজশক্তি, তাহারাও কতক পরিমাণে তাহার অংশভাগী ছিল। এই কারণে তাহাদের ফিউড্যাল্ অধিকার এবং বিদ্রোহলব্ধ নূতন অধিকার, এই উভয়বিধ অধিকার মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গেল; ফলে তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার দ্বিগুণীকৃত হইল।

এ বিষয়ে যৎসামান্য প্রমাণ যাহা পাওয়া যায়, তাহার সাহায্যে অন্ততঃ প্রাচীন কালে পৌরশাসনপদ্ধতি কিরূপে পরিচালিত হইত, তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। নগরের অধিবাসিসমষ্টি লইয়া পৌর-সম্মিলনী গঠিত হইত। যে কেহ পৌরশপথ গ্রহণ করিয়াছে (পুরী-প্রাচীরের মধ্যে যে কেহ বাস করে, সকলকেই এই শপথ গ্রহণ করিতে হইত), সকলে ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সাধারণ পৌরসম্মিলনীতে আহূত হইত। সেইখানেই তাহারা পৌরশাসনকর্তা নির্ব্বাচন করিত। শাসনকর্তৃ-নিয়োগ হইয়া গেলে সম্মিলনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত, এবং তখন হইতে

শাসনকর্তারাই প্রায় একক, কতকটা যথেচ্ছভাবে শাসন-কার্য্য চালাইত। আবার একটা নূতন নির্ব্বাচন বা সাধারণ লোকের দাঙ্গাহাঙ্গামা ব্যতীত তাহাদিগকে দমন করিবার অন্য কোন উপায় ছিল না।

এখন দেখিলেন যে, পুরীর আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা মোট দুইটি সরল উপাদানে গঠিত; অধিবাসিবর্গের সাধারণ সম্মিলনী, এবং যথেচ্ছ শাসনাধিকারসম্পন্ন শাসনতন্ত্র, যাহা দাঙ্গাবিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত নহে। তখনকার সমাজের যেরূপ রীতিনীতি ও শিক্ষাদীক্ষা, তাহাতে একটা স্থায়ী সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা গঠন করা অসম্ভব ছিল। নগরের অধিকাংশ অধিবাসীই এরূপ অশিক্ষিত, পশুপ্রকৃতি ও ক্রূরমতি ছিল যে, তাহাদিগকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। পূর্ব্বে যেমন ভূস্বামিবর্গের সম্পর্কে পৌরবর্গের জীবনে কোন শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না, অল্পকাল পরে পুরীর অভ্যন্তরেই সেইরূপ অশান্তি-উপদ্রব ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটা উচ্চশ্রেণীর পৌরসমাজ গড়িয়া উঠিল। আপনারা সহজেই ইহার কারণ বুঝিতে পারিবেন। তখনকার কালের সামাজিক অবস্থা ও লৌকিক মনোগতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্পিসম্প্রদায় গঠিত হইল। এই সমস্ত সম্প্রদায় আইন অনুসারে এক একটি স্বরাট্ সঙ্ঘরূপে পরিগণিত হইল। এইরূপে পৌরসমাজে অধিকারবৈশিষ্ট্য প্রবেশ করিয়া নানারূপ বৈষম্যের সৃষ্টি করিল। অল্পকালের মধ্যেই প্রত্যেক নগরে একদিকে কতকগুলি ধনী ও গণ্যমান্য নাগরিকের এবং অপর দিকে বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর আবির্ভাব হইল। এই শ্রমজীবি-সম্প্রদায় নিম্নপদস্থ হইলেও পৌরব্যাপারে ইহাদের প্রভাব একেবারে নগণ্য ছিল না। পৌরসমাজ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল;—একদিকে উচ্চপদস্থ ভদ্র সম্প্রদায়, অপর দিকে কুশিক্ষা-কদাচারবিশিষ্ট সাধারণ

জনসম্প্রদায়। ভদ্র পৌরসমাজের দুই দিকে বিপদ্;—একদিকে নিম্ন-শ্রেণীগণকে শাসনে রাখার কঠিন ভার, অপর দিকে পুরীর পূর্ব্বতন ভূস্বামীর পক্ষ হইতে অনবরত পুরীমধ্যে পুনরায় ক্ষমতাবিস্তারের চেষ্টা। শুধু ফ্রান্সে নহে, সমস্ত ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিল। এই জন্যই অধিকাংশ ইউরোপীয় জাতির মধ্যে, বিশেষতঃ ফ্রান্সে পৌরসঙ্ঘগুলি আশানুরূপ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারে নাই। নগরের মধ্যে অনবরত দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ চলিতে থাকিল;—একদিকে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটা অসংযত, উদ্ধত, বিচার-বিবেচনাশূন্য গণতন্ত্রমুখী ভাব; অপর দিকে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ইহারই ফলে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কেই হউক, প্রাচীন ভূস্বামী সম্পর্কেই হউক বা পুরীর অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনব্যাপারেই হউক, একটা সঙ্কোচ ও সাহসাভাব দেখা দিল, তাহারা কোন বিষয়ে জোর করিতে সাহস করে না, সর্ব্বদাই সামঞ্জস্যের খাতিরে নিজের দাবী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, সর্ব্বদাই অপর পক্ষের সহজে তুষ্টিবিধানের জন্য ব্যগ্র। সুতরাং পৌরসঙ্ঘগুলি যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বিশেষ প্রভাবশালী হইবে না, ইহা ত অবশ্যম্ভাবী।

দ্বাদশ শতাব্দীতে এ সমস্ত পরিণাম দেখা দেয় নাই; তথাপি পৌরবিদ্রোহের প্রকৃতি ও সূচনাপ্রণালী এবং পৌরসমাজের গঠনোপাদান পর্য্যালোচনা করিলে এই সমস্ত পরিণামের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতে পারে।

আমার মনে হয়, পৌরবিদ্রোহ, পুরীগুলির স্বাতন্ত্র্যলাভ এবং পুরীর আভ্যন্তরীণ শাসনপদ্ধতি—এ সমস্ত ব্যাপারের যথার্থ প্রকৃতি ও পরিণাম এইরূপ। আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে চাই যে, আমি সাধারণ ভাবে যে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলাম, বাস্তবিক

ব্যাপার কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল ও বিচিত্র। ইউরোপের পৌর ইতিহাসে অনেক বৈচিত্র্য-বৈষম্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইটালী ও দক্ষিণ-ফ্রান্সে রোমীয় পৌরব্যবস্থার প্রাধান্য ছিল; সেখানে উত্তর-ফ্রান্সের মত অতটা বৈচিত্র্য বা বৈষম্য দেখা যায় না, রোমীয় পারম্পর্য্য-গুণেই হউক বা লোকের অবস্থার উৎকর্ষজন্যই হউক, সেখানে সামাজিক ব্যবস্থা আরও উৎকৃষ্ট ছিল। উত্তরে সামাজিক জীবনে ফিউড্যাল্ পদ্ধতিরই প্রাধান্য ছিল; ভূস্বামীদিগের সহিত সংগ্রামের প্রয়োজনেই সেখানে সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত। দক্ষিণের পুরীগুলি নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনেই অধিক ব্যস্ত ছিল; তাহারা কেবল স্বাধীন গণতন্ত্রে পরিণত হইবার কথাই ভাবিত। উত্তরের পুরীগুলির নিয়তি ক্রমশঃই অপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। জার্ম্মানী, স্পেন ও ইংলণ্ডের পুরীগুলির দিকে তাকাইলে আরও অন্যান্য প্রভেদ দেখিতে পাইব। সে সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ের আমি এখানে অবতারণা করিব না; সভ্যতার ইতিহাসে অগ্রসর হইতে হইতে তাহার মধ্যে কতকগুলি উল্লেখ করিব। সমস্ত বস্তুই মূলে একাকার থাকে, পুষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বৈচিত্র্য দেখা দেয়। তখন আবার একটা নূতন পরিণতির সূচনা হয়, যাহাতে সমাজ একটা স্বাধীন ও সর্ব্বসমঞ্জস ঐক্যের দিকে ধাবিত হয়। এই ঐক্যই মানব-জাতির সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত আকাঙ্ক্ষার গৌরবোজ্জ্বল পরিণাম।

অষ্টম অধ্যায়

এখন আমাকে একবার ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের সমগ্র সম্পূর্ণ নক্‌সাখানি আপনাদিগের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত আমরা যে সকল যুগের আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কোন জটিলতা নাই; তাহাদিগকে বুঝিবার জন্য দূর ভবিষ্য যুগের ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক হয় নাই; তাহাদের অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান ও চিন্তাচেষ্টার পরিণাম অব্যবহিত কালেই সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন আমরা যে সকল যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তাহাদের গৌণতম ও সুদূরতম পরিণামের সহিত সংযুক্ত না করিয়া দেখিলে তাহাদিগের ইতিহাস আমাদের পক্ষে বোধগম্যও হইবে না, চিত্তাকর্ষকও হইবে না। এরূপ একটা বিস্তৃত বিষয়ের আলোচনায় এমন অনেক মুহূর্ত্ত আসে, যখন আমরা সম্মুখের পথটা দেখিয়া না লইয়া অগ্রসর হইতে চাই না; কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় আসিলাম, কোন্ লক্ষ্যের দিকেই বা যাইতেছি, সবটুকু তখন আমরা বুঝিয়া লইতে চাই। এখন আমাদের সেই অবস্থা। যে যুগের আলোচনায় আমরা এখন প্রবৃত্ত হইব, আধুনিক যুগের সহিত তাহার সম্বন্ধটুকু বুঝিয়া না লইতে পারিলে তাহার প্রকৃতিও বুঝা যাইবে না, বিশিষ্ট তাৎপর্য্যও বুঝা যাইবে না।

ইউরোপীয় সভ্যতার যে সকল মৌলিক উপাদান, আমাদের আলোচনার মধ্যে প্রায় সমস্তগুলিরই সন্ধান ও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "প্রায়" বলিলাম; কারণ, এখনও আমি রাজতন্ত্রের উল্লেখ করি নাই। রাজতন্ত্রের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই। রাজতন্ত্র তখনই প্রথম যথার্থভাবে গঠিত হয় ও

আধুনিক ইউরোপীয় সমাজে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসে। এইজন্য ইতিপূর্ব্বে রাজতন্ত্রের আলোচনা করি নাই। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিব। এই রাজতন্ত্র ব্যতিরেকে ইউরোপীয় সভ্যতার সমস্ত উপাদানগুলিই একে একে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। আপনারা ভূস্বামিতন্ত্রমূলক, আভিজাত্য, যাজকতন্ত্র, পৌরতন্ত্র, সমস্তগুলিরই উদ্ভব লক্ষ্য করিয়াছেন; ঐ সকল তন্ত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানাদিরও উদ্ভব দেখিয়াছেন; এবং শুধু প্রতিষ্ঠান নহে, তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী তত্ত্ব ও নীতির প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছেন। যথা, ভূস্বামিতন্ত্রের আলোচনাকালে আপনারা আধুনিক পরিবার ও পারিবারিক জীবনের উদ্ভব কিরূপে হইল, দেখিয়া লইয়াছেন; ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ভাব কিরূপে এত প্রবল ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল, তাহাও বুঝিয়া লইয়াছেন। তেমনি চর্চ্চের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া দেখিয়াছেন, কেমন করিয়া প্রথমে একটি বিশুদ্ধ ধর্ম্মসমাজ গড়িয়া উঠিল, সাধারণ সমাজের সহিত তাহার কিরূপ সম্পর্ক ঘটিল, কেমন করিয়া ক্রমশঃ যাজকতন্ত্রনীতির উদ্ভব হইল, ঐহিকতন্ত্র ও পারত্রিকতন্ত্রের পার্থক্য সাধিত হইল; এবং পরে কিরূপে চর্চ্চে অত্যাচারনীতির প্রবেশ ঘটিল, এবং কিরূপেই বা মানুষের বিবেক প্রথম এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। অপর দিকে পৌরতন্ত্রের ইতিহাসে অন্য এক নীতির বিকাশ দেখিয়াছেন। যাজক-তন্ত্র বা ভূস্বামিতন্ত্রের গঠননীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নীতি অনুসারে গঠিত এক নূতন সমাজের পরিচয় পাইয়াছেন; তাহার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষম্য ও সংঘর্ষ হইতে কেমন করিয়া ক্রমশঃ আধুনিক পৌর-চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণস্বরূপ ভীরুতা ও উদ্যমের, উন্মাদনা ও আইন-বশ্যতার অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিল, তাহাও দেখিয়া লইয়াছেন। এক

কথায়, ইউরোপীয় সমাজ যে যে উপাদানের সহায়তায় গঠিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার যে সমস্ত অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, এবং তাহার প্রাক্তন ইতিহাস হইতে তাহার ভবিষ্যৎ কিরূপে সূচিত হয়—সমস্তই আপনাদের দৃষ্টিপথে আনিয়াছি।

এখন একবার কল্পনার সাহায্যে আধুনিক ইউরোপের মর্ম্মস্থলে উপনীত হওয়া যাউক। আমি ফরাসী বিপ্লবের বিপুল পরিবর্ত্তনের পরবর্ত্তী ইউরোপের কথা বলিতেছি না, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের কথা বলিতেছি। আমরা দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজের যে রূপ দেখিয়াছি, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে কি সে রূপের কোন পরিচয় পাইতেছি? কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! আমি পৌরসমাজ সম্পর্কে এ রূপান্তরের কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, এবং দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গ বা জনসমাজের সহিত আধুনিক কালের জনসমাজের সাদৃশ্য কত অল্প, তাহাও আপনাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ভূস্বামিসমাজ ও যাজকসমাজ সম্পর্কে ঐরূপ তুলনামূলক আলোচনা করিলেও ঐরূপ বিস্ময়জনক রূপান্তরের পরিচয় পাইব। দ্বাদশ শতাব্দীর সাধারণ পৌরবর্গের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গের যেরূপ বৈসাদৃশ্য, ফিউড্যাল্ অভিজাতবর্গের সহিত পঞ্চদশ লুইর রাজসভার অভিজাতবর্গের, এবং আবট সুগেরের (Abbot Suger) চর্চ্চের সহিত—কার্দিনাল দ্য বেণীর চর্চ্চের সেইরূপ বৈসাদৃশ্যই লক্ষিত হয়। যদিও উভয় যুগেই ইউরোপীয় সভ্যতার সমস্ত উপাদানই একত্র হইয়াছিল, তথাপি এই উভয় যুগের মধ্যবর্ত্তী কালে সমাজ সম্পূর্ণ-রূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

আমি এই রূপান্তরের যথার্থ প্রকৃতি সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতে চাই। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমাজের পূর্ব্ববর্ণিত সমস্ত উপাদানই

বর্ত্তমান ছিল। রাজা ছিল, ঐহিক অভিজাতবর্গ ছিল, যাজকবর্গ ছিল, পৌরবর্গ ছিল, শ্রমজীবি-সমাজ ছিল, ঐহিক ও পারত্রিক শাসনতন্ত্র ছিল—এক কথায় একটা নেশন বা জাতি, এবং রাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক, সমস্তই ছিল ; কিন্তু তথাপি রাষ্ট্রও ছিল না, জাতিও ছিল না। এই সমগ্র যুগের মধ্যে একটা সম্মিলিত জাতি বা যথার্থ রাষ্ট্র-শাসনপদ্ধতি বলিলে যাহা বুঝায়, তাহার কিছুই ছিল না। কেবল কতকগুলি খণ্ডশক্তিবিশিষ্ট ব্যাপার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি পাওয়া যায় ; কিন্তু সার্ব্বজনীন বা সর্ব্বসাধারণ কোন ব্যাপারই পাওয়া যায় না। সাধারণ রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রও নাই,—যথার্থ জাতীয় সত্তাও নাই।

অপর দিকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করুন ; দেখিবেন, ইউরোপীয় জগতের রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বত্রই দুইটি প্রধান সত্তা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে—রাষ্ট্রতন্ত্র বা গবর্ণমেণ্ট এবং প্রজাসাধারণ বা নেশন্। সমগ্র দেশের উপর একমাত্র কর্ত্তৃশক্তির শাসন এবং এই শাসনশক্তির উপর সমগ্র দেশের জনবৃন্দের প্রভাব—এই লইয়াই সমাজ, এই লইয়াই ইতিহাস। এই দুই প্রবল শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ, ইহাদের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী ও বিরোধ, ইতিহাস ইহাই কেবল উদ্ঘাটন করিতেছে ও বিবৃত করিতেছে। অভিজাতবর্গ, যাজকবর্গ, পৌরবর্গ, এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ খণ্ডসমাজ ও খণ্ডশক্তি এখন গৌণস্থান অধিকার করিয়া আছে, পূর্ব্বোক্ত দুই বৃহৎশক্তির পশ্চাতে তাহারা প্রায় ছায়ার মত মিলাইয়া গিয়াছে।

আদিম ইউরোপ ও আধুনিক ইউরোপের মধ্যে ইহাই হইল আসল প্রভেদ ; ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে এই রূপান্তরই সংঘটিত হইয়াছিল।

অতএব ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ এখন আমরা

যে যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, সেই যুগের মধ্যেই এই রূপান্তরের রহস্য সন্ধান করিতে হইবে। এই যুগের বিশিষ্ট লক্ষণই এই যে, ইহার মধ্যে আদিম ইউরোপ আধুনিক ইউরোপে রূপান্তরিত হইয়াছে; ঐতি-হাসিক হিসাবে ইহাতেই এ যুগের মূল্য ও তাৎপর্য্য। যদি এই দিক্ দিয়া এ যুগের ইতিহাসের আলোচনা না করা হয়, যদি পরবর্ত্তী পরিণামের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এ যুগের ইতিহাস চর্চ্চা করা যায়, তাহা হইলে এ ইতিহাস বুঝা ত যাইবেই না, উপরন্তু শীঘ্রই আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা। বাস্তবিকপক্ষে, ইহার ভবিষ্য পরিণামের সহিত সম্পর্কিত করিয়া না দেখিলে এ যুগের কোন বিশিষ্ট প্রকৃতি পাওয়া যায় না; দেখিব, কেবল বিশৃঙ্খলাই বাড়িয়া চলিতেছে, অথচ কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, চারিদিকে কেবল লক্ষ্যবিহীন গতিবেগ ও নিস্ফল আন্দোলনের ঝটিকাবর্ত্ত। রাজা, অভিজাত, যাজক, পৌর—সমাজব্যবস্থার সমস্ত অঙ্গই একই আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতেছে—অগ্রসরও হইতে পারে না, স্থির হইয়াও থাকিতে পারে না। তাহারা নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হইতেছে; তাহারা কেহ সুব্যবস্থ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে চেষ্টা করিতেছে, কেহ সাধারণের স্বাধীন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে, কেহ বা ধর্ম্ম সংস্কারের চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু কিছুই সুসিদ্ধ হইতেছে না, কিছুই সুসম্পন্ন হইতেছে না। যদি কখনও মানবজাতি এমন বিড়ম্বনায় পড়িয়া থাকে যে, সে চঞ্চল হইয়াও অগ্রসর হইতে অসমর্থ, অবিরত পরিশ্রম করিয়াও ফললাভে বঞ্চিত, তবে সে ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে।

আমি কেবল একখানি গ্রন্থ জানি, যাহাতে এই বিড়ম্বনা যথাযথ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে—দ্য বারাঁত্ (De Barante) প্রণীত "বর্গণ্ডীর ডিউকদিগের ইতিহাস"। এই গ্রন্থে রীতিনীতির বর্ণনায় বা তথ্যাবলীর

পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় যে সত্যের আভাস পাওয়া যায়, তাহার কথা বলিতেছি না; পরন্তু যে সাধারণ সত্যের আলোকে সমস্ত গ্রন্থখানি এই যুগের নিষ্ফল চাঞ্চল্যের একটি যথার্থ প্রতিচ্ছবি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই কথা বলিতেছি।

কিন্তু যদি পরবর্ত্তী কালের সহিত সংযুক্ত করিয়া এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করা যায়, যদি আদিম হইতে আধুনিক ইউরোপের রূপান্তর-কাল হিসাবে ইহাকে দেখা যায়, তাহা হইলে তখনই ইহা উজ্জ্বল ও সজীব হইয়া উঠে; তখন ইহার মধ্যে একটা সমগ্রতা, একটা লক্ষ্যমুখী গতি, একটি ক্রমোন্নতি দেখিতে পাই; ইহার মধ্যে ধীরে ধীরে যে নীরব ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, তাহাতেই তাহার ঐক্যসূত্র ও তাৎপর্য্য নিহিত।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসকে তাহা হইলে তিনটি বৃহৎ যুগে ভাগ করা যায়:—

(১) সৃষ্টিযুগ—এ যুগে ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান চারিদিকের বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে গা ঝাড়া দিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, এবং স্ব স্ব মূলনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ যুগের ব্যাপ্তিকাল।

(২) দ্বিতীয় যুগটি প্রচেষ্টার যুগ, পরীক্ষার যুগ, পথ সন্ধানের যুগ। সমাজশৃঙ্খলার বিভিন্ন উপাদান এখন পরস্পর সান্নিধ্যে আসিল, পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইল, পরস্পরের প্রভাব অনুভব করিল, কিন্তু একটা কিছু সার্ব্বজনীন, সুব্যবস্থ বা স্থায়ী সত্তা গড়িয়া তুলিতে পারিল না। এ অবস্থা ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলা যায়।

(৩) তৃতীয় যুগ বিকাশের যুগ। এই যুগে ইউরোপীয় সমাজ একটা নির্দ্দিষ্ট আকৃতি লাভ করিল, একটা নির্দ্দিষ্ট গতিবেগ প্রাপ্ত হইল, একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দ্রুতবেগে ও ব্যাপকভাবে

অগ্রসর হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার আরম্ভ, এবং এখন পর্য্যন্ত ইহা চলিতেছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস আমার নিকট এইরূপেই প্রতিভাত, এবং এইরূপেই আপনাদিগের নিকট ইহা প্রকটিত করিব। এখন আমরা দ্বিতীয় যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ইহার মধ্যে পরবর্ত্তী কালের সামাজিক রূপান্তরের বড় বড় কারণগুলির সন্ধান লইতে হইবে।

এই যুগের প্রারম্ভেই যে প্রথম বৃহৎ ঘটনা আমাদের চক্ষে পড়ে, তাহা ক্রুসেড্ বা ধর্ম্মযুদ্ধ। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ক্রুসেডের আরম্ভ এবং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার ব্যাপ্তি। এই ক্রুসেড্ যে একটা বৃহৎ ঘটনা, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, ইহার সমাপ্তিকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত তত্ত্বান্বেষী ঐতিহাসিকবর্গ অনবরত ইহার আলোচনা করিয়া আসিতেছেন; এমন কি, ইহার বিবরণ পাঠ করিবার পূর্ব্বেই সকলেই বুঝিয়াছেন যে, ইহা এমন একটা ঘটনা, যাহা জনসমাজের অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয় এবং ঘটনাবলীর সাধারণ গতি বুঝিতে হইলে ইহার আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক।

ক্রুসেডের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার ব্যাপকতা। সমগ্র ইউরোপ এই সকল ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল; ক্রুসেড্ই প্রথম ইউরোপব্যাপী ঐতিহাসিক ঘটনা। ক্রুসেডের পূর্ব্বে সমগ্র ইউরোপ কখনও একভাবে উত্তেজিত হয় নাই বা এক উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়া কার্য্য করে নাই; এক কথায় তৎপূর্ব্বে ইউরোপ বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না। ক্রুসেড যুদ্ধই খৃষ্টপন্থী ইউরোপকে প্রকটিত করিল। ফরাসীরাই প্রথম ক্রুসেড সেনার পুরোবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা ছাড়া জার্ম্মান, ইতালীয়, স্পেনীয়, ইংরেজ—ইহারাও ছিল। পরে

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রুসেডের দিকে দৃষ্টিপাত করুন ; দেখিবেন, সমস্ত খৃষ্টীয় জাতিই তাহাতে যোগ দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার একেবারেই দেখা যায় নাই।

শুধু তাহাই নহে ; ক্রুসেড যেমন একটি ইউরোপ-সাধারণ ঘটনা, সেইরূপ ইউরোপে প্রত্যেক দেশে ক্রুসেড্ একটি জাতীয় ইতিহাসের ঘটনা। সমাজের সকল শ্রেণী একই প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, একই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া একই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রেরণায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। রাজা, ভূস্বামী, যাজক, পৌর, পল্লীবাসী, সকলে একই উদ্যমের সহিত একভাবেই ক্রুসেডে যোগদান করিয়াছিল। এইরূপে যেমন একটা ইউরোপীয় ঐক্যের সূচনা দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশে সেইরূপ এক একটা জাতীয় ঐক্যের নূতন আবির্ভাব দেখা গেল।

এইরূপ ঘটনা যখন জাতীয় জীবনের শৈশবাবস্থায় দেখা দেয়, যখন মানুষ স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে চিন্তাচেষ্টা না করিয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না লইয়া কাজ করে—তখন এই সকল ঘটনাকে "হিরোয়িক" বা অতিমানব আখ্যা দেওয়া হয় এবং সেই সেই যুগকে জাতীয় জীবনের মহাবীরযুগ বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে ক্রুসেড্ আধুনিক ইউরোপের হিরোয়িক ঘটনা। এ আন্দোলন এককালে ব্যাপক ও ব্যক্তিগত, জাতীয় অথচ অনিয়ন্ত্রিত।

ক্রুসেডের আদিম প্রকৃতি যে বাস্তবিকই এইরূপ, তাহা সমস্ত দলিল, সমস্ত ঘটনা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। ক্রুসেডযুদ্ধে প্রথম নামিল কাহারা ? কতকগুলি সাধারণ লোকের সমষ্টি। পীটার সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহারা দলে দলে বাহির হইয়া পড়িল। না ছিল তাহাদের উদ্যোগ, না ছিল তাহাদের পথপ্রদর্শক, না ছিল তাহাদের নায়ক অধিনায়ক। দুই একজন অখ্যাতনামা নাইট্ বা ক্ষত্রবীর তাহাদের সঙ্গে গিয়া-

ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে নেতা না বলিয়া অনুচর বলিলেই ঠিক হয়। এইরূপে তাহারা জার্ম্মানী অতিক্রম করিল, গ্রীকসাম্রাজ্য অতিক্রম করিল, অবশেষে এশিয়া মাইনরে তাহারা হয় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, না হয় মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

যথাক্রমে ফিউড্যাল্ অভিজাতসম্প্রদায়ও ক্রুসেড্ আন্দোলনে উদ্যমের সহিত যোগ দিলেন। গোদ্‌ফ্রোয়া দ্য বুয়িওঁর (Godefroi de Bouillon) নেতৃত্বে ভূস্বামিবর্গ অনুচরপরিবৃত হইয়া উৎসাহের সহিত যাত্রা করিলেন। এশিয়া মাইনর অতিক্রম করিবার সময় ক্রুসেডনেতৃদিগের অন্তঃকরণ নিরুৎসাহ ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা আর গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে চাহিল না; তাহারা পথিমধ্যেই দল বাঁধিয়া এক একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিল। সেনাভুক্ত জনসাধারণ ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; তাহারা জেরুসালেম যাইতে চাহে; কারণ, জেরুসালেম-উদ্ধারই ক্রুসেডের লক্ষ্য; ক্রুসেডারগণ রেমঁ দ্য তুলূজ্ (Raimond de Toulouse) বা বোহেমণ্ড (Bohemond) বা অন্য কাহারও জন্য রাজ্যজয় করিতে আসে নাই। এই যে ইউরোপব্যাপী লোকসাধারণের সমবেত আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা, ইহার নিকট ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পরাজিত হইল; সাধারণ লোকের উপর নেতৃবর্গের এত প্রভাব ছিল না যে, তাহাদিগকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে পারে। ইউরোপের রাজন্যবর্গ, যাঁহারা প্রথম ক্রুসেড হইতে দূরে সরিয়া ছিলেন, তাঁহারাও অবশেষে এই আন্দোলনের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর বড় বড় ক্রুসেডে রাজারাই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

এখন একেবারে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যাওয়া যাউক।

তখনও ইউরোপে লোকে ক্রুসেডের কথা বলিত, এমন কি, উৎসাহের সহিত প্রচারও করিত। পোপ্‌গণ রাজা প্রজাকে উত্তেজিত করিত, পুণ্যক্ষেত্রের উদ্ধারকল্পে সভাসমিতিও করিত; কিন্তু লোকে তখন আর বড় কেহ ক্রুসেডে যাইত না, ক্রুসেডের আহ্বান বড় কেহ আর গ্রাহ্য করিত না। ইউরোপীয় সমাজেও লোকচিত্তে এমন একটা কিছু প্রবেশ করিয়াছিল, যাহাতে ক্রুসেড-যুদ্ধের অবসান ঘটিল। দুই একটি ভূস্বামী বা দুই একটি দল তখনও জেরুসালেম যাত্রা করিত; কিন্তু সেই ব্যাপক আন্দোলনের তখন শেষ হইয়াছে; অথচ ইহা বুঝা যায় না যে, সে সময় ক্রুসেডের প্রয়োজন বা সুবিধার কিছু অভাব ছিল। মুসলমানেরা তখন এশিয়াখণ্ডে উত্তরোত্তর জয়লাভ করিতেছে। জেরুসালেমে প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টীয় রাজ্য তাহাদের হস্তে পতিত হইয়াছে। সেই রাজ্য পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজন ছিল; ক্রুসেডের প্রারম্ভকাল অপেক্ষা তখন কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা অনেক বেশী ছিল; এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও প্যালস্তাইনে বহুসংখ্যক খৃষ্টান তখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরাক্রান্ত ছিল। তাহারা তখন এশিয়াখণ্ডে যাতায়াত ও কার্য্য করিবার উপায় ও প্রণালী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল শিখিয়া লইয়াছে। তথাপি, ক্রুসেড আন্দোলন আর কিছুতেই পুনর্জ্জীবিত হইল না। স্পষ্ট দেখা গেল যে, সমাজের দুই প্রবল শক্তি—রাজশক্তি ও জনশক্তি—উভয়েই ক্রুসেডের প্রতি বিরূপ।

অনেকে বলেন, এটা অবসাদমাত্র; বার বার এইরূপে এশিয়ার উপরে পড়িয়া ইউরোপ তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অবসাদ কথাটি লইয়া ভাল করিয়া একটা বোঝা পড়া হওয়া আবশ্যক; এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই কথাটি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা অসঙ্গত প্রয়োগ। পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার

জন্য বর্ত্তমান কালের লোক ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ করিবে, ইহা সম্ভব নহে; কারণ, যে উদ্যম করে, সেই ক্লান্তি বোধ করিতে পারে। ক্লান্তি বা অবসাদ ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার, তাহা উত্তরাধিকার-সূত্রে চালিত হইতে পারে না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক দ্বাদশ শতাব্দীর ক্রুসেডের দ্বারা পরিক্লান্ত হইয়া পড়ে নাই; তাহারা একটা নূতন প্রভাবের বশে আসিয়া পড়িয়াছিল। মানুষের মনোভাব ও সামাজিক অবস্থায় একটা মহৎ পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছিল। লোকের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা তখন আর পূর্ব্বের মত ছিল না। তাহাদের চিন্তা ও বাসনার বিষয় তখন অন্যরূপ। পুরুষানুক্রমে লোকের চেষ্টা ও আচরণ যে ভিন্নরূপ হইয়া যায়, তাহার কারণ, এই সকল সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্ত্তন। লোকসমাজে যে কল্পিত অবসাদ আরোপ করা হয়, তাহা মিথ্যা রূপকমাত্র।

একটি নৈতিক ও একটি সামাজিক, এই দুই কারণে ইউরোপ ক্রুসেডের আন্দোলনে নিপতিত হয়। নৈতিক কারণ হইতেছে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রেরণা। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে খৃষ্টধর্ম্ম মুসলমানধর্ম্মের সহিত যুঝিয়া আসিতেছিল; ইউরোপে সে জয়লাভ করিয়া আসন্ন বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল; মুসলমানধর্ম্মকে সে শুদ্ধ মাত্র স্পেনদেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্পেন হইতেও তাহাকে বিতাড়িত করিবার জন্য খৃষ্টধর্ম্ম অনবরত চেষ্টা করিতেছিল। অনেকে বলেন, ক্রুসেড একটা আকস্মিক ব্যাপার; কেবল জেরুসালেম-প্রত্যাগত কতকগুলি যাত্রীর করুণকাহিনী ও পিটার সন্ন্যাসীর প্রচারের ফলে ক্রুসেডের জন্ম। ইহা একেবারে সত্য নহে। চারি শতাব্দী ধরিয়া খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্মে যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, ক্রুসেড তাহার চরম পরিণতি। এতদিন ইউরোপে এই

সংঘর্ষ চলিতেছিল, এখন ইহা এশিয়ার রঙ্গমঞ্চে স্থানান্তরিত হইল মাত্র। যদি আমি তথাকথিত ঐতিহাসিক উপমায় কোন আস্থা স্থাপন করিতাম, তাহা হইলে দেখাইতাম যে, মুসলমানধর্ম্ম ইউরোপে যে পন্থা অনুসরণ করিয়া যে ভাগ্যবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, এশিয়াখণ্ডে খৃষ্টধর্ম্মও ঠিক সেই প্রণালীতে সেই নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়াছে। মুসলমানধর্ম্ম স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একটী বৃহৎ ও কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। খৃষ্টানেরাও এশিয়াতে ঠিক তাহাই করিয়াছিল। স্পেনে খৃষ্টান অধিবাসিবর্গের সম্পর্কে মুসলমান নৃপতিদিগের ঠিক সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। জেরুসালেমের খৃষ্টানরাজ্য ও গ্রেনাডার মুসলমানরাজ্য মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ সমস্ত তুলনা ও উপমার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। আসল ব্যাপার হইতেছে দুইটি ধর্ম্ম ও দুইটি সমাজের সংঘর্ষ, এবং সেই সংঘর্ষের চরম পরিণতি ক্রুসেড। ইহাই হইল ক্রুসেডের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য, বৃহত্তর ইতিহাসের ঘটনা-স্রোতের সহিত ইহাই ক্রুসেডের সম্পর্ক।

কিন্তু ক্রুসেড আন্দোলনের একটা সামাজিক কারণও বর্ত্তমান ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সামাজিক অবস্থা ক্রুসেড আন্দোলনের সহায়তা করিয়াছিল। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, কি কারণে পঞ্চম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে কোন একটা সার্ব্বজনীন ব্যাপক ভাব বা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সমস্তই তখন কিরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে খণ্ডিত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপেই খণ্ডস্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মী ফিউড্যাল্ পদ্ধতির প্রাদুর্ভাব হয়। কিছুকাল পরে এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে মানুষ আর আবদ্ধ থাকিতে চাহিল না; মানুষের চিন্তা ও চেষ্টা তখন এই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল। মানুষের

তখন আর যাযাবরবৃত্তি নাই, কিন্তু যাযাবর জীবনের উত্তেজনা ও সঙ্কটবৈচিত্র্যের আকর্ষণ তখনও অন্তর্হিত হয় নাই। লোকে দলে দলে ক্রুসেডের আবর্ত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, একটা বৃহত্তর বিচিত্রতর জীবনের আস্বাদ পাইল;—কখনও বা তাহাদের অতীত যুগের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বর্ব্বরলীলার কথা মনে পড়িতে লাগিল, কখনও বা তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে ভবিষ্যতের বিশাল চিত্রপট উন্মুক্ত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর ক্রুসেডের এই দুইটি প্রধান কারণ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই দুই কারণের কোনটিই উপস্থিত ছিল না। মানুষ ও সমাজ তখন এতটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, যে আন্তরিক প্রেরণা বা সামাজিক প্রয়োজনের তাড়নায় ইউরোপ এশিয়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কোনটিই তখন অনুভূত হয় নাই। আমি জানি না, আপনারা ক্রুসেডের মূল ইতিবৃত্তগুলি পাঠ করিয়াছেন কি না, কিম্বা প্রথম ক্রুসেডের সমসাময়িক ইতিবৃত্তকারদিগের রচনার সহিত দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগের ইতিবৃত্তগুলি তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন কি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ আলবেয়ার (Albert d' Aix), সন্ন্যাসী রবার্ট এবং রেমঁ দাজিলের (Raymond d' Agiles) গ্রন্থ লউন। ইহাঁরা তিনজনেই প্রথম ক্রুসেডে যোগদান করিয়াছিলেন। শেষোক্ত যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ টায়ারবাসী উইলিয়ম ও জেম্‌স্ দ্য বিত্রীর (James de Vitry) গ্রন্থ লউন। এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থকারের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না। প্রথমোক্ত তিনজনের ইতিবৃত্তে প্রাণের চাঞ্চল্য, কল্পনার সজীবতা, বর্ণনার আবেগ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু তাহাদের চিত্ত নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

হইতেছে, তাহার বাহিরে তাহাদের কোন চিন্তা নাই, সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান তাহাদের পরিচয়ের বাহিরে, মন কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, তাহাদের চারি দিকে যাহা ঘটিতেছে বা যে সমস্ত ঘটনা তাহারা বর্ণনা করিতেছে, সে সম্বন্ধে কোন বিচার করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের একেবারেই নাই। অপর দিকে টায়ারবাসী উইলিয়মের গ্রন্থ খুলুন—বিস্ময়ের সহিত দেখিবেন, তাঁহার সহিত বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিকের বড় বেশী পার্থক্য নাই; দেখিবেন, তাঁহার চিত্ত কত সুপুষ্ট, কত উদার, কত উন্মুক্ত, ঘটনাবলীর রাজনৈতিক তাৎপর্য্য বুঝিবার কি অসামান্য ক্ষমতা; মত ও সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ; কার্য্যকারণবিচারের কি নৈপুণ্য। জেম্‌স্ দ্য বিত্রী আর এক প্রকার পাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্ত। তিনি একজন সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিত; শুধু ক্রুসেডের ঘটনাবলীর দিকেই তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ নহে; তিনি রীতিনীতি, ভূবৃত্ত, জাতিতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি নানা তথ্যের সন্ধান রাখেন; তিনি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও বর্ণনা দিতেছেন। এক কথায় উভয় যুগের ইতিবৃত্তকারদিগের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বৃহৎ—এত বৃহৎ যে, ইতিমধ্যে মানসিক জগতে একটা বিপ্লব সাধিত হইয়াছে বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।

উভয় যুগের ইতিবৃত্তকারগণ যে ভাবে মুসলমানদিগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেই এই পরিবর্ত্তনের বিপুলত্ব উপলব্ধি করা যায়। প্রথম যুগের ইতিবৃত্তকার ও ক্রুসেডারগণের চক্ষে মুসলমানগণ কেবল ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা মুসলমানদিগের সম্বন্ধে কিছুই জানিত না; তাহারা যে বিরুদ্ধধর্ম্মী, ইহাই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট, অন্য দিক্ দিয়া তাহাদিগকে বুঝিতে বা বিচার করিতে তাহারা চেষ্টা করে নাই; উভয় পক্ষের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না; তাহারা মুসলমানকে ঘৃণা

করিত ও তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিত, মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ। টায়ারবাসী উইলিয়ম, জেম্‌স্ দ্য বিত্রী, কোষাধ্যক্ষ বের্ণার (Treasurer Bernard) প্রভৃতি পরবর্ত্তী ইতিবৃত্তকারগণ মুসলমানদিগের সম্বন্ধে অন্য ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িয়া বুঝা যায় যে, তাঁহারা মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মুসলমানকে অমানুষ রাক্ষস মনে করেন নাই, তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে মুসলমানের ভাব ও চিন্তা আয়ত্ত করিয়াছেন; তাঁহারা মুসলমানের সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছেন এবং উভয় সমাজের মধ্যে একপ্রকার মানবসম্বন্ধ, একপ্রকার সহানুভূতিও গড়িয়া উঠিয়াছে। টায়ারবাসী উইলিয়ম নুর-উদ্দীনকে হৃদয়ের সহিত প্রশংসা করিয়াছেন, কোষাধ্যক্ষ বের্ণার সালাদিনকে প্রশংসা করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহারা মুসলমানদিগের রীতিনীতির সহিত খৃষ্টানদিগের রীতিনীতির তুলনাও করিয়াছেন; টাসিটাস যেমন জার্ম্মানদিগের রীতিনীতির সহিত রোমীয়দিগের রীতি-নীতির তুলনা করিয়া রোমীয়দিগকে লজ্জা দিয়াছিলেন, ইহাঁরাও সেইরূপ মুসলমানদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া খৃষ্টানদিগকে লজ্জা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাদের বিরুদ্ধে এই ক্রুসেড অভিযান, তাহাদের প্রতি এই যে উদারতা ও অপক্ষপাতিতা, ইহা পূর্ব্বতন যুগের ক্রুসেডারগণ দেখিলে ক্রোধে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, উভয় যুগের মধ্যবর্ত্তী কালে কত বড় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

মানবচিত্তের এই যে মুক্তিসাধন,—উদারতর, ব্যাপকতর ধারণার দিকে এই যে গতি, ইহাই ক্রুসেডের প্রথম ও প্রধান ফল। ধর্ম্মবিশ্বাসের নামে এ আন্দোলনের আরম্ভ, কিন্তু ইহার ফলে মানুষের মন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের একান্ত আধিপত্য হইতে উন্মুক্ত হইয়া গেল। অবশ্যই বহু অভাবিত কারণের সমবায়ে এ পরিণতির সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল।

ক্রুসেডারদিগের সম্মুখে যে বিশাল দৃশ্যপট উন্মুক্ত হইয়া পড়িল, তাহার নবীনত্ব, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যই এই পরিণতির প্রথম কারণ। পর্য্যটক-দিগের যেমন হয়, তাহাদিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল। এ কথা সকলেই মানেন যে, নানাদেশ পর্য্যটন দ্বারা চিত্তের উদারতা সাধিত হয়; বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন রীতিনীতি, বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করিতে করিতে মানুষের ধারণা বিস্তৃত হয়, মানুষের বিচার-বুদ্ধি পুরাতন কুসংস্কারের কবল হইতে উন্মুক্ত হয়। বিদেশপর্য্যটক এই সকল ক্রুসেডারদিগের মধ্যেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। নানা নূতন বস্তু, নানা অপরিচিত রীতিনীতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের চিত্ত উন্মুক্ত ও উন্নত হইয়া গেল। তাহা ছাড়া তাহারা দুইটি বিভিন্নপ্রকৃতি উন্নততর সভ্যতার সম্পর্কে আসিল—একদিকে গ্রীকসভ্যতা, অপর দিকে মুসলমান সভ্যতা। যদিও তখন গ্রীকসমাজ বলবীর্য্যহীন, বিকারগ্রস্ত ও ক্ষয়োন্মুখ, তথাপি ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ক্রুসেডারদিগের চক্ষে সে সমাজ পশ্চিম ইউরোপ অপেক্ষা মার্জ্জিত ও আলোকপ্রাপ্ত বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। মুসলমানসমাজও তাহাদের সম্মুখে ঐ প্রকার দৃশ্যই উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। মুসলমানগণের চক্ষে খৃষ্টান ক্রুসেডারগণ কিরূপে প্রতিভাত হইত, প্রাচীন ইতিবৃত্তের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানেরা প্রথমে তাহাদিগকে অসভ্য বর্ব্বর মনে করিত; তাহাদের মত অসভ্য, ক্রূর ও নির্ব্বোধ জাতি তাহারা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। এ দিকে ক্রুসেডারগণ মুসলমানদিগের ঐশ্বর্য্য ও আমীরী চালচলন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। পরস্পর সম্বন্ধে এই প্রথম ধারণার পর উভয় জাতির মধ্যে ক্রমশঃ নানাবিধ সামাজিক সম্পর্ক ঘটিতে থাকিল। এই সকল সম্পর্ক ক্রমশঃ কিরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িল, সে সম্বন্ধে অনেকের ধারণা নাই। শুধু যে প্রাচ্য খৃষ্টানদিগের সহিত মুসলমানদিগের সম্পর্ক

ঘটিতে লাগিল, তাহা নহে, সমগ্র পাশ্চাত্য খণ্ডের সহিত প্রাচ্যখণ্ডের পরিচয়, যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকিল। বেশী দিন নহে, সে দিন ফ্রান্সের ইউরোপ-খ্যাত পণ্ডিত আবেল রেমুসা (Abel Remusat) আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মঙ্গোল সম্রাট্দিগের সহিত খৃষ্টান ভূপতিগণের আদানপ্রদানসম্পর্ক ছিল। স্যাঁলুই ও অন্যান্য ফ্রাঙ্ক নরপতিগণের নিকট মঙ্গোলরাজদূত আসিয়া যাহাতে মঙ্গোল ও খৃষ্টানদিগের সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষার্থ তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে পুনরায় ক্রুসেড আরম্ভ করা হয়, তদুদ্দেশ্যে সন্ধিবন্ধন করিতে চাহিয়াছিল। তাহা ছাড়া শুধু যে রাজায় রাজায় রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নহে, জাতিতে জাতিতেও নানাপ্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবেল রেমুসার উক্তি উদ্ধৃত করা যাউক ঃ—

"অনেক ইতালীয়, ফরাসী ও ফ্লেমিশ সন্ন্যাসী—মঙ্গোল খাঁয়ের নিকট রাজনৈতিক দৌত্যে প্রেরিত হইয়াছিল। অনেক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মঙ্গোল রোম, বার্সিলোনা, ভ্যালেন্সিয়া, লিয়ঁ, পারী, লণ্ডন ও নর্দাম্টনে আসিয়াছিলেন; এবং নেপল্‌স্ রাজ্যের একজন ফ্রান্সিস্কান ভিক্ষু পিকিনের আর্চবিশপ্ হইয়াছিলেন। পরে সেই পদে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মতত্ত্ব-বিভাগের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও কত অখ্যাতনামা ব্যক্তি, হয় ক্রীতদাসরূপে, না হয় ধনার্জ্জন কামনায়, না হয় কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া নানা অজ্ঞাতপূর্ব্ব দেশে আকৃষ্ট হইয়াছিল। দৈবক্রমে কাহারও কাহারও নাম এখনও পাওয়া যায়। তাতারদিগের পক্ষ হইতে প্রথম যে দূত হঙ্গারীর রাজসভায় উপস্থিত হয়,সে একজন ইংরেজ; কতকগুলি গুরুতর অপরাধের জন্য সে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয় ও এশিয়ার নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে মঙ্গোলদিগের দাসত্ব গ্রহণ করে। একজন ফ্লেমিশ চর্ম্মকার তাতার

দেশের অন্তঃস্থলে পাকেট্ (Paquette) নাম্নী একজন মেৎস্ (Metz) নগরবাসিনী স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পায়; স্ত্রীলোকটিকে তাতারেরা হঙ্গারী হইতে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহা ছাড়া সে তাতার দেশে একজন পারীনগরবাসী স্বর্ণকার ও রুয়ঁানগরবাসী যুবককেও দেখিতে পায়। যুবকটি তাতার কর্ত্তৃক বেলগ্রেড বিজয়ের সময় উপস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত সে অনেক রুশীয়, হঙ্গারীয় ও ফ্লেমিংএরও সাক্ষাৎ পায়। রবার্ট নামক একজন গায়ক প্রাচ্য এশিয়া পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে জীবনলীলা সম্বরণ করিবার জন্য শার্ত্রে (Chartres) নগরীর ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা "সুশ্রী" ফিলিপের সেনামধ্যে একজন তাতার শিরস্ত্রাণ জোগাইত। জন্ দ্য প্ল্াঁকার্পাঁ্যা (John de Plancarpin) গায়ুকের (Gayouk) নিকট টেমার নামক একজন রুশকে দ্বিভাষীর কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন। ব্রেসলাউ, পোলাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার বহু বণিক্ তাঁহার তাতার যাত্রা-পথে সঙ্গী হইয়াছিল। রুশিয়ার ভিতর দিয়া যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন অনেক জেনোয়াবাসী, পিসা-বাসী ও ভেনিশীয় বণিক্ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। দুইজন বণিক্ দৈবক্রমে বোখারা গিয়া পড়িয়াছিল; তাহারা কুলাগুকর্ত্তৃক কুবিলাইএর নিকট প্রেরিত একজন মঙ্গোলরাজদূতের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইয়াছিল। তাহারা কয়েক বৎসর চীন ও তাতারদেশে প্রবাস যাপন করে এবং ফিরিবার সময় কুবিলাই খাঁএর নিকট হইতে পোপের নামে পত্র লইয়া আসে; পরে পুনরায় তাহারা তাহাদের মধ্যে একজনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মার্কো পোলোকে সঙ্গে লইয়া খাঁএর নিকট ফিরিয়া যায় এবং অবশেষে কুবিলাইএর রাজসভা ত্যাগ করিয়া ভেনিশে ফিরিয়া আসে। পরবর্ত্তী শতাব্দীতেও এইরূপ পর্য্যটনের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তাহার

মধ্যে স্যর জন মাণ্ডেবিল নামক ইংরাজ বৈদ্য, ফ্রিউলি-বাসী ওডেরিক, পেগোলেট্টি ও উইলিয়ম অ্ব বুল্‌ড্‌সেল্‌ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এটা বেশ ধরিয়া লওয়া যায় যে, যে সকল পর্য্যটকের ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অপেক্ষা যাহাদের কোন লিপিবদ্ধ নিদর্শন নাই, তাহাদের সংখ্যাই অধিক। ভ্রমণকাহিনী লিখিবার ক্ষমতা অল্প লোকেরই ছিল, ভ্রমণ করিবার ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোকের ছিল, সন্দেহ নাই। এই সকল ভবঘুরেদের মধ্যে অনেকেই বিদেশে বাস করিয়া, সেইখানেই জীবনলীলা সাঙ্গ করে; কেহ কেহ যেমন নিঃসম্বল ভাবে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তেমনি নিঃসম্বলভাবে গৃহে ফিরিয়া আসে; কিন্তু তাহারা বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা কল্পনার ভাণ্ডার ভরিয়া আনিয়া, পরিবার পরিজনের নিকট সেই সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে। তাহাদের বর্ণনায় অনেক অতিরঞ্জিত তথ্য ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু নানা অসঙ্গত অদ্ভুত কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এমন অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ রাখিয়া যায়, যাহা ভবিষ্যতে কাজে লাগিল। এইরূপে জার্ম্মানী, ইটালী ও ফ্রান্সে, সন্ন্যাসীদিগের মঠে, ভূস্বামীদিগের দুর্গপ্রাসাদে, এমন কি, নিম্নতম শ্রেণীর কুটীরের মধ্যেও অনেক মূল্যবান্‌ বীজ আহৃত হইল, যাহা অল্পকাল মধ্যেই অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত অজ্ঞাত পর্য্যটক স্বদেশের শিল্পবিদ্যা দূরতম বিদেশে লইয়া গেল ও ফিরিবার সময় বিদেশের শিল্পবিদ্যা স্বদেশে লইয়া আসিল। এইরূপে তাহারা যে আদানপ্রদান ব্যাপার চালাইতে থাকিল, তাহা বাণিজ্যের আদান প্রদান অপেক্ষা অনেক বেশী লাভজনক। এই উপায়ে শুধু যে রেশম, চীনা মাটি ও ভারতীয় পণ্যের বাণিজ্য বিস্তৃত হইল এবং বাণিজ্যের জন্য নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হইল, তাহা নহে; রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর হইতে

ইউরোপের চিত্ত একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল; সেই চিত্তের সম্মুখে এখন নানা বিদেশী রীতিনীতি, নানা অজ্ঞাত জাতি, নানা অদ্ভুত শিল্পসামগ্রী ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভূমণ্ডলের চতুঃখণ্ডের মধ্যে যে খণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যতার আবাসভূমি, সেই এশিয়া-খণ্ডের মূল্য তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিল। তাহারা এশিয়ার শিল্প, এশিয়ার ধর্ম্মবিশ্বাস, এশিয়ার ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল; এমন কি, পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাতার ভাষার একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবারও কথা উঠিল। প্রথমাবস্থার অতিরঞ্জিত অদ্ভুতরসাত্মক বর্ণনাগুলি যথারীতি আলোচিত ও পরীক্ষিত হইয়া, তাহা হইতে নানা যথার্থ তথ্য উদ্‌ঘাটিত ও চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে থাকিল। পূর্ব্বদিকে বিশ্বের কবাট যেন খুলিয়া গেল; ভূগোলবিদ্যা দীর্ঘপদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া গেল, এবং ইউরোপীয়দিগের অসমসাহসিকতা ও সঙ্কটপ্রিয়তা এখন নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের পথে ধাবিত হইল। পৃথিবীর প্রাচ্য গোলার্দ্ধের সহিত পরিচয় যত বিস্তৃত হইতে লাগিল, ততই আর অপর গোলার্দ্ধের ধারণা অসম্ভব কল্পনা বলিয়া পরিগণিত হইল না। মার্কো পোলো-কথিত জিপাংরির সন্ধানেই কলম্বস নূতন গোলার্দ্ধ আবিষ্কার করিলেন।"

ক্রুসেডের ফলে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় চিত্তের সম্মুখে কি এক নূতন বিশাল জগৎ খুলিয়া গেল, তাহা এই সকল পূর্ব্ব-বর্ণিত তথ্য হইতে সহজেই উপলব্ধি করিবেন। এই বিরাট্ ঘটনার পরে ইউরোপীয় চিত্তের যে স্বাধীন বিকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার প্রধান কারণ যে এই ক্রুসেডজনিত চিত্তবিপ্লব, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আর একটি কারণ আছে, সেটিও লক্ষ্য করা উচিত। ক্রুসেডের সময় পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র পোপের রাজসভা সাধারণ

লোকসমাজের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে নাই। যাহা কিছু সম্পর্ক, তাহা রোম হইতে প্রেরিত পোপদূত বা বিশপ্ প্রভৃতি যাজকবর্গের মধ্যস্থতায় ঘটিয়াছে। অবশ্য কোন কোন সাধারণ লোকের রোমের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল; কিন্তু মোটের উপর সমস্ত সমাজ ধরিতে গেলে যাজকবৃন্দের মধ্য দিয়াই সাধারণ লোকের সহিত রোমের সম্পর্ক চলিত। ক্রুসেডের সময়ে কিন্তু অধিকাংশ ক্রুসেডারের পক্ষে রোমই ছিল যাতায়াতের পথে প্রধান আড্ডা। বহুসংখ্যক লোক এখন পোপসভার আচার ব্যবহার, নীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইল। ধর্ম্ম লইয়া যত কিছু বিবাদ বিসম্বাদ, তাহার মধ্যে কতটুকুই বা ধর্ম্মভাবের প্রেরণা আর কতটুকুই বা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণা, তাহাও বুঝিতে আরম্ভ করিল। নিশ্চয়ই এই নবলব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে অনেকের মনেই এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সাহস ও দৃঢ়তা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

ক্রুসেডের পরে সাধারণতঃ এবং বিশেষ করিয়া ধর্ম্মশাসন বিষয়ে লোকের মনের যে অবস্থা ঘটিল, তাহার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করিয়া থাকা যায় না। ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণার কোন পরিবর্ত্তন হইল না; পুরাতন ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তে বিরুদ্ধ বা বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। অথচ লোকের মন এখন অনেক বেশী স্বাধীন। এই স্বাধীন উন্মুক্ত চিত্ত কেবল আর ধর্ম্মালোচনার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিল না। ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইল না বটে, কিন্তু মানুষের মন এখন ধীরে ধীরে ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে পৃথক্ হইয়া অন্যত্র সরিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রুসেডের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাবের প্রেরণা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল; ইউরোপের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থায় এক গভীর পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল।

ইউরোপের সামাজিক অবস্থাতেও ঐরূপ এক পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। এ বিষয়ে ক্রুসেডের প্রভাব কতটুকু, তাহা লইয়া অনেক অনুসন্ধান আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ক্রুসেড অভিযানের ব্যয় সংগ্রহের জন্য কিরূপে বহু ফিউড্যাল্ ভূস্বামীকে রাজার নিকট স্বীয় ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল অথবা নূতন পৌরসঙ্ঘের নিকট অধিকারপত্র বিক্রয় করিতে হইয়াছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। ইহাও দেখান হইয়াছে যে, কেবল অনুপস্থিতির দরুন অনেক ভূস্বামীকে পূর্ব্বক্ষমতা অনেক পরিমাণে হারাইতে হইয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, আমরা কয়েকটি সাধারণ তথ্যের দ্বারা ক্রুসেডের সামাজিক প্রভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ক্রুসেডের কালে ক্ষুদ্র ভূস্বামীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির সংখ্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল এবং অল্পসংখ্যক কয়েক ব্যক্তির হস্তে সমস্ত ভূসম্পত্তি আসিয়া জমা হইয়াছিল। ক্রুসেডের সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় ভূস্বামীর আবির্ভাব ও সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার অনেক সময় দুঃখ হয় যে, ভূসম্পত্তি বণ্টন হিসাবে ফ্রান্সের একটি মানচিত্র প্রস্তুত হয় নাই। মানচিত্রে যেমন ডিপার্টমেণ্ট, ক্যাণ্টন, পল্লী প্রভৃতি দেখান হইয়া থাকে, সেইরূপ যদি এক একটি ভূসম্পত্তির বিস্তৃতি ও পরিবর্ত্তনপরম্পরা দেখান হয়, তাহা হইলে সুবিধা হয়। এইরূপ একটি মানচিত্রের সাহায্যে যদি ক্রুসেডের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ফ্রান্সের অবস্থা তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিব, কত ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, এবং মধ্যবর্ত্তী ও বৃহৎ ভূসম্পত্তিগুলি কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রুসেডের অন্যান্য পরিণামের মধ্যে এটি একটি বৃহত্তম পরিণাম।

এমন কি, যে সমস্ত ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ তখন পর্য্যন্ত স্বীয় সম্পত্তি রক্ষা

করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না। বড় ভূস্বামিগণ এখন সমাজের এক একটি কেন্দ্রস্বরূপ। সেই কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে গ্রহউপগ্রহস্বরূপ ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণের অবস্থান। ক্রুসেডের সময় সমৃদ্ধ ও পরাক্রমশালী নেতার অনুসরণ করা ও সাহায্য গ্রহণ করা তাহাদিগের পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রুসেড অভিযানে এই অধিনেতার সঙ্গে তাহাদিগকে বাস করিতে হইয়াছে, তাহার ভাগ্যাভাগ্যের অংশী হইতে হইয়াছে, তাহার বিপদ্ সঙ্কটে সঙ্গী হইতে হইয়াছে। ক্রুসেড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের এই সামাজিকতা, ঊর্দ্ধ্বতন ভূস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার এই অভ্যাস দৃঢ়রূপে মজ্জাগত হইয়া গেল। এইরূপে বড় বড় ভূসম্পত্তির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, ভূস্বামিগণের দুর্গপ্রাসাদের মজলিস ক্রমশঃ জমকাইয়া উঠিল; সে মজলিসে তখন অনেক ক্ষুদ্র ভূস্বামী—অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাবেশ; ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণের সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিল বটে, কিন্তু তাহারা আর স্বরাট্ স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ দুর্গে বাস করে না।

বড় বড় ভূসম্পত্তির বিস্তৃতি ও পূর্ব্বতন বিচ্ছিন্ন সমাজের পরিবর্ত্তে কতকগুলি বড় বড় সামাজিক কেন্দ্রের সৃষ্টি—ফিউড্যাল্ পদ্ধতির সম্পর্কে ক্রুসেডের এই দুই প্রধান ফল।

পৌরসমাজেরও এইরূপ একটা পরিবর্ত্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ক্রুসেডের পূর্ব্বে যে সামান্য আকারে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিত, তাহাতে ফ্লাণ্ডার্স ও ইটালীর বড় বড় নগরের মত নগর গড়িয়া উঠে না। বৃহদাকারে সামুদ্রিক বাণিজ্য, বিশেষ করিয়া প্রাচ্যখণ্ডের সহিত বাণিজ্যের দ্বারাই এই সকল পুরীর উদ্ভব। ক্রুসেডের দ্বারা সামুদ্রিক বাণিজ্য যে উন্নতিবেগ পাইয়াছে, সেরূপ প্রবল সহায়তা আর কিছুতে পায় নাই।

মোটের উপর ক্রুসেডের অবসানকালে সমাজের অবস্থা লক্ষ্য করিলে

দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালের খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণ সমাজের পরিবর্ত্তে এক নূতন সমাজের আবির্ভাব হইল ; এই সমাজের গতি কেন্দ্রমুখী, সংহতিমুখী। সমস্তই এখন পরস্পর সান্নিধ্যের দিকে, একাকারের দিকে চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তা হয় বৃহত্তর সত্তার মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে, না হয় তাহার চারিদিকে ঝাঁক বাঁধিয়া অবস্থান করিতেছে। সমাজের গতি এখন এই দিকে, সমাজের সমস্ত উন্নতি এখন এই কেন্দ্রীকরণ-নীতির বশবর্ত্তী।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কেন যে রাজা প্রজা কেহই আর ক্রুসেডে যাইতে চাহে না, এখন তাহা বুঝিতে পারিলেন। এখন তাহাদের সে বিষয়ে প্রবৃত্তিও নাই, প্রয়োজনও নাই। ধর্ম্মভাবের প্রেরণায়, সমগ্র জীবনের উপর ধর্ম্মবিশ্বাসের একাধিপত্যের দরুনই তাহারা এই ক্রুসেড আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল ; এখন সে আধিপত্য শিথিল হইয়া আসিয়াছে। তাহা ছাড়া তাহারা ক্রুসেডের মধ্যে একটা ব্যাপকতর, বিচিত্রতর নূতন জীবনের আস্বাদ পাইতে চাহিয়াছিল ; এখন তাহারা ইউরোপের মধ্যেই নূতন নূতন সামাজিক বন্ধন ও আদানপ্রদানের মধ্যে সেই নূতনত্বের আস্বাদ পাইতে লাগিল। এই সময়েই রাজগণের চক্ষের সম্মুখে রাষ্ট্রীয় পরাক্রমবৃদ্ধির আদর্শ ফুটিয়া উঠিল। নূতন নূতন রাজ্যের সন্ধানে এশিয়া যাওয়ার প্রয়োজন কি ? ঘরের পাশেই ত কত রাজ্য পড়িয়া আছে, জয় করিয়া লইলেই হইল। ফিলিপ্ অগষ্টস্ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রুসেডে গিয়াছিলেন ; ইহা অপেক্ষা আর স্বাভাবিক কি হইতে পারে ? তাঁহাকে যে ফ্রান্সের রাজা হইতে হইবে। সাধারণ প্রজাবর্গের মধ্যেও ঐ একই ব্যাপার। তাহাদের সম্মুখে নব নব উপায়ে ধনার্জ্জনের পন্থা খুলিয়া গেল। তাহারা তাই এখন বিপদ্ সঙ্কটের পথ ছাড়িয়া দিয়া কাজে লাগিয়া গেল। রাজগণ

সঙ্কটাভিযান ত্যাগ করিয়া রাজনীতির জাল বুনিতে লাগিলেন; প্রজাগণ ভবঘুরে স্বভাব ত্যাগ করিয়া বৃহদাকারে শিল্প বাণিজ্য ফাঁদিতে লাগিল। কেবল একদল লোকের তখনও সঙ্কটলিপ্সা মিটে নাই। যে সমস্ত ফিউড্যাল্ ভূস্বামীর রাজনৈতিক দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবার মত অবস্থা নহে, অথচ কাজ করিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহারা তাহাদের প্রাচীন রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালী আকড়াইয়া রহিল। তাহারা তাই দলে দলে ক্রুসেডে ছুটিল ও ক্রুসেডের পুনরুজ্জীবনকল্পে চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমার মতে ক্রুসেডের ইহাই যথার্থ ও প্রধান পরিণাম। একদিকে চিন্তার বিস্তৃতি, চিত্তের মুক্তিসাধন; অন্য দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তার স্থানে বৃহত্তর সত্তার প্রতিষ্ঠা ও সর্ব্বপ্রকার উদ্যমের উপযোগী একটা বিশাল ক্ষেত্রের উন্মোচন। ক্রুসেডের ফলে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যও বাড়িয়া গেল, রাষ্ট্রীয় ঐক্যও বাড়িয়া গেল। মানুষের স্বাধীনতাও অগ্রসর হইয়া গেল, সমাজের কেন্দ্রীকরণও অগ্রসর হইল। ইউরোপীয়েরা এই সময়ে প্রাচ্য দেশ হইতে সভ্যতার কি কি উপকরণ সাক্ষাৎসম্পর্কে আমদানী করিয়াছিল, তাহা লইয়া অনেক অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কম্পাশ, মুদ্রাযন্ত্র ও বারুদ প্রভৃতি যে কয়টি বড় বড় আবিষ্কারের দ্বারা ইউরোপীয় সভ্যতার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই নাকি পূর্ব্ব হইতে প্রাচ্যদেশে পরিজ্ঞাত ছিল, এবং ক্রুসেডাররা সম্ভবতঃ সেখান হইতে এগুলিকে আমদানী করিয়াছে। এ কথাটা কিয়ৎপরিপাণে সত্য। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কোন উক্তি তর্কসাপেক্ষ। যাহা তর্কসাপেক্ষ নহে, তাহা হইতেছে ক্রুসেডের পূর্ব্ববর্ণিত সাধারণ প্রভাব,—একদিকে মনের উপর প্রভাব, অপর দিকে সমাজের উপর প্রভাব। ক্রুসেড ইউরোপীয়

সমাজকে একটা সঙ্কীর্ণ পথ হইতে টানিয়া আনিয়া নানা নূতন নূতন সুবিস্তীর্ণ পথে চালাইয়া দিল। একদিকে শাসিত জনবর্গ, অপর দিকে শাসনতন্ত্র—আধুনিক কালে ইউরোপের সমাজ এই যে উভয় দলে বিভক্ত, নানা বিচিত্র উপাদান হইতে এই দুইটি মাত্র দলের সৃষ্টি ক্রুসেডের ফলে হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এই রূপান্তর সাধনের প্রধান সহায় যে রাজতন্ত্র, তাহাও পুষ্টি লাভ করিয়াছে। আগামী অধ্যায়ে আধুনিক রাষ্ট্রগুলির জন্মকাল হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রাজতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিব।

নবম অধ্যায়

প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজের সহিত তুলনায় আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের যাহা বিশিষ্ট লক্ষণ, তাহা গত অধ্যায়ে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, ইউরোপীয় সমাজের নানা বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদান ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া শেষে দুইটি প্রধান উপাদানে পরিণত হইয়াছে—একদিকে রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র, অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় প্রজাবর্গ। এখন ভূস্বামী বা যাজকসঙ্ঘ, রাজা বা পৌরসঙ্ঘ বা দাসবর্গ, কেহই আর সমাজে প্রধান বা শক্তিশালী নহে—আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কেবল দুইটি শক্তির অধিষ্ঠান দেখিতে পাই—শাসনতন্ত্র ও প্রজাশক্তি।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইহাই যখন শেষ পরিণাম, তখন আমাদেরও অনুসন্ধান এই দিকে পরিচালিত করা আবশ্যক। এই মহৎ পরিবর্ত্তনের উৎপত্তি ও পরিণতি কিরূপে ঘটিল, তাহা আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। যে যুগে এই ব্যাপারের সূচনা, এখন আমরা সেই যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্নভাবে এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। এবং সর্ব্বপ্রথম যে ঘটনার দ্বারা ইউরোপ এই পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধের বিস্তৃত আলোচনা গত অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

এ দিকে আবার ক্রুসেডের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে রাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠানের প্রভাববৃদ্ধি ঘটে। যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়

ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শাসনতন্ত্র ও প্রজাশক্তি, এই উভয় শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে রাজতন্ত্রই সর্ব্বপ্রধান।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে রাজতন্ত্র যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় ইতিহাসের ঘটনাবলীর দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই, সমাজের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই রাজশক্তি পুষ্টিলাভ করিয়াছে; উভয়ের উন্নতি পরস্পর-সাপেক্ষ।

শুধু যে উভয়ের উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ, তাহা নহে; যখনই সমাজ তাহার আধুনিক বিশিষ্ট স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রাজশক্তিও বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। সুতরাং যখন এই পরিণতি সম্পূর্ণতা লাভ করিল, যখন ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রে প্রজাশক্তি ও শাসনতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বৃহৎ শক্তির অস্তিত্ব রহিল না, তখন দেখা গেল, রাজতন্ত্রই একমাত্র শাসনতন্ত্র।

ফ্রান্সে ত এ ব্যাপার সুস্পষ্ট; কিন্তু শুধু ফ্রান্সে নহে, ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এইরূপ ঘটিল। কোথাও বা কিছু পূর্ব্বে, কোথাও বা কিছু বিলম্বে, কোথাও বা এক আকারে, কোথাও বা অন্য আকারে; ইংলণ্ড, স্পেন, জার্ম্মানী সর্ব্বত্রই সামাজিক ইতিহাসের এই এক পরিণাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, ইংলণ্ডে টিউডরদিগের সময়েই ইংরাজসমাজের নানা প্রাচীন, বিশিষ্ট ও স্থানীয় উপাদান বিকৃতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া একটা ব্যাপক সমাজ-ব্যবস্থায় পরিণত হইল, এবং এই সময়েই ইংলণ্ডে রাজ-শক্তির প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জার্ম্মানী, স্পেন এবং ইউরোপের অন্যান্য বড় বড় রাজ্যে এই একই ব্যাপার দেখা যায়।

ইউরোপ ছাড়িয়া জগতের অবশিষ্টাংশে দৃষ্টিপাত করিলেও এতৎসদৃশ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। সর্ব্বত্রই দেখিব, রাজশক্তি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে; সমাজের যত কিছু প্রতিষ্ঠান, তন্মধ্যে রাজতন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও স্থায়ী; যেখানে ইহা নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, সেখানে ইহাকে ঠেকাইয়া রাখা যেমন দুঃসাধ্য, যেখানে ইহা পূর্ব্ব হইতে আছে, সেখানে ইহার উচ্ছেদ সাধন করাও তেমনি দুরূহ। আদিম কাল হইতে ইহা সমগ্র এশিয়াখণ্ড অধিকার করিয়া আছে। যখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল, তখন দেখা গেল, সেখানেও নানা বিচিত্র আকারে রাজতন্ত্রেরই প্রাধান্য। আফ্রিকার মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া যেখানে যেখানে ব্যাপক বিস্তৃত জাতির সন্ধান পাই, সেই-খানেই রাজতন্ত্রের প্রাধান্য। রাজতন্ত্র যে সর্ব্বত্র প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা নহে, সে নানা বিচিত্র অবস্থা, সভ্যতার নানা বিচিত্র স্তরের পক্ষে নিজকে উপযোগী করিয়া লইয়াছে; কোথাও বা সভ্যতার প্রাদুর্ভাব, কোথাও বা বর্ব্বতার; কোথাও বা চীনের মত শান্তিপ্রিয় জনসমাজ, কোথাও বা দুর্দ্দান্ত সামরিক সমাজ—সর্ব্বত্রই রাজতন্ত্র অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার দ্বারা স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। জাতিভেদসঙ্কুল শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও ইহার যেমন প্রতিপত্তি, সাম্যধর্ম্মী সর্ব্বপ্রকার স্থায়ী শ্রেণীবৈষম্যের প্রতিকূল জনসমাজেও ইহার তেমনি প্রতিপত্তি। কোথাও বা ইহা যথেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, কোথাও বা ইহা সভ্যতা ও স্বাধীনতার অনুকূল। ইহা এমনভাবে গঠিত যে, যে কোন দেহের উপর ইহাকে মস্তকের মত বসাইয়া দেওয়া যায়; ইহা এমন একটী ফল, যাহা নানা বিভিন্ন প্রকারের বীজ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে।

ইহা যদি সত্য হয়, বাস্তবিক পক্ষে যদি রাজতন্ত্রের প্রভাব এতটা ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে শুদ্ধমাত্র ইহা হইতেই

আমরা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। আমি কেবল দুইটী সিদ্ধান্তের কথা তুলিব। প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে—রাজতন্ত্রের এই ব্যাপক প্রভাব শুদ্ধমাত্র কোন আকস্মিক কারণ বা বলপ্রয়োগ বা জোরজবরদস্তি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। নিশ্চয়ই রাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার সহিত ব্যক্তিমানব বা মানব-সমাজের একটা প্রকৃতিগত মিল আছে। রাজতন্ত্রের উদ্ভবের সহিত অবশ্য বলপ্রয়োগের যোগ আছে, এবং ইহার উন্নতির ইতিহাসেও যে বল একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন দেখিতে পাই, একটি প্রতিষ্ঠান বহু শতাব্দী ধরিয়া নানা বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পুষ্টি ও বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তখন এ ব্যাপারটা শুধু বলের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে বলা যায় না। মানবব্যাপারে বলের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু কোন মানবব্যাপারই মূলতঃ বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা চালিত হয় না। বল যে ক্ষেত্রে কাজ করে, তাহার ঊর্দ্ধে একটা নৈতিক শক্তির ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং এই নৈতিক শক্তির দ্বারাই বৃহৎ বৃহৎ মানবব্যাপারের গতিপরিণতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তিমানবের পরিণতির ইতিহাসে দেহের যে স্থান, সমাজের ইতিহাসে বলের সেই স্থান। মানুষের জীবনে দেহের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে, তথাপি দেহ জীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তি নহে। জীবনীশক্তি দেহের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু দেহ হইতে তাহার উদ্ভব নহে। মানবসমাজের পক্ষেও তদ্রূপ। মানব-সমাজের ইতিহাসে বল যত বড় স্থানই অধিকার করুক না কেন, সে সমাজ বল দ্বারা শাসিত নহে, বল মানবসমাজের চরম ভাগ্যনিয়ন্তা নহে। মানুষের চিন্তাশক্তি, মানুষের নৈতিকশক্তি, বলের বাহ্য আস্ফালনের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। রাজ-

তন্ত্র যে এতটা সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহার মূলে শুধু বল নহে, এইরূপ একটা নৈতিক কারণ বর্ত্তমান।

রাজতন্ত্রের সফলতাসম্পর্কে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—ইহার নমনীয়তা। নানা বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া লইয়া ইহা সর্ব্বাবস্থার পক্ষে উপযোগিতা লাভ করিতে পারে। এ দিকে দেখুন, ইহার স্বরূপ কেমন সরল, সুনির্দ্দিষ্ট, অপরিবর্ত্তনশীল; অথচ কত বিসদৃশ সমাজে ইহা প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে বৈচিত্র্যের অবকাশ রহিয়াছে, মানব-মনের বা মানব-সমাজের নানা বিচিত্র উপাদানের সহিত নিশ্চয়ই প্রকৃতিগত যোগ আছে।

এ পর্য্যন্ত রাজতন্ত্রপ্রতিষ্ঠান সমগ্রভাবে কেহ আলোচনা করেন নাই। একদিকে দেখিতে হইবে, ইহার বিশিষ্ট স্থায়ী প্রকৃতিটি কি, নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে যাহা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছে, রাজতন্ত্রের সেই মৌলিক সত্তাটি কি। অন্য দিকে দেখিতে হইবে, অবস্থা-ভেদে ইহা কি কি বিচিত্র আকার ধারণ করিতে পারে, কোন্ কোন্ বিভিন্ন নীতি ও আদর্শের সহিত ইহা সংযোগ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। এই উভয় দিক্ দিয়া রাজতন্ত্রের এইরূপ ব্যাপক আলোচনা হয় নাই বলিয়াই, জগতের ইতিহাসে ইহার স্থান কতটুকু, তাহা সকল সময়ে উপলব্ধ হয় নাই, ইহার প্রকৃতি ও পরিণাম সম্বন্ধে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা পোষিত হইয়াছে।

আমি এখন আপনাদের সহিত এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে এই রাজতন্ত্রপ্রতিষ্ঠানের প্রভাব সম্বন্ধে একটা যথাযথ ও সমগ্র ধারণা যাহাতে হয়, আমি সেই চেষ্টাই করিব। এই প্রভাবের কতটুকুই বা রাজতন্ত্রের মূলপ্রকৃতিসম্ভূত আর কতটুকুই বা অবস্থাভেদজনিত, তাহা বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজতন্ত্রের প্রভাবের মূলে একটা নৈতিক শক্তি বিদ্যমান। এই নৈতিক শক্তি কোথায় নিহিত? যে মানুষটী আজ রাজা হইয়া রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছেন, শুদ্ধমাত্র তাঁহারই ব্যক্তিগত ইচ্ছার মধ্যেই কি এই নৈতিক শক্তি নিহিত? নিশ্চয়ই না। একটী-মাত্র মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ, অব্যবস্থিত, অসংলগ্ন ও অজ্ঞানান্ধ। সমগ্র জনসমাজ যখন রাজতন্ত্রকে একটা সুব্যবস্থ প্রতিষ্ঠান-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, দার্শনিকগণ যখন ইহাকে শাসনপদ্ধতি হিসাবে সমর্থন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই রাজতন্ত্র বলিতে একজন মাত্র মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছার শাসন বুঝেন নাই।

রাজশক্তি শুদ্ধমাত্র একজন ব্যক্তিমানবের ইচ্ছাশক্তি নহে, যদিও বাহ্যতঃ ইহা সেই আকারে দেখা দেয় বটে; ন্যায়ধর্ম্মই রাজা; মানুষ রাজা ন্যায়ধর্ম্মের বিগ্রহ মাত্র। যে রাজশক্তি সমাজশাসনের একমাত্র অধিকারী, তাহা এমন একটা ইচ্ছাশক্তি, যাহা স্বভাবতঃই জ্ঞানবুদ্ধি-সম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ, অপক্ষপাতী, বিশেষ বিশেষ মানবের ব্যক্তিগত ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট। এই উৎকর্ষের বলেই সে সমাজ শাসনের অধিকারী। সুতরাং ইহা কখনও রাজনামধারী ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা হইতে পারে না। জনসমাজ রাজা বলিতে এই আদর্শ সত্তাই বুঝিয়াছে এবং এই ভাবে প্রণোদিত হইয়াই তাহারা রাজতন্ত্রের শাসন মানিয়া আসিতেছে।

ইহা কি সত্য যে, ন্যায়ধর্ম্মের রাজত্ব বলিয়া কোন একটা পদার্থের অস্তিত্ব আছে? বাস্তবিক কি কোথাও এমন একটা আদর্শ ইচ্ছাশক্তি আছে, যাহা মানুষকে শাসন করিবার ন্যায্য অধিকারী? মানুষ যে ইহা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কারণ, মানুষ বরাবরই এই আদর্শ ইচ্ছাশক্তির অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে, এবং

না চাহিয়া থাকিতে পারে না। একটা সমগ্র জাতির কথা ছাড়িয়া দিউন, শুদ্ধমাত্র একটি ক্ষুদ্রতম জনমণ্ডলীর ধারণা করুন। মনে করুন, সেই মণ্ডলী এমন একজন রাজা দ্বারা শাসিত, যাহার অধিকার শুদ্ধমাত্র বলের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে যুক্তিও মানে না, ন্যায়ধর্ম্মও মানে না, সত্যও মানে না। মানবপ্রকৃতি এ প্রকার শাসনের ধারণা পর্য্যন্ত করিতে অনিচ্ছুক। সে কেবল ন্যায়ের শাসন মানিতে চায়, যেখানে ন্যায্য অধিকার আছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে মস্তক অবনত করিতে প্রস্তুত নহে। ইতিহাস এই সার্ব্বজনীন সত্যের প্রত্যক্ষ বিবৃতি ভিন্ন আর কি? জাতীয় জীবনে যে সকল বড় বড় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেগুলি ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মানুষের সাগ্রহ চেষ্টা ভিন্ন আর কি? শুধু যে বিভিন্ন জাতি এই ন্যায়রাজ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তাহা নহে, দার্শনিকগণও ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, এবং অনবরত ইহার সন্ধানে নিযুক্ত থাকেন। নানা বিভিন্ন পদ্ধতির রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি এই ন্যায়শাসনাধিকারীর সন্ধান ভিন্ন আর কি? সমাজ শাসন করিবার ন্যায্য অধিকারী কে, এই প্রশ্ন ভিন্ন রাজনীতিশাস্ত্রের অন্য কি আলোচ্য বিষয় আছে? যাজকতন্ত্রবাদী বলুন, রাজতন্ত্রবাদী বলুন, অভিজাততন্ত্রবাদী বলুন আর গণ-তন্ত্রবাদীই বলুন, সকল পদ্ধতির রাজনীতিবেত্তাই দাবী করেন যে, তাঁহারাই কেবল ন্যায্য শাসনাধিকারীর সন্ধান পাইয়াছেন। সকলেই সমাজকে আশ্বাস দিতেছেন যে, তাঁহারা ন্যায্য অধিকারীর হস্তে সমাজের শাসনভার অর্পণ করিতে চান। তাই পুনরায় বলি, রাজনীতিবিদের চিন্তা ও জাতিসমূহের চেষ্টা উভয়ের এই একই লক্ষ্য।

ন্যায্য শাসনাধিকারীর অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া তাহারা থাকিবে কেমন করিয়া? এবং তাহারই সন্ধানে অবিরতভাবে নিযুক্ত না থাকিয়া

তাহার উপায় কি ? একটা নিতান্ত সামান্য বিষয় ধরুন ; ধরুন, একটি সমগ্র সমাজ বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি লোক অথবা একটিমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জীবনে একটা পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চাই বা একটা নূতন প্রভাব সঞ্চার করিতে চাই। ইহা করিতে হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র একটা নীতি অনুসরণ করিতে হয়, একটা ন্যায়সঙ্গত আদর্শ অনুসরণ ও পালন করিতে হয়। সামাজিক-জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশ লইয়াই ব্যাপৃত থাকুন অথবা বড় বড় ঘটনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকুন, সর্ব্বত্রই দেখিবেন, হয় কোন একটা নূতন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, না হয় কোন একটা ন্যায়যুক্তিসঙ্গত নূতন ভাবকে বাস্তব আকৃতি দিতে হইবে। এই আদর্শই সেই ন্যায্য শাসনাধিকারী, যাহার সন্ধানে একদিকে দার্শনিক, অন্য দিকে মানবসমাজ নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছে।

এই যে আদর্শ শাসনাধিকার, ইহা কতদূর পর্য্যন্ত স্থায়ী ও ব্যাপক-ভাবে একটা পার্থিব শক্তি বা একটি মানুষের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে ? এরূপ ধারণা কি পরিমাণে অসত্য ও বিপজ্জনক ? বিশেষ করিয়া রাজতন্ত্রের মধ্যে এই আদর্শশাসনাধিকারের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কি মনে করা উচিত ? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ও কতটুকু সীমার মধ্যে একজন বাস্তব মানুষকে এই আদর্শ রাজাধিকারের প্রতিরূপস্বরূপ মানিয়া লওয়া চলে ? এ সকল বড় বড় প্রশ্ন। এ সকল প্রশ্নের সমাধান করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নহে। তথাপি এগুলির উল্লেখ না করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না।

আমার বিশ্বাস, এবং সামান্য জ্ঞানেও বলে যে, এই ন্যায্য শাসনা-ধিকার সম্পূর্ণভাবে ও স্থায়িভাবে কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি হইতে পারে না। আমার মনে হয়, এই আদর্শ অধিকার কোন মানবশক্তিতে আরোপ করা মূলতঃ মিথ্যা ও বিপজ্জনক। এই নিমিত্ত শাসন-

শক্তি যে আকার বা যে নামই ধারণ করুক না কেন, তাহাকে বিধিনিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। এইজন্য বিজয়-মূলক, উত্তরাধিকারমূলক বা নির্ব্বাচনমূলক, সর্ব্বপ্রকার একেশ্বর শাসনতন্ত্র মূলতঃ অবৈধ। ন্যায্যশাসনাধিকারীর সন্ধানপ্রণালী লইয়া বিস্তর মতভেদ থাকিতে পারে, দেশকালবিশেষে সে প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে পারে,কিন্তু কোন কালে কোন দেশে কোন বৈধশাসনতন্ত্র একেশ্বর হইয়া থাকিতে পারে না।

এ কথা মানিয়া লইয়া ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে রাজতন্ত্র সর্ব্ববিধ পদ্ধতির মধ্যেই ন্যায্য শাসনাধিকারের বিগ্রহস্বরূপে দেখা দেয়। যাজকতন্ত্রের কথা শুনুন ; সে বলিবে, রাজা পৃথিবীতে ভগবানের বিগ্রহ ; অর্থাৎ রাজা ন্যায়, সত্য ও মঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি। আবার ব্যবহারশাস্ত্র-বিদ্‌দিগের কথা শুনুন ; তাঁহারা বলিবেন, রাজা আদর্শবিধির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ যে ন্যায়ধর্ম্ম সমাজশাসনের একমাত্র অধিকারী, রাজা সেই ন্যায়ধর্ম্মের বিগ্রহ। রাজতন্ত্র নিজে কি বলে শুনুন ; সে বলিবে, রাজা রাষ্ট্রের অর্থাৎ জনসমাজের সম্মিলিত স্বার্থের প্রতিভূ। রাজতন্ত্রকে যে দিক্ দিয়া যে সম্পর্কেই দেখুন না কেন, সর্ব্বত্রই সে একটা আদর্শ শাসনাধিকারের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ নিজকে প্রকটিত করিতে চাহে।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই যে ন্যায্য শাসনাধিকারী, ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ কি কি ? প্রথমতঃ তিনি এক ভিন্ন দুই হইতে পারেন না ; সত্য যখন এক, ন্যায়ধর্ম্ম যখন এক, তখন ন্যায্যশাসনা-ধিকারীও এক। তিনি সনাতন, তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই ; কারণ, সত্যের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। তাঁহার অবস্থান জগতের সমস্ত বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের ঊর্দ্ধে ; জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে তিনি কেবল সাক্ষী ও বিচারক। এখন দেখুন, এই আদর্শ শাসনাধিকারীর যাহা

কিছু প্রকৃতিগত লক্ষণ, তাহা রাজতন্ত্রের মধ্যে বাহ্যতঃ কেমন সরলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। বেঞ্জামিন কনষ্টান্টের গ্রন্থ খুলিয়া দেখুন; দেখিবেন, তিনি কেমন কৌশল সহকারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাজতন্ত্র একটা অপেক্ষপাতী সংযমধর্ম্মী শক্তি; সে সামাজিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, বিরোধ-সংঘর্ষের উর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া কেবল বড় বড় সঙ্কটকালে সমাজব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। মানবশাসনে আদর্শ শাসনাধিকারীর ব্যবহারও কি এইরূপ নহে? এ ধারণার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে, যাহা মানবচিত্তকে আকর্ষণ করে; কারণ, ইহা কেবল গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ নহে,বাস্তব ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। একজন রাজা ব্রাজিলের শাসনতন্ত্রে এই ধারণার উপরেই তাঁহার সিংহাসনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন; সেখানে রাজশক্তি অন্যান্য সক্রিয় শক্তির উর্দ্ধে নিষ্ক্রিয় সাক্ষী, বিচারক, এবং নিয়ামক-স্বরূপে বিরাজ করিতেছে।

রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানটিকে যে দিক্ দিয়াই বিচার করিয়া দেখুন, আদর্শ শাসনাধিকারীর সহিত যে দিক্ দিয়াই তুলনা করিয়া দেখুন, দেখিবেন, উভয়ের মধ্যে অনেকটা বাহ্য সাদৃশ্য আছে এবং ইহা যে মানুষের চিত্তকে সহজে আকর্ষণ করিবে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই জন্য যখনই মানুষের চিন্তা বা কল্পনা আদর্শ-শাসনাধিকারীর প্রকৃতি-পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছে, তখনই তাহারা রাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। যখন মানুষের মনে ধর্ম্মভাবের আধিপত্য, তখন ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে মানুষের মনের গতি এই রাজতন্ত্রের দিকেই পরিচালিত হইয়াছে। আবার যখন সমাজে ব্যবহারবিদের আধিপত্য, তখন ন্যায়ধর্ম্মই সমাজের যথার্থ রাজা, এই ধারণায় সকলে অভ্যস্ত হইয়া গেল, এবং রাজতন্ত্রই যে এই ন্যায়ধর্ম্মের বাস্তব মূর্ত্তি, এ ধারণাও সহজে

প্রসার লাভ করিল। যখনই মানুষ মনোনিবেশসহকারে এই আদর্শ শাসনাধিকারীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়াছে, তখনই রাজতন্ত্রের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছে; কারণ, সাধারণের চক্ষে রাজতন্ত্র এই আদর্শের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ।

তাহা ছাড়া এমন অনেক সময় আসে, যখন সমাজের অবস্থা বিশেষ করিয়া এইরূপ ধারণার অনুকূল। মানব ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ যুগে ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য নানা সঙ্কটসংশয়ের মধ্যে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পায়; তখন সমাজের ব্যক্তিমাত্রই অজ্ঞানের দরুনই হউক বা পাশবতার দরুনই হউক বা দুর্নীতির দরুনই হউক, আত্মসর্ব্বস্বভাবে জীবন যাপন করে। তখন সমাজ ব্যক্তিগত বিরোধে বিপর্য্যস্ত হইয়া, জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া এমন একটা রাজশক্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, যাহার নিকট সকলকে বাধ্য হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। এমন সময়ে যখনই তাহারা এমন একটা শাসনশক্তির সন্ধান পায়, যাহার মধ্যে আদর্শ-শাসনাধিকারীর কোন লক্ষণ পাওয়া যায়, তখনই সমাজ সেই শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিরাপদ্ হইতে চাহে। জাতিসমূহের উচ্ছৃঙ্খল যৌবনকালের আলোচনায় আমরা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে সকল যুগে জাতীয় জীবন সতেজ অথচ উচ্ছৃঙ্খল, চারিদিকে যখন অরাজকতার প্রাদুর্ভাব, সমাজ যখন নিজেকে সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে চায় অথচ সমাজস্থ ব্যক্তিসমূহের সম্মিলিত স্বাধীন ইচ্ছার সাহায্য পায় না, সেই সেই যুগের পক্ষে রাজতন্ত্র বিশেষভাবে উপযোগী। আবার অনেক সময় আসে, যখন সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে সমাজে রাজতন্ত্রের একই রূপ উপযোগিতা ঘটে। রোমীয় গণতন্ত্রের অবসানকালেই রোমীয় সাম্রাজ্য এক প্রকার বিলয়োন্মুখ বলা

যায়; অথচ সেই সাম্রাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া জীর্ণাবস্থায় সুদীর্ঘ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াও টিকিয়া রহিল কেমন করিয়া? ইহা কেবল রাজতন্ত্রের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। সমাজ তখন ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার প্রভাবে কেবলই খণ্ডবিখণ্ড হইয়া চলিয়াছিল; কেবল রাজতন্ত্রই তাহাকে কোনমতে বাঁচাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। রোমীয় জগৎকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য সম্রাট্-শক্তি পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া লড়াই করিয়াছিল।

অতএব এমন অনেক সময় আসে, যখন রাজতন্ত্রই কেবল ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে; আবার অনেক সময় আসে, যখন রাজতন্ত্রই সমাজের গঠনক্রিয়ার সহায়তা করে। অন্যান্য শাসনতন্ত্র অপেক্ষা রাজতন্ত্রের মধ্যে সুস্পষ্টতর ও প্রবলতর ভাবে আদর্শ-শাসনাধিকারের রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই ইতিহাসে রাজতন্ত্রের এত প্রভাব।

অতএব যে দিক্ হইতে যে যুগেই রাজতন্ত্রের আলোচনা করুন না কেন, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ, ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, ইহার যথার্থ গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, ইহা সেই আদর্শ শাসনাধিকারের প্রতিরূপ, যাহারই কেবল সমাজশাসনে ন্যায্য অধিকার আছে।

এখন আর এক দিক্ হইতে রাজতন্ত্রের বিচার করা যাউক। ইহার গঠনবৈচিত্র্য, ইহার ক্রিয়াবৈচিত্র্য, ইহার প্রভাববৈচিত্র্য – এই বৈচিত্র্যের দিক্ হইতে ইহার আলোচনা করা যাউক। এই সকল বৈচিত্র্যের কারণ কি, তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

এখানে আমাদের একটা সুবিধা আছে। আমরা একেবারেই ইতিহাসের ক্ষেত্রে নামিয়া যাইতে পারি। নানা ঘটনার সমবায়ে এক ইউরোপের মধ্যেই রাজতন্ত্র সর্ব্বপ্রকার রূপই ধারণ করিয়াছে। রাজ-

তন্ত্রের যত প্রকার রূপ হওয়া সম্ভব, ইউরোপের রাজতন্ত্র তাহাদের সমষ্টিস্বরূপ। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার ইতিহাস একবার আলোচনা করিয়া লওয়া যাউক। আপনারা দেখিবেন, ইহা কত বিভিন্নরূপে উপস্থিত হইয়াছে, এবং যে বৈচিত্র্য, জটিলতা ও বিরোধ সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃতি, তাহাই বা ইহার ইতিহাসে কতখানি লক্ষ্য করা যায়।

পঞ্চম শতাব্দীতে জার্ম্মান আক্রমণের সময়ে দুইটী রাজতন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—একটী বর্ব্বর রাজতন্ত্র, অপরটি রোমীয় সম্রাট্-তন্ত্র,—ক্লোবিসের রাজতন্ত্র ও কন্‌ষ্টানটাইনের রাজতন্ত্র। উভয়ের মূলনীতি ও পরিণামে মূলগত পার্থক্য। বর্ব্বর রাজতন্ত্র নির্ব্বাচনমূলক; জার্ম্মান রাজগণ নির্ব্বাচিত হইতেন, যদিও নির্ব্বাচনপ্রণালী আধুনিক নির্ব্বাচন-প্রণালীর মত নহে। তাঁহারা ছিলেন সামরিক নেতা; তাঁহাদের বহুসংখ্যক সহচর যাহাতে তাঁহাদের শাসন স্বাধীনভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, সেই জন্য শৌর্য্য সামর্থ্যের উৎকর্ষ দেখাইয়া তাহাদের সম্মতি তাঁহাদিগকে অর্জ্জন করিয়া লইতে হইত। নির্ব্বাচন বর্ব্বর-তন্ত্রের মূল, ইহাই তাহার আদিম ও বিশিষ্ট লক্ষণ।

অবশ্য পঞ্চম শতাব্দীতেই এই লক্ষণটি যে কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত হয় নাই বা রাজতন্ত্রের মধ্যে নানা বিভিন্ন উপাদান যে প্রবেশ লাভ করে নাই, তাহা নহে। কিছু দিন ধরিয়া বিভিন্ন জাতির নিজ নিজ দলপতি ছিল। কোন কোন পরিবার অন্যান্য পরিবার অপেক্ষা ধন-মান-প্রতিপত্তিতে উন্নত হইয়াছিল। ইহা হইতে উত্তরাধিকারের সূত্রপাত হইল। এখন এই সকল পরিবার হইতেই দলপতি নির্ব্বাচিত হইতে লাগিল। নির্ব্বাচন-নীতির সহিত যে সকল বিভিন্ন নীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, তন্মধ্যে ইহাই প্রথম।

আর একটি উপাদান এই সময়ের মধ্যেই বর্ব্বর রাজতন্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; তাহা ধর্ম্ম। গথ্ প্রভৃতি কোন কোন বর্ব্বর জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, তাহাদের রাজপরিবার দেবপরিবার হইতে উদ্ভূত, অথবা ওডিন প্রভৃতি যে সকল বীরপুরুষকে তাহারা দেবতায় পরিণত করিয়াছিল, সেই সকল বীরপুরুষ হইতে উদ্ভূত। হোমার-বর্ণিত রাজগণও এইরূপ দেবতা বা উপদেবতার বংশধররূপে পরিচিত ছিলেন, এবং এই দৈব উদ্ভবের অধিকারেই তাঁহারা এক প্রকার ভক্তির পাত্র ছিলেন।

এই ছিল পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ব্বর রাজতন্ত্রের প্রকৃতি; তখনই ইহা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, যদিও ইহার মূলনীতি তখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

এইবার রোমীয় রাজতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক; ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। রোমীয় রাজতন্ত্র রোমীয় রাষ্ট্রের বিগ্রহ-স্বরূপ; ইহা রোমীয় জনবর্গের প্রভুত্বগৌরবের উত্তরাধিকারী। অগষ্টস্ ও টাইবেরিয়সের রাজতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন, সম্রাট্ অভিজাততন্ত্র সিনেট, জনতন্ত্র কমিশিয়া ও সমগ্র রোমীয় গণতন্ত্রের প্রতিনিধি, তিনি তাহাদিগের উত্তরাধিকারী ও সমষ্টিস্বরূপ। প্রথম সম্রাট্দিগের, অন্ততঃ তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও বিচারক্ষম, তাঁহাদের বিনয়-নম্র ভাষার মধ্যে এই তথ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। যে জনশক্তি রোমীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল, সে যেন সম্রাট্দিগের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছে, সম্রাট্গণ সেই পূর্ব্বতন প্রভুর সম্মুখে সর্ব্বদাই যেন সশঙ্কিত থাকিতেন; সম্রাট্গণ প্রতিনিধিস্বরূপে, অমাত্য বা মন্ত্রিস্বরূপে সেই জনশক্তিকে সম্বোধন করিতেন; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা জনতন্ত্রের সমস্ত ক্ষমতাই

স্বয়ং পরিচালন করিতেন। এই রূপান্তর বোঝা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে, আমরা নিজেই এইরূপ একটা রূপান্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আমরা দেখিয়াছি, কেমন করিয়া জনশক্তি জনসাধারণের নিকট হইতে একজন মানুষের হস্তে গিয়া ন্যস্ত হয়; নেপোলিয়নের ইতিহাস ত ইহা ভিন্ন আর কিছু নহে। তিনিও ত প্রভু জনসমাজের বিগ্রহ ও প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি জনবর্গকে সম্বোধন করিয়া কেবলই বলিতেন,—"আমার মত কে এক কোটি আশী লক্ষ লোকদ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, আমার মত কে ফরাসী গণতন্ত্রের প্রতিনিধি?" এবং যখন তাঁহার মুদ্রার এক পৃষ্ঠে পাঠ করি "ফরাসীগণতন্ত্র" এবং অন্য পৃষ্ঠে পাঠ করি "সম্রাট্ নেপোলিয়ন," তখন ইহার অর্থ কি এই বুঝি না যে, জনসমাজই রাজা হইয়াছে?

সম্রাট্তন্ত্রের ইহাই মূলগত প্রকৃতি, এবং এই প্রকৃতি সে প্রথম তিন শতাব্দী ধরিয়া রক্ষা করিয়াছিল। ডায়োক্লিশিয়ানের পূর্ব্বে ইহা সম্পূর্ণ ও সুনির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করে নাই। তখন কিন্তু ইহা একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইয়াছে; এক নূতন ধরণের রাজতন্ত্র তখন প্রায় দেখা দিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম তিন শতাব্দী ধরিয়া সমাজের মধ্যে একটা ধর্ম্মের ছাপ দিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। কন্‌ষ্টাণ্টাইনের সময়ে সে ধর্ম্মের আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য না হউক, ধর্ম্মকে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে একটা বৃহৎ স্থান দিতে সমর্থ হইল। রাজতন্ত্র এখন আর এক রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইল। ইহার মূল এখন আর পার্থিব নহে; রাজা এখন আর স্বরাষ্ট্র গণতন্ত্রের প্রতিনিধি নহেন। তিনি এখন ভগবানের বিগ্রহ, ভগবানের পার্থিব প্রতিনিধি। তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার এখন উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে; প্রাচীন সম্রাট্তন্ত্রে তাহা নীচে হইতে উঠিয়া আসিত। এই উভয় অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য এবং উভয় অবস্থার পরিণামও বিভিন্ন। ধর্ম্মমূলক রাজতন্ত্রের সঙ্গে

প্রজাবর্গের স্বাধীন রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতির সামঞ্জস্যসাধন দুরূহ; কিন্তু এ রাজতন্ত্রের মূলনীতি খুব উন্নত, নীতিসঙ্গত এবং কল্যাণকর। সপ্তম শতাব্দীতে ধর্ম্মমূলক রাজতন্ত্রের মধ্যে রাজা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, দেখা যাউক। টোলেডো সংসদের বিধানমালা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাউক।

"রাজাকে রাজা (rex) বলা হয়; কারণ, তিনি ন্যায়ধর্ম্ম (recte) অনুসারে শাসন করেন। তিনি যদি ন্যায়ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি রাজোপাধি ধারণের যথার্থ অধিকারী। যদি তিনি অন্যায়রূপে কার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া রাজোপাধি হইতে বঞ্চিত হন। সেই জন্যই আমাদের পিতৃপুরুষেরা যুক্তিসহকারেই বলিতেন,—'ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যপরায়ণতা, এই দুইটিই প্রধান রাজগুণ।'

"প্রজাদিগের ন্যায় রাজাও বিধিবিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য। ভগবানের ইচ্ছা মানিয়া চলিলেই আমরা ও আমাদের প্রজাবর্গ ভাল ভাল বিধিবিধান পাইতে পারি, এবং এই সকল বিধিবিধান আমরা, আমাদের উত্তরাধিকারিগণ ও সমগ্র প্রজাবর্গ মানিয়া চলিতে বাধ্য।

"সর্ব্বস্রষ্টা ভগবান্ মানবশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাজাইবার সময় মস্তককেই উচ্চে স্থান দিয়াছেন, এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্নায়ুগুলিকে এই মস্তক হইতেই নির্গত করাইয়াছেন। এবং তিনি মস্তকের মধ্যে মশালস্বরূপ চক্ষুদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন, যেন সেখান হইতে যাহা কিছু ক্ষতি-বিঘ্নকর, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। তিনি বুদ্ধি দিয়াছেন এবং এই বুদ্ধির হস্তে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার দিয়াছেন। অতএব আমাদিগকে প্রথমে রাজসম্পর্কীয় বিষয়ে বিধিবন্ধন করিতে হইবে, রাজগণ যাহাতে নিরাপদে থাকিতে পারেন, তাহার

ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাঁহাদের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পরে প্রজা সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপে যেমন রাজগণের রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল,সেইরূপ রাজগণও আবার প্রজাগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।"

কিন্তু ধর্ম্মমূলক রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রায়ই রাজতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির অন্য একটি উপাদান অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। রাজশক্তির পার্শ্বে এক নূতন শক্তির সমাবেশ ঘটিল। সে শক্তি রাজশক্তির মূলস্বরূপ যে ভগবচ্ছক্তি, তাহার সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই শক্তির নাম যাজকতন্ত্র। যাজকতন্ত্র ভগবান্ ও রাজার মধ্যবর্ত্তী, রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সুতরাং ঐশ্বরিক শক্তির প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ যে রাজা, তাঁহার ক্রমশঃ ভগবদ্বিধানের মানবব্যাখ্যাতা যাজকবৃন্দের হস্তে যন্ত্রস্বরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ঘটিল। রাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যপরিণতির বৈচিত্র্যের এই একটা নূতন কারণ জুটিল।

পঞ্চম শতাব্দীতে রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর যে কয়-প্রকার বিভিন্ন রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়াছিল, এখানে তাহাদের সকলগুলিকেই পাইলাম:—(১) বর্ব্বর রাজতন্ত্র, (২) সম্রাট্‌তন্ত্র, এবং (৩) উদীয়মান ধর্ম্মমূলক রাজতন্ত্র। তাহাদের মূলনীতিতে যেরূপ বৈচিত্র্য, তাহাদের পরিণতিও সেইরূপ বিচিত্র।

ফ্রান্সে প্রথম রাজবংশের আমলে বর্ব্বর রাজনীতিরই প্রাদুর্ভাব ছিল। যাজকসম্প্রদায় ইহাকে সম্রাট্‌তন্ত্র বা ধর্ম্মতন্ত্রের আদর্শে গড়িয়া তুলিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু রাজপরিবারের মধ্য হইতে রাজনির্ব্বাচন, এই নীতিরই প্রাধান্য রহিয়া গেল। যাজকদিগের প্রভাবে এই নীতির সহিত উত্তরাধিকারনীতি ও ধর্ম্মনীতির কথঞ্চিৎ

সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল মাত্র। ইটালীতে অষ্ট্রোগথ দিগের মধ্যে সম্রাট তন্ত্র বর্ব্বর রাজনীতির স্থান অধিকার করিয়া বসিল। থিওডোরিক নিজকে রোমীয় সম্রাট দিগের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেবলমাত্র কাসিওডোরসের গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাঁহার শাসনতন্ত্রের এই বিশিষ্ট প্রকৃতির পরিচয় পাইবেন।

স্পেনে রাজতন্ত্র অন্য স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধর্ম্মনীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। যদিও টোলেডোর ধর্ম্মসংসদ্ দেশের সর্ব্বময় প্রভু ছিল না, তথাপি বিসীগথ রাজবৃন্দের শাসনতন্ত্রে না হউক, তাঁহাদিগের যাজক-প্রণোদিত বিধিবিধানে, তাঁহাদের যাজকপ্রবর্ত্তিত ভাষায় ধর্ম্মতন্ত্রের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডে সাক্সনদিগের মধ্যে বর্ব্বর রাজনীতি প্রায় অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। হেপ্টার্কি বা সপ্তরাজ্যের এক একটি রাজ্য এক একটি দলের অধিকৃত ভূখণ্ড, প্রত্যেক দলের একটি করিয়া দলপতি ছিল। অন্যত্রাপেক্ষা এখানে সামরিক নির্ব্বাচনপ্রথার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এইরূপে অবস্থাভেদে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের নানা বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠিল। এ যুগে এত বিশৃঙ্খলা যে, কোন সার্ব্বজনীন বা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। নানা পরিবর্ত্তনপরম্পরার মধ্য দিয়া অবশেষে আমরা অষ্টম শতাব্দীতে আসিয়া উপনীত হই, তখনও পর্য্যন্ত রাজতন্ত্র কোথাও একটা নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে নাই। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিতীয় ফ্রাঙ্করাজবংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাবলী অনেকটা সংহত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইতিহাসের ঘটনাবলী এখন ব্যাপক আকারে সম্পন্ন হইতে লাগিল, সুতরাং সেগুলি বুঝিবার পক্ষেও সুবিধা হইল, তাহাদের প্রভাবও বৃদ্ধি পাইল। এখন

শীঘ্রই দেখিবেন, বিভিন্ন রাজতন্ত্র কেমন করিয়া পরস্পরের স্থান অধিকার করিতেছে ও পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতেছে।

যখন কার্লোবিঙ্গীয় রাজগণ মেরোবিঙ্গীয়দিগের স্থান গ্রহণ করিল, তখন বর্ব্বররাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করা যায়; পুনরায় নির্ব্বাচন-নীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পেপিন সোয়াসোঁ (Soisson) নগরে নিজকে নির্ব্বাচিত করাইয়া লইলেন। প্রথম কার্লোবিঙ্গীয়গণ যখন পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেন, তখন তাঁহারা রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্মতি লইতে যত্নবান্ হইতেন। যখন তাঁহারা রাজ্য ভাগ করা আবশ্যক মনে করিতেন, তখন জাতীয় মহাসমিতির অনুমতি গ্রহণ করিতেন। এক কথায় নির্ব্বাচননীতি সম্মতিগ্রহণ আকারে পুনরায় কিয়ৎপরিমাণে বাস্তবতা লাভ করিল। আপনারা মনে রাখিবেন, এই রাজবংশ পরিবর্ত্তনের অর্থ পশ্চিম ইউরোপে একটা নূতন জার্ম্মান আক্রমণ; সুতরাং ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন জার্ম্মান রীতিনীতির কতকটা ছায়া নূতন করিয়া আবির্ভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের মধ্যে ধর্ম্মনীতি আরও সুস্পষ্টরূপে প্রবেশ লাভ করিল এবং তাহার প্রভাবও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পেপিন পোপকর্ত্তৃক স্বীকৃত ও অভিষিক্ত হইলেন। ধর্ম্মতন্ত্রের অনুমোদন ও সহায়তা তাঁহার আবশ্যক ছিল; ধর্ম্মতন্ত্র তৎপূর্ব্বেই প্রভূত পরাক্রম লাভ করিয়াছে, পেপিন কাজে কাজেই তাহার নিকট উপযাচক হইলেন। শার্লমেনও সেই সতর্কতা অবলম্বন করিলেন; ধর্ম্মমূলক রাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি শার্লমেনের সময়ে রাজতন্ত্রের এই নূতন লক্ষণ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই; তিনি যে রাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা রোমীয় সম্রাট্‌তন্ত্র। যদিও তিনি যাজকসম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন

এবং তাঁহাদিগকে স্বকার্য্য সাধনের সহায়স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি কখনই তাঁহাদিগের হস্তে যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়েন নাই। একটা বিশাল রাজ্যের কল্পনা, একটা বিরাট্ রাষ্ট্রীয় ঐক্য, এক কথায় রোমীয় সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন, ইহাই ছিল শার্লমেনের স্বপ্ন ও লক্ষ্য। তাঁহার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার সিংহাসনে লুই ল্য ডবনেয়ার (Louis le Debonnaire) আরূঢ় হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্র যে কি প্রকৃতি ধারণ করিল, তাহা সকলেই জানেন। রাজা এখন যাজকবৃন্দের হাতে পড়িলেন; তাঁহারা তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন, রাজ্যচ্যুত করিলেন, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন ও তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-রাজতন্ত্র পূর্ব্বে সামান্য আকারে দেখা গিয়াছিল, এখন তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জোগাড় করিল।

এইরূপে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ত্রিবিধ রাজতন্ত্রের বৈচিত্র্য কতকগুলি বড় বড় সুসম্বদ্ধ সুস্পষ্ট ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইল।

লুই ল্য ডবনেয়ারের মৃত্যুর পর ইউরোপ পুনরায় যে প্রলয়াবর্ত্তে নিমজ্জিত হইল, তাহার মধ্যে ত্রিবিধ রাজতন্ত্র একসঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সমস্তই তখন বিশৃঙ্খল। কিয়ৎকাল পরে যখন ফিউড্যাল্ ভূস্বামিতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইল, তখন ফিউড্যাল্ রাজতন্ত্ররূপ এক চতুর্থ প্রকারের রাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান হইল। এ রাজতন্ত্রের প্রকৃতি বড় জটিল, সহজে ইহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যায় না। বলা হইয়া থাকে যে, ফিউড্যাল্ পদ্ধতিতে রাজা হইতেছেন রাজগণের রাজা, ভূস্বামিবৃন্দের ভূস্বামী; শ্রেণীপরম্পরাক্রমে তিনি সমগ্র সমাজকে সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রজাদিগকে আহ্বান করিয়া সমগ্র জাতিকেই তিনি তলব দিতে পারেন এবং এইরূপে দেখাইতে

পারেন যে, তিনি যথার্থই রাজা। আমি স্বীকার করি যে, ইহাই ছিল ফিউড্যাল্ রাজতন্ত্রের পুথিগত তত্ত্ব; কিন্তু ইহা তত্ত্বমাত্র। বাস্তবরাজ্যে এ তত্ত্ব কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। একটা শ্রেণীপরম্পরাবিন্যস্ত শৃঙ্খলার দ্বারা সাধারণ সমাজের উপর রাজার প্রভাব বিস্তার, সমগ্র ফিউড্যাল্ সমাজের সহিত রাজার নানা বিচিত্র সম্বন্ধবন্ধন, এ সমস্ত তত্ত্ববিদ্‌গণের স্বপ্নমাত্র। বাস্তবিকপক্ষে অধিকাংশ ফিউড্যাল্ ভূস্বামী এ সময়ে সম্পূর্ণরূপে রাজশাসনের বাহিরে ছিলেন; অনেকে রাজার নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না এবং রাজার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। সমস্ত শাসনতন্ত্রই তখন নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত ছিল। ভূস্বামীদিগের মধ্যে এক একজন হয় ত রাজোপাধি ধারণ করিতেন, কিন্তু এ উপাধি কেবল অতীতের স্মৃতি মাত্র, ইহাতে কোন বাস্তবতা ছিল না।

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রের অবস্থা এইরূপ ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে লুই ল্যা গ্রোর রাজত্বকালে একটা পরিবর্ত্তন আসিল। এখন রাজার নাম প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়; তাঁহার প্রভাব এখন এমন অনেক স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, যেখানে সে পূর্ব্বে কখনও প্রবেশপথ পায় নাই; সমাজে রাজার সক্রিয়তা এখন অনেক বাড়িয়াছে। কোন্ অধিকারের বলে রাজার প্রভাব এতটা বাড়িয়া গেল, ইহা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, পূর্ব্বে যে সকল অধিকার রাজা দাবী করিতেন, তাহার কোনটিরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। রাজা এখন রোমক সম্রাটের উত্তরাধিকারিরূপে বা রোমক সম্রাট্‌তন্ত্রের অধিকারবলে রাজতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি বা সংহতি সাধন করিতেছেন না। সেইরূপ নির্ব্বাচনের বলেও নহে, ভগবচ্ছক্তির অবতারস্বরূপেও নহে। নির্ব্বাচনপদ্ধতির সমস্ত চিহ্ন এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, উত্তরাধিকার-

পদ্ধতি এখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এবং যদিও এখন রাজার অভিষেকে ধর্ম্মতন্ত্রের অনুমোদন থাকে, তথাপি লুই ল্য গ্রোর রাজ-তন্ত্রের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক আছে, কি না আছে, তাহা লইয়া লোকে আর মস্তিষ্ক চালনা করে না। রাজতন্ত্রের মধ্যে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন তত্ত্বের আবির্ভাব হইল; এক নূতন রাজতন্ত্রের সূচনা হইল।

এ কথার পুনরুক্তির আবশ্যক নাই যে, সমাজে এখন একটা বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, সমাজ এখন অবিরত নানা উপদ্রবে বিপর্য্যস্ত। এই দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঐক্য স্থাপনের জন্য, সমাজের নিজের কোন সামর্থ্য বা উপায় নাই। ভূস্বামীদিগের পার্লিয়ামেণ্ট, তাঁহাদিগের বিচারসভা,—অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দরুন এখন আমরা মনে করি যে, ফিউড্যাল্‌তন্ত্র বেশ একটা সুশৃঙ্খল, সুব্যবস্থ শাসনতন্ত্র ছিল—সে সমস্তই তখন শক্তিহীন, বাস্তবতারহিত। তাহার মধ্যে এমন কিছুই ছিল না, যাহাতে শৃঙ্খলা বা ন্যায়ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সুতরাং এই সামাজিক প্রলয়ের মধ্যে ঘোরতর অন্যায়ের প্রতিকারার্থ, ঘোরতর অমঙ্গলের নিবারণকল্পে, যথার্থ রাষ্ট্রশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে লোকে যে কাহার নিকট যাইবে, খুঁজিয়া পাইল না। রাজার নামমাত্র তখন অবশিষ্ট আছে, একজন ভূস্বামী সেই নাম অধিকার করিয়া আছেন; কেহ কেহ সেই রাজার নিকট শরণার্থী হইল। রাজশক্তি এ পর্য্যন্ত যে সকল বিভিন্ন অধিকারের দাবী করিয়া আসিয়াছে, সে সমস্ত অধিকারের এখন কোন প্রভাব ছিল না সত্য, তথাপি অনেকের মনে তাহার স্মৃতি জাগিয়া ছিল এবং সময়ে সময়ে এই সকল অধিকার স্বীকৃতও হইত। কখন কখনও লোকে কোন অকথ্য উপদ্রব দমন করিবার জন্য, বা রাজার আবাসগৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে শৃঙ্খলা স্থাপন

করিবার জন্য, অথবা কোন দীর্ঘকালব্যাপী কলহের মীমাংসা করিবার জন্য রাজার নিকট উপস্থিত হইত। কখন কখনও বা রাজার অধিকার-বহির্ভুক্ত ব্যাপারেও তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে বলা হইত। তিনি সাধারণ শৃঙ্খলার রক্ষকরূপে, অন্যায়প্রতিকারী ও মধ্যস্থরূপে এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। রাজার উপাধির সঙ্গে যে নৈতিক কর্ত্তৃত্ব-শক্তি জড়িত ছিল, তাহারই বলে ক্রমশঃ তিনি ক্ষমতা অর্জ্জন করিলেন।

লুই ল্য গ্রোর (Louis le Gros) রাজত্বকালে ও সুগেরের (Suger) শাসনে রাজতন্ত্র এই প্রকৃতি ধারণ করিল। সমাজের উপরে যে একটি ব্যাপক সার্ব্বজনীন শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, যে শক্তি পূর্ব্বকালের খণ্ড খণ্ড শাসনশক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, যে শক্তি দুর্ব্বল অক্ষমকে ন্যায়বিচার দান করিবে, যে শক্তি সমাজে শৃঙ্খলাস্থাপনে সমর্থ, শান্তিরক্ষাই যাহার প্রধান কর্ত্তব্য, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা ও বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দেওয়াই যাহার প্রধান ধর্ম্ম—এইরূপ একটা ধারণা আংশিক-ভাবে, ক্ষীণভাবে, অসংলগ্নভাবে লোকের মনে এই প্রথম দেখা দিল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপে এবং বিশেষ করিয়া ফ্রান্সে রাজতন্ত্র এই সম্পূর্ণরূপে নূতন আকার ধারণ করিল। রাজতন্ত্র এখন আর বর্ব্বররাজতন্ত্র নহে, ধর্ম্মরাজতন্ত্র নহে, সম্রাট্তন্ত্র নহে; ইহার ক্ষমতা এখন সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ।

ইহাই আধুনিক রাজতন্ত্রের যথার্থ মূল, ইহাই তাহার প্রাণতত্ত্ব; ইহার জীবনেতিহাসে এই তত্ত্বই বিকশিত হইয়াছে, এবং ইহারই বলে সে সফলতা লাভ করিয়াছে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে রাজতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি পুনরাবির্ভূত হইয়াছে; যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির রাজতন্ত্র লইয়া আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, তাহারা একে একে

পুনরায় প্রাধান্য লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছে। যাজকসম্প্রদায় সর্ব্বদা ধর্ম্মরাজনীতিই প্রচার করিয়াছেন; ব্যবহারবিদ্‌গণ বরাবর সম্রাট্‌তন্ত্রের পুনরুজ্জীবনকল্পে উদ্যম করিয়াছেন; এবং অভিজাতসম্প্রদায় কখন কখনও নির্ব্বাচনমূলক অথবা ফিউড্যাল্ রাজতন্ত্র ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছেন। শুধু যে যাজকবর্গ, ব্যবহারবিদবর্গ ও অভিজাতবর্গ রাজতন্ত্রের উপর নিজ নিজ ছাপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নহে, রাজতন্ত্রও এই সকল সম্প্রদায়কে নিজের প্রভাব পরাক্রম বৃদ্ধির সহায়-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে। রাজা সাময়িক প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনের বশে কখনও নিজেকে ভগবানের প্রতিনিধি, কখনও বা রোমক সম্রাটের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি অনধিকার সত্ত্বেও এই সকল উপাধি দাবী করিতেন বটে, কিন্তু এ সমস্ত উপাধিতে আধুনিক রাজতন্ত্রের মূল শক্তি নিহিত নাই। তাই পুনরায় বলি, সার্ব্বজনীন শান্তি শৃঙ্খলা, সার্ব্বজনীন ন্যায়ধর্ম্ম, এবং সমাজের সম্মিলিত স্বার্থের রক্ষক হিসাবেই রাজা লোকসমাজের অনুরাগ ও বশ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন ও লোকসমাজের সম্মিলিত শক্তির অধিকারী হইয়াছেন। যত অগ্রসর হইবেন, ততই দেখিবেন, দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আধুনিক রাজতন্ত্রের এই বিশিষ্ট প্রকৃতি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতেছে, বললাভ করিতেছে ও ইউরোপের বিশিষ্ট রাজনৈতিক স্বরূপ গঠন করিয়া চলিতেছে। এই প্রকৃতির বলেই রাজতন্ত্র ইউরোপীয় সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি, এই দুইটি মাত্র অঙ্গে পরিণত করিয়াছে।

অতএব ক্রুসেড্ যুদ্ধের অবসানকালে ইউরোপ যে পথে চলিতে আরম্ভ করে, সেই পথ অনুসরণ করিয়াই সে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং এই রূপান্তরে রাজতন্ত্র যথাযোগ্য স্থান অধিকার

করিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যে সমস্ত বিভিন্ন প্রচেষ্টা হইয়াছিল, আগামী অধ্যায়ে তাহা আলোচনা করিব। ফিউড্যাল্‌তন্ত্র, যাজকতন্ত্র ও পৌরতন্ত্র চতুর্দ্দিকের রূপান্তর হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ও নিজ নিজ প্রাচীন নীতি অনুসারে সমাজ পুনর্গঠন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাও আলোচনা করিব।

দশম অধ্যায়

প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে আলোচনাকালে আপনারা সর্ব্বাগ্রেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাহাদের বৈচিত্র্য, তাহাদের পরস্পরনিরপেক্ষতা, তাহাদের স্বাতন্ত্র্যই তাহাদের বিশেষ লক্ষণ। ভূস্বামিতন্ত্রমূলক অভিজাতসম্প্রদায়, যাজকসম্প্রদায়, পৌরসম্প্রদায়, সকলেরই অবস্থা স্বতন্ত্র, বিধিবিধান স্বতন্ত্র, রীতিনীতি স্বতন্ত্র। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক একটি স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিয়া স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজ নিজ শক্তিবলে স্ব স্ব নিয়ম অনুসারে আত্মশাসন করিত। তাহারা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ ছিল ও পরস্পরের সংস্পর্শে থাকিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথার্থ একতাবন্ধন ছিল না, তাহারা সকলে মিলিয়া যথার্থপক্ষে একটা ষ্টেট বা রাষ্ট্র, একটা নেশন বা মহাজাতি গঠন করে নাই।

এই সমস্ত স্বতন্ত্র সমাজ মিলিয়া মিশিয়া এখন এক একটা জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে; আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের ইহাই বিশেষ লক্ষণ। প্রাচীন সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এখন দুইটিতে দাঁড়াইয়াছে —রাষ্ট্রতন্ত্র ও প্রজাবর্গ, অর্থাৎ বৈচিত্র্যের তিরোধান ঘটিয়াছে, এবং সাদৃশ্যের ফলে একীকরণ ঘটিয়াছে। কিন্তু এ পরিণতি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ইহাকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে অনেকবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন সমাজের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে তাহারা একত্র সম্মিলিতভাবে অবস্থান ও কার্য্য করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। তাহাদের বিশেষ অবস্থান, বিশেষ অধিকার বা বিশিষ্ট প্রকৃতিতে আঘাত না দিয়াও যাহাতে তাহাদিগকে একটি রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে সম্মিলিত করা যায়, যাহাতে তাহাদিগকে

লইয়া একটি জাতীয় সমাজ গঠন করা যায়, যাহাতে তাহাদিগকে একমাত্র শাসনের অধীন করা যায়, এই উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল।

এ সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। আধুনিক সমাজে যে পরিণতির কথা, ঐক্যের কথা এখনই বলিলাম, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, ঐ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ইউরোপের কোন কোন দেশে এখনও সেই প্রাচীন বৈচিত্র্যের কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট আছে; যথা—জার্ম্মানীতে একটা সত্যকার ফিউড্যাল্ অভিজাতসমাজ ও পৌরসমাজ বর্ত্তমান আছে; ইংলণ্ডে এখনও জাতীয় চর্চ্চ বা যাজকসঙ্ঘ নির্দ্দিষ্ট কর ও নির্দ্দিষ্ট শাসনাধিকার ভোগ করিতেছে। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এ সকল ক্ষেত্রে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ভাণ মাত্র আছে; কারণ, এই সকল বিশিষ্ট খণ্ড সমাজ এখন সাধারণ সমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত হইয়া গিয়াছে, সাধারণ জাতীয় জীবনের সহিত একই চিন্তা চেষ্টা, একই রীতিনীতির স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাই পুনরায় বলি যে, যেখানে প্রাচীন খণ্ড সমাজগুলির স্বতন্ত্র বাহ্য রূপও বর্ত্তমান আছে, সেখানেও তাহাদের বাস্তবিক স্বাতন্ত্র্য একেবারেই নাই।

তথাপি তাহাদিগকে রূপান্তরিত না করিয়াও একমুখী করিবার জন্য, তাহাদের বৈচিত্র্য বিলোপ না করিয়াও তাহাদিগকে একটা জাতীয় ঐক্যের সহিত জুড়িয়া দিবার জন্য এই যে সমস্ত চেষ্টা হইয়াছিল, ইউরোপের ইতিহাসে তাহারা একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমরা এখন যে যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, যে যুগ আদিম ইউরোপকে আধুনিক ইউরোপ হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, যে যুগে ইউরোপীয় সমাজের রূপান্তর সাধিত হয়, সেই যুগের ইতিহাসে এই সকল চেষ্টা অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। শুধু তাহাই নহে, পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর উপরও এই সকল চেষ্টার প্রভাব নিতান্ত সামান্য

নহে ; ইউরোপীয় সমাজের বিচিত্র উপাদান যেরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া শাসনতন্ত্র ও জনসাধারণ, এই দুইটিতে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাও এই সকল চেষ্টার প্রভাবে ঘটিয়াছে। অতএব দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য, খণ্ড সমাজগুলির বৈচিত্র্য নষ্ট না করিয়াও জাতিগঠন ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে সমস্ত চেষ্টা হইয়াছিল, সেগুলিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান অধ্যায়ে ইহাই আমাদের লক্ষ্য।

কিন্তু এ আলোচনা অত্যন্ত দুরূহ ও কষ্টকর। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের এই সকল চেষ্টা সব সময়ে সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় নাই ; অনেক সময় ইহাদের পশ্চাতে স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছপরায়ণতা ভিন্ন অন্য কোন প্রেরণা-শক্তি ছিল না। তবে ইহা নিশ্চয়ই মানিতে হইবে যে, ইহার মধ্যে একাধিক চেষ্টা বাস্তবিক পক্ষেই নিঃস্বার্থভাবে অকলুষভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ; একাধিক ক্ষেত্রে মানব জাতির নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন এই সকল চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সমাজ তখন বিশৃঙ্খলা, উপদ্রব উৎপাত ও অন্যায় অনাচার দ্বারা বিধ্বস্ত হইতেছিল। অনেক উন্নতচেতা সদাশয় ব্যক্তি তাহাতে ব্যথিত হইয়া এ অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য নানা উপায়ের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তথাপি এই সকল মহৎ চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল ; এবং এতটা সাহস ও সততা, এতটা আত্মত্যাগ ও উদ্যম একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহা কি একটা হৃদয়বিদারক দৃশ্য নহে ? কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও একটি কষ্টকর ব্যাপার আছে, তাহাতে হৃদয় আরও বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সমাজের উন্নতির জন্য এই সকল উদ্যম শুধু যে নিষ্ফল হইল, তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে অনেক পরিমাণে অসত্য ও অকল্যাণ মিশ্রিত হইয়া গেল। সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইলেও অধিকাংশ

চেষ্টার মধ্যেই বাতুলতা, বিচার-বুদ্ধির অসদ্ভাব, এবং ন্যায়ধর্ম্ম, মানবজাতির ন্যায্য অধিকার ও সমাজব্যবস্থার ভিত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। সুতরাং মানুষের চেষ্টা যে শুধু অকৃতকার্য্য হইল, তাহা নহে, মানুষ সফলতার যোগ্যতাও দেখাইতে পারে নাই। শুধু যে ইহাতে মানুষের কঠিন ভাগ্যের পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা নহে, মানুষের দুর্ব্বলতারও পরিচয় পাওয়া গেল। দেখা গেল যে, সত্যের একাংশমাত্র মহত্তম লোকের মনও এমন ভাবে অধিকার করিয়া বসে যে, তাঁহারা আর সব ভুলিয়া যান, যাহা কিছু তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ চিন্তাপথের বাহিরে পড়ে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়েন, যদি কোন পক্ষে তাঁহারা ন্যায়ধর্ম্মের সামান্য ছায়ামাত্র দেখিতে পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা তৎসম্পর্কিত সমস্ত অন্যায় অবিচার উপেক্ষা করেন। মানুষের দুর্ভাগ্য দুর্দ্দশা ভাবিতে গেলে বিষাদগ্রস্ত হইতে হয় সত্য, কিন্তু আমার মতে মানুষের দোষ ত্রুটির কথা ভাবিতে গেলে গভীরতর বিষাদে আচ্ছন্ন হইতে হয়; মানুষের কষ্ট অপেক্ষা মানুষের ত্রুটিই আমার পক্ষে অধিকতর দুর্ব্বহ। আমি যে সমস্ত উদ্যমের বর্ণনা করিব, তাহাতে এই উভয়বিধ দৃশ্যই উদ্ঘাটিত হইবে। এ ইতিহাস আমাদের আদ্যোপান্ত আলোচনা করা আবশ্যক, এবং যে সমস্ত যুগ, যে সমস্ত মানুষ বার বার পথভ্রষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, বার বার অকৃতকার্য্য হওয়া সত্ত্বেও, বহু মহৎ গুণের পরিচয় দিয়াছে, প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইয়াছে, খ্যাতি গৌরবের যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি অবিচার করিলে চলিবে না।

দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য দ্বিবিধ চেষ্টা হইয়াছিল। এক শ্রেণীর চেষ্টার লক্ষ্য ছিল একটি মাত্র সামাজিক উপাদানের প্রাধান্য স্থাপন করা, তাহা সে যাজকতন্ত্রই

হউক বা অভিজাততন্ত্রই হউক বা পৌরতন্ত্রই হউক। সমস্ত সমাজকে এই একমাত্র খণ্ড সমাজের অধীনে আনিতে হইবে এবং এইরূপে সমাজে ঐক্য স্থাপন করিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর চেষ্টার লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন খণ্ড সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, প্রত্যেকের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া এবং প্রত্যেকের যথাযোগ্য ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাহাদিগকে সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করান। দ্বিতীয় অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীর চেষ্টার মধ্যেই স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছাপরায়ণতার অস্তিত্ব কল্পনা করা স্বাভাবিক। বাস্তবিক পক্ষে তাহাদিগের ইতিহাস এই দুই দোষে অধিকতর পরিমাণে কলঙ্কিত; তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী স্বভাবতঃই অত্যাচারদুষ্ট। তবে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন উদ্যম যে মানুষের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধভাবে প্রণোদিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

প্রথম চেষ্টা হইল, যাজকতন্ত্রের সাহায্যে সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করার জন্য। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে যাজকসম্প্রদায়ের নীতি ও শাসনের অধীনে আনিবার চেষ্টা। আমি চর্চ্চ বা যাজকতন্ত্রের ইতিহাসসম্পর্কে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করুন। চর্চ্চের মধ্যে কোন্ কোন্ নীতি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন্ নীতি কি পরিমাণে ন্যায়সঙ্গত, ঘটনাস্রোতের স্বাভাবিক বিবর্ত্তনে কিরূপে তাহাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহারা কি কি কল্যাণ সাধন করিয়াছে এবং কি কি অকল্যাণ সাধন করিয়াছে, এ সমস্ত আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চর্চ্চ যে সব বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি সেগুলির বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি; আমি রোমীয় সাম্রাজ্যের চর্চ্চ, বর্ব্বরযুগের চর্চ্চ, ফিউড্যাল্ যুগের চর্চ্চ এবং সর্ব্বশেষে যাজকতন্ত্র চর্চ্চের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়াছি।

এখন দেখিতে চেষ্টা করিব, যাজকবর্গ ইউরোপীয় সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবার কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিল এবং কেনই বা তাহারা অকৃতকার্য্য হইল।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই রোমের পোপসভার ও সাধারণ যাজকবর্গের কার্য্যকলাপের মধ্যে যাজকতন্ত্রসাহায্যে সমাজব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। চর্চ্চের ধর্ম্মনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উৎকর্ষের ইহা স্বাভাবিক ফল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রথম হইতেই চর্চ্চ এমন কতকগুলি বাধা প্রাপ্ত হইল, যাহা সে তাহার প্রবলতম পরাক্রমের সময়ও দূরীভূত করিতে পারে নাই।

প্রথম বাধা খৃষ্টধর্ম্মের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। খৃষ্টধর্ম্ম কেবলমাত্র প্রবর্ত্তন প্ররোচনার দ্বারা নৈতিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অধিকাংশ ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত এই বিষয়ে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভেদ। জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সে কখনও বাহুবল বা শাস্ত্রবলসমন্বিত ছিল না। প্রথম যুগে যে কেবল ভগবদ্বাণীর সাহায্যেই জয়লাভ করিয়াছিল, সে কেবল মানুষের চিত্তই জয় করিয়াছিল। সুতরাং যখন চর্চ্চ বিজয়-গৌরবে মণ্ডিত হইয়া প্রভূত সমৃদ্ধি ও সম্মান লাভ করিল, তখনও সে প্রত্যক্ষভাবে সমাজ শাসনের অধিকার পায় নাই। চর্চ্চের নৈতিক প্রভাব সামান্য ছিল না, কিন্তু শাসন-দণ্ড পরিচালনের উপযোগী তাহার কোন বাহ্যশক্তি ছিল না। সে গৌণভাবে পৌর শাসনতন্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে বটে, সম্রাট্ ও সম্রাট্‌প্রতিনিধিদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ সে কখনও শাসনদণ্ড পরিচালন করে নাই। যাজকতন্ত্রমূলকই হউক বা অন্য যে কোন প্রকারেরই হউক, কেবলমাত্র গৌণ নৈতিক প্রভাবের বলে কোন শাসনতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

শাসনতন্ত্র চালাইতে হইলে ব্যবস্থা করিতে হইবে, আদেশ করিতে হইবে, কর গ্রহণ করিতে হইবে, শাসন করিতে হইবে, এক কথায় সমাজকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিতে হইবে। প্ররোচনার দ্বারা নৈতিক প্রভাবের সাহায্যে একটা জাতি বা রাষ্ট্রের উপর একপ্রকার আধিপত্য স্থাপন করা যায় সত্য এবং তাহাতে অনেক ফলও ফলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠে না, একটা কোন স্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপিত হয় না, জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষার কোন উপায় হয় না। জন্মকাল হইতে খৃষ্টীয় চর্চ্চের এই অবস্থা; সে বরাবর শাসনতন্ত্রের পাশাপাশি রহিয়াছে, কিন্তু নিজে কখনও তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে নাই। যাজক-তন্ত্রনীতি অনুসারে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যখন চেষ্টা হইল, তখন ইহাই একটি প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইল।

অতি প্রাচীনকাল হইতে চর্চ্চের সম্মুখে আর একটি দ্বিতীয় বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন চতুর্দ্দিকে বর্ব্বররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, চর্চ্চ তখন বিজিত শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া গেল। তখন এই অবস্থা হইতে কোনরূপে উদ্ধার পাওয়াই তাহার পক্ষে প্রথম আবশ্যক হইল। বিজেতৃবর্গকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নিজেকে বিজেতৃবর্গের সমান পদবীতে উত্তোলন করাই চর্চ্চের প্রথম কার্য্য হইল। এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চর্চ্চ যখন আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার সম্মুখে ফিউড্যাল্ অভিজাত-বর্গের প্রতিকূলতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

ফিউড্যাল্ সমাজ এইরূপে ইউরোপের একটা মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সমগ্র জাতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে চর্চ্চের অধীনতা গ্রহণ করিয়াছিল, রাজগণের তখন

আত্মরক্ষার সামর্থ্য পর্য্যন্ত ছিল না বলিলেই হয় ; কেবল মাত্র ফিউড্যাল্ অভিজাতবর্গ কখনও চর্চ্চের দাসত্ব-শৃঙ্খল স্বীকার করে নাই বা চর্চ্চের নিকট মস্তকও অবনত করে নাই। মধ্যযুগের ইতিহাস সাধারণভাবে আলোচনা করিলেই দেখিবেন, চর্চ্চের সহিত ভূস্বামিগণের সম্পর্ক কেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাহার মধ্যে ঔদ্ধত্য ও বশ্যতার, অন্ধ বিশ্বাস ও স্বাধীনচিত্ততার কি অদ্ভুত সম্মিলন। ফিউড্যাল্ ভূস্বামিতন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাস পূর্ব্বে কিরূপে বর্ণনা করিয়াছি, স্মরণ করিবেন। ভূস্বামীর আবাসদুর্গ ঘিরিয়া কিরূপে একটা আদিম ফিউড্যাল্ সমাজ গড়িয়া উঠিল, তাহা বোধ হয় আপনাদের স্মরণ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, এই আদিম ফিউড্যাল্ সমাজে যাজকের পদবী ছিল ভূস্বামীর নিম্নে। ফিউড্যাল্ অভিজাতবর্গের চিত্তে বরাবরই এই পদবৈষম্যের স্মৃতি জাগরূক ছিল। তাঁহারা শুধু যে চর্চ্চের বশ্যতা স্বীকার করিতেন না, তাহা নহে, তাঁহারা চর্চ্চ অপেক্ষা অভিজাত-সমাজকে বড় ভাবিতেন ; তাঁহারা ভাবিতেন, তাঁহাদেরই কেবল দেশ শাসন করিবার, দেশের সমস্ত ক্ষমতা দখল করিবার একমাত্র অধিকার। তাঁহারা যাজকসমাজের সহিত নির্ব্বিবাদে থাকিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু যাজকসম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য নিজেদের স্বার্থ কিঞ্চিৎ মাত্রও ক্ষুন্ন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বহু শতাব্দী ধরিয়া যখন রাজা ও জনসমাজ চর্চ্চের করতলগত, তখন এই অভিজাতবর্গই চর্চ্চের কবল হইতে সমাজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যখন যাজকতন্ত্রের সাহায্যে সমাজে ঐক্য ও শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইল, তখন সর্ব্বাগ্রে অভিজাতবর্গই তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ যে যে কারণে এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান কারণ।

এইরূপ আর একটি তৃতীয় বাধাও উপস্থিত হইয়াছিল। এ বাধাটির গুরুত্ব যথাযথ ভাবে উপলব্ধ হয় নাই, এবং ইহার ফলাফল সম্বন্ধেও অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে।

যেখানেই যাজকসম্প্রদায় সমাজের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া সমাজকে যাজকতন্ত্রমূলক শাসনশৃঙ্খলায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, সেখানে বিবাহিত গৃহী যাজকসমাজ আধিপত্য করিয়াছে দেখা যায়। যাজকসমাজ সেখানে আপনার মধ্য হইতেই দল পুষ্টি করিয়াছে, তাহারা স্বীয় সন্তানগণকে আজন্মকাল হইতেই যাজকবৃত্তি ও যাজকাধিকারের জন্য শিক্ষিত ও উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। ইতিহাস আলোচনা করুন; এশিয়ার দিকে, মিশরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যেখানে যেখানে বড় বড় যাজকতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা, সর্ব্বত্রই যাজকসমাজ সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ, সে নিজের মধ্য হইতেই নিজের সমস্ত অভাব মিটাইতে পারে, বাহির হইতে তাহাকে কিছুই ধার করিতে হয় না।

খৃষ্টীয় চর্চ্চে যাজকগণ অবিবাহিত থাকিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের অবস্থা একেবারে ভিন্নরূপ দাঁড়াইল। যাজকসমাজের ধারা বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনবরত বাহিরের সমাজ হইতে, নানা শ্রেণী, নানা বৃত্তি হইতে লোক সংগ্রহ করিতে হইত। এ সমস্ত বাহিরের উপাদান পরিপাক করিয়া আত্মস্থ করিয়া লইতে চর্চ্চ অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিত, কিন্তু নবাগতদিগের জাতি কুল বৃত্তির প্রভাব কিছু না কিছু থাকিয়া যাইত; তাঁহারা পৌরসমাজ হইতেই আসুন বা অভিজাত-সমাজ হইতেই আসুন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন মনোভাব বা পূর্ব্বতন অবস্থার কতকটা নিদর্শন তাঁহারা রক্ষা করিতেন। অবশ্য অবিবাহিত থাকার দরুন ক্যাথলিক যাজকবৃন্দের অবস্থার সঙ্গে সাধারণ সমাজের অবস্থার পার্থক্য ঘটিল এবং তজ্জন্য তাঁহারা একরূপ সাধারণ সমাজের

বাহিরে গিয়া পড়িলেন, কিন্তু সেই একই কারণে তাঁহাদিগকে অনবরত লোক সংগ্রহ ও দলপুষ্টির জন্য বহিঃসমাজের সম্পর্কে আসিতে বাধ্য হইতে হইল, এবং তাহার ফলে বহিঃসমাজের মধ্যে যখন যে নৈতিক পরিণতি ও বিপ্লব ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগকেও কতক পরিমাণে তাহার প্রভাব অনুভব করিতে হইয়াছে। আমি দ্বিধাশূন্য হইয়া বলিতে পারি যে, যাজকতন্ত্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকল্পে যাজকসমাজের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য-বোধ যতটুকু সহায়তা করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই নিত্য প্রয়োজনের তাড়না ইহার পক্ষে হানিজনক হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে চর্চ্চের গণ্ডীর মধ্যেই এমন কতকগুলি পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হইল, যাহারা চর্চ্চের একাধিপত্য স্থাপনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল।

চর্চ্চের ঐক্যবন্ধন সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন; এবং ইহা সত্য যে, চর্চ্চ বরাবর এই ঐক্যস্থাপন আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং কোন কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছে। কিন্তু আমরা যেন বড় বড় কথার আড়ম্বরে বা আংশিক তথ্যের পরিচয়ে প্রতারিত না হই। যাজকসমাজের মত আর কোন্ সমাজে এত অন্তর্বিবাদ দেখা দিয়াছে, কোন্ সমাজ এত খণ্ডবিখণ্ড হইয়াছে? আর কোন্ সমাজে এত দলাদলি, এত স্থিরতার অভাব? ইউরোপের অধিকাংশ দেশের জাতীয় চর্চ্চ অনবরত রোমের পোপসভার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে; ধর্ম্মসঙ্গীতিগুলি পোপের সহিত সর্ব্বদাই লড়াই করিয়াছে; পাষণ্ডিসম্প্রদায়ের সংখ্যা করা যায় না, নূতন নূতন সম্প্রদায় পৃথক্ হইবার জন্য উন্মুখ; এত মতবৈচিত্র্য, এত প্রচণ্ড বিবাদবিতর্ক, কর্ত্তৃত্বশক্তিকে এমন করিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেওয়া—ইহা আর কোথাও দেখা যায় নাই। চর্চ্চ সমাজের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিবার

জন্য যে বিপুল চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার সফলতার প্রধান বিঘ্ন ছিল চর্চ্চের আভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসম্বাদ ও বিপ্লব আন্দোলন।

চর্চ্চের এই চেষ্টার আরম্ভকাল হইতেই এই সমস্ত বাধাগুলিই দেখা দিয়াছিল। তথাপি এই সমস্ত বাধা সত্ত্বেও এই চেষ্টার গতিরোধ হয় নাই, বহু শতাব্দী ধরিয়া এই চেষ্টা অগ্রসর হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ সপ্তম গ্রেগরীর আধিপত্যকালে এই চেষ্টা চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল। আপনারা পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন যে, সমস্ত সংসারকে যাজকবর্গের অধীনে আনা, সমগ্র যাজকসঙ্ঘকে পোপের অধীন করা এবং সমস্ত ইউরোপকে একটি বিশাল যাজকতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা, ইহাই ছিল সপ্তম গ্রেগরীর প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি দুইটি মহৎ দোষ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়—প্রথম দোষ তাত্ত্বিকসুলভ, দ্বিতীয় দোষ বিপ্লববাদিসুলভ। একদিকে তিনি প্রথম হইতেই তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কারের সমগ্র প্রতিমূর্ত্তি লোকসমক্ষে খুলিয়া ধরিয়াছিলেন, ধর্ম্মমূলক শাসনশক্তির প্রকৃতি ও অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ রীতিমত ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সেই সেই মতবাদ হইতে কঠোর নৈয়ায়িকের ন্যায় শুদ্ধমাত্র বস্তুসম্পর্কশূন্য ন্যায়-যুক্তির সাহায্যে সুদূরতম সিদ্ধান্তসকল টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন। এইরূপে নিজের শক্তি বা সফলতার উপায় বিচার না করিয়াই তিনি ইউরোপের সমস্ত রাজশক্তিকেই আক্রমণ বা ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মানবব্যাপারে শুদ্ধমাত্র দার্শনিক যুক্তির দোহাই দিয়া একেবারে চরম পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। তাহা ছাড়া অন্যান্য বিপ্লববাদীর ন্যায় সপ্তম গ্রেগরী একটি বিষম ভ্রম করিয়াছিলেন; তাঁহার যাহা সাধ্য ছিল, তাহার অধিক তিনি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি সম্ভবের

গণ্ডীর মধ্যে নিজের চেষ্টা সীমাবদ্ধ করেন নাই। তাঁহার মতবাদকে শীঘ্র শীঘ্র প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠাদান করিবার জন্য তিনি সম্রাটের সঙ্গে, ইউরোপের সমস্ত রাজগণের সঙ্গে, এমন কি, যাজকবৃন্দের সঙ্গেও বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ফলাফলের দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না, তিনি কাহারও কোন স্বার্থ বা অধিকার গ্রাহ্য করিলেন না, পরন্তু সদম্ভে ঘোষণা করিলেন,—"আমি সমস্ত রাজ্য শাসন করিব, সমস্ত চিত্ত শাসন করিব।" এইরূপে তাঁহার বিরুদ্ধে একদিকে সমস্ত পার্থিব রাজশক্তি আসন্ন বিপদাশঙ্কায় উদ্যত হইয়া উঠিল, অন্য দিকে স্বাধীন চিন্তার ধ্বজা ধরিয়া উন্মুক্তচিত্ত মনীষিগণ মানবচিত্তের স্বাধীনতারক্ষার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিলেন। মোটের উপর গ্রেগরী যাজকতন্ত্রের উন্নতি না করিয়া হানিই করিয়া গেলেন।

তথাপি সমগ্র দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যাজকতন্ত্র উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া চলিল। যদিচ এ সময়ের মধ্যে চর্চ্চ বেশী কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, তথাপি এই যুগেই চর্চ্চের শক্তি ও মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। তৃতীয় ইনোসেণ্টের শাসনকাল পর্য্যন্ত চর্চ্চ পূর্ব্বার্জ্জিত গৌরব ও ক্ষমতা ভোগ করিয়াছে মাত্র, নূতন করিয়া বিস্তৃতি লাভ করে নাই। আপাতদৃষ্টিতে চর্চ্চের যে সময় চরম সার্থকতার যুগ, সেই সময়েই ইউরোপের অনেকাংশ জুড়িয়া চর্চ্চের বিরুদ্ধে জনসমাজের পক্ষ হইতে একটা বিদ্রোহ ঘোষিত হইল। ফ্রান্সের দক্ষিণে আল্‌বিজেন্সদিগের (Albigenes) পাষণ্ডী মত মস্তক উত্তোলন করিল এবং একটা সমগ্র বিশাল পরাক্রান্ত জনসমাজ অধিকার করিয়া বসিল। কিয়ৎকাল পরে ইংলণ্ডে উইক্লিফ প্রতিভাসহকারে চর্চ্চকে আক্রমণ করিলেন, এবং তিনি যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা অমর হইয়া

রহিল। লোকসমাজ যে পথ অবলম্বন করিল, রাজগণও সেই পথ আশ্রয় করিতে অধিক বিলম্ব করিলেন না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালেই ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও পরাক্রান্ত রাজবংশ অর্থাৎ হোহেনষ্টাউফেনবংশীয় সম্রাট্‌গণ পোপ-তন্ত্রের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছিলেন। এই শতাব্দীর মধ্যেই ধার্ম্মিকপ্রবর নৃপতি স্যাঁ লুই ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য প্রাকৃতরাজশক্তির স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা ফিলিপ্ ল্য বেল ও পোপ অষ্টম বোনিফাসের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল; ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এড্‌ওয়ার্ডও রোমের প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিক বশ্যতা প্রদর্শন করেন নাই। এ যুগে স্পষ্টই দেখা গেল যে, যাজকতন্ত্র শাসনে সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল; ইহার পর হইতে চর্চ্চকে কেবল আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, আর সে ইউরোপের উপর স্বকীয় শাসনতন্ত্র চাপাইতে চেষ্টা করিবে না; তাহার একমাত্র চিন্তা হইবে, কেমন করিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত অধিকার রক্ষা করা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইউরোপের প্রাকৃত জনসমাজ চর্চ্চের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল; সেই সময় হইতে চর্চ্চ সমাজশাসনাধিকারের দাবী ছাড়িয়া দিল।

যে ক্ষেত্রে তাহার কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল বলিয়া মনে হয়, সেই ইটালীর সমাজের মধ্যেই চর্চ্চ বহুপূর্ব্বে এ দাবী ছাড়িয়া দিয়াছিল। বহুকাল পূর্ব্বে চর্চ্চের দ্বারপ্রান্তেই, তাহার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে ইটালীর মধ্যেই যাজকতন্ত্র একেবারে অকৃতকার্য্য হয় এবং সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতির এক শাসনতন্ত্র তাহার স্থান অধিকার করে। তাহা আর কিছু নহে, পৌরতন্ত্র। ইটালীর গণতন্ত্রগুলিই এই পৌরতন্ত্রের আদর্শ। এই পৌরতন্ত্রই একাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিল।

পৌরসঙ্ঘগুলির উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ রাখিবেন। ইটালীতে তাহারা যত অল্পকালে পরিণতি লাভ করিয়াছিল ও যত পরাক্রমশালী হইয়াছিল, তেমন আর কোথাও হয় নাই। সেখানে গল, ব্রিটেন বা স্পেন অপেক্ষা নগরের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি অনেক অধিক ছিল; সেখানে রোমীয় পৌরতন্ত্র অপেক্ষাকৃত সজীব ও সুনিয়মিতভাবে বর্ত্তমান ছিল।

ইউরোপের অন্যান্য অংশাপেক্ষা ইটালীর পল্লীজনপদ বিজেতৃসম্প্রদায়ের বাসের পক্ষেও অনুপযোগী ছিল। সেখানে সমস্ত জনপদ পূর্ব্ব হইতেই জলাজঙ্গলাদিমুক্ত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল; সেখানে এমন বনজঙ্গল ছিল না, যেখানে বর্ব্বর বিজেতৃগণ মৃগয়াদি অনুসরণ করিতে পারে বা তাহাদের আদিম আবাস জার্ম্মানীর অনুরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। তাহা ছাড়া এই জনপদের একাংশ তাহাদের অধিকারভুক্ত হয় নাই। ইটালীর দক্ষিণাংশ, কাম্পানিয়া দি রোমা ও রাবেন্না গ্রীক সম্রাট্‌দিগের শাসনভুক্ত ছিল। দেশের এই অংশে রাজধানী হইতে দূরত্ব নিবন্ধন এবং যুদ্ধ বিগ্রহের উপদ্রব হইতে কতকটা নিষ্কৃতি পাওয়াতে অতি প্রাচীন কালেই গণতন্ত্র-পদ্ধতি শক্তি ও পুষ্টিলাভ করিল। শুধু যে সমগ্র ইটালী বর্ব্বরদিগের শাসনভুক্ত হয় নাই, তাহা নহে, যেখানে তাহাদিগের অধিকার, সেখানেও তাহারা সুপ্রতিষ্ঠভাবে নিরুপদ্রবে থাকিতে পারে নাই। অষ্ট্রোগথ্‌গণ বেলিসারিয়স্‌ ও নার্সেস্‌ কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। লম্বার্ডদিগের রাজ্যও অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। লম্বার্ড-রাজ্য ফ্রাঙ্ক কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল; পেপিন ও শার্লমেন লম্বার্ড জনসমাজকে নির্ম্মূল করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা অধুনাবিজিত লম্বার্ডদিগের সহিত যুঝিবার জন্য প্রাচীন ইটালীর জনসমাজের সহিত সন্ধিবন্ধন আবশ্যক

মনে করিয়াছিলেন। অতএব অন্যত্র যেরূপ বর্ব্বর বিজেতৃগণ দেশ ও সমাজের উপর অখণ্ড প্রভুত্বলাভ করিয়াছিলেন, ইটালীতে সেরূপ পারেন নাই। এই জন্যই আল্‌প্‌স্‌ গিরিমালার পরপারে ফিউড্যাল্‌ ভূস্বামিতন্ত্র অত্যন্ত ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গলে যেমন পল্লীজনপদের অধিবাসিগণের প্রাধান্য ঘটিয়াছিল, ইটালীতে তাহা না হইয়া পৌরসমাজের প্রাধান্য রহিয়া গেল। এই ব্যাপার যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন অধিকাংশ ফিউড্যাল্‌ ভূস্বামী স্বেচ্ছাবশতঃই হউক বা প্রয়োজনের তাড়নাতেই হউক, পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া নগরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বর্ব্বর ভূস্বামী ও অভিজাতবর্গ পৌর-প্রধান হইতে লাগিলেন। শুধু এই ঘটনাদ্বারা ইউরোপের অন্যান্য দেশের পৌরসমাজের তুলনায় ইটালীর পৌরসমাজের যে শক্তি ও মর্য্যাদাবৃদ্ধি ঘটিল, তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারেন। অন্যান্য দেশের নগরে লোকসমাজের ভীরুতা ও মর্য্যাদাহীনতাই লক্ষ্য করা যায়। পৌরপ্রধানগণ যেন বন্ধনমুক্ত ক্রীতদাস, বহু কষ্টে সাহসে ভর করিয়া যেন তাঁহারা দ্বারস্থ প্রভুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া যাইতেছেন। ইটালীর পৌরপ্রধানগণ মোটেই এরূপ ছিলেন না; সেখানে বিজেতৃ ও বিজিতসমাজ একই প্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে; পৌরসমাজকে সেখানে প্রতিবেশী প্রভুর নিকট আত্মরক্ষা করিতে হইত না; নগরের অধিকাংশ অধিবাসীই সেখানে চিরকাল হইতে পৌরাধিকারসম্পন্ন স্বাধীন পুরুষ; তাহারা কখনও বা ফ্রাঙ্করাজ, কখনও বা জার্ম্মান সম্রাট্‌, এইরূপ দূরাগত বিদেশী রাজগণের বিরুদ্ধে নিজ নিজ স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিত। এই জন্যই এত প্রাচীন কাল হইতে ইটালীর নগরগুলির এত প্রাধান্য ও পদগৌরব। অন্যত্র যখন সামান্য একটি পৌরতন্ত্র

গড়িয়া তুলিতে অসীম ক্লেশ পাইতে হয়, এখানে তখন বড় বড় গণতন্ত্র, বড় বড় পৌররাষ্ট্রের অভ্যুত্থান।

ইউরোপের এই অংশে গণতন্ত্রনীতি অনুসারে সমাজবন্ধনের চেষ্টা কেমন করিয়া কৃতকার্য্য হইল, তাহা এখন বোধগম্য হইয়াছে। এখানে ইহা অতি প্রাচীন কালেই ফিউড্যাল্ ভূস্বামিতন্ত্রকে পরাজয় করিয়া প্রাধান্য লাভ করিল। ইহা এমন সুগঠিত হয় নাই, যাহাতে ইহা বিস্তৃতি বা স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে; ইহার মধ্যে উন্নতির বীজ অতি অল্পই ছিল, যাহা না থাকিলে বিস্তৃতিও সম্ভব হয় না, স্থায়িত্বও সম্ভব হয় না।

একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইটালীর পৌরগণতন্ত্রগুলির ইতিহাস আলোচনা করিবার সময় দুইটি পরস্পরবিরোধী অথচ অবিসম্বাদিত তথ্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যায়। একদিকে দেখি সাহস, উদ্যম ও প্রতিভার আশ্চর্য্য বিকাশ এবং তৎসঙ্গে প্রভূত ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি; সেখানে এমন একটা সচলতা ও স্বাধীন স্ফূর্ত্তি, যাহা ইউরোপে অন্যত্র দেখা যায় না। কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করুন, পৌরগণের বাস্তবিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাদের জীবন কিরূপে কাটিত, তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে কতটুকু করিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য পড়িত। এইখানেই আর এক দৃশ্যপটের আবির্ভাব: কোন ইতিহাস ইহা অপেক্ষা অন্ধকার ও বিষাদজনক হইতে পারে না। বোধ হয়, কোন যুগে কোন দেশে মানুষের অবস্থা এত অশান্তিপূর্ণ, এত দুর্ভাগ্য-দুর্য্যোগলাঞ্ছিত হয় নাই, আর কোথাও বোধ হয়, এত বিবাদ বিসম্বাদ, এত দুষ্কর্ম্ম, এত ভাগ্য-বিপর্য্যয় দেখিতে পাওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়; অধিকাংশ গণতন্ত্রের শাসনপদ্ধতির মধ্যে স্বাধীনতার ভাগ ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। শান্তি শৃঙ্খলার এতই অভাব ছিল যে, বিভিন্ন দল শান্তির আকাঙ্ক্ষায় গণতন্ত্রনীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্

অন্য এক নীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। ফ্লোরেন্স, ভেনিস্, জেনোয়া, মিলান ও পিসার ইতিহাস আলোচনা করুন; সর্ব্বত্রই দেখিবেন, ঘটনাবলীর সাধারণ স্রোতে স্বাধীনতার পুষ্টি ও বিস্তৃতি না ঘটিয়া, সঙ্কোচই ঘটিতে লাগিল, ক্রমশঃ অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের হস্তে সমস্ত শাসনশক্তি কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। এককথায় এই সকল উদ্যমশীল, প্রতিভাসমুজ্জ্বল, সমৃদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রের মধ্যে দুইটী বস্তুর অভাব ছিল:—ধনপ্রাণের নিঃশঙ্কতা, যাহা না থাকিলে সমাজই থাকিতে পারে না, এবং শাসন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও বিস্তৃতি।

তাহার পরে আর এক নূতন বিপদ্ আসিয়া জুটিল, যাহাতে গণতন্ত্র-নীতি অনুসারে সমাজ বন্ধনের চেষ্টা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিল না। ইটালীর সর্ব্বাপেক্ষা বিষম বিপদ্ আসিল বাহির হইতে, বিদেশী রাজগণের আক্রমণ হইতে। অথচ এ বিপদের কালে ইটালীর গণতন্ত্রগুলি অন্ত-র্বিরোধ মিটাইয়া একত্র সম্মিলিত হইতে পারিল না, তাহারা কিছুতেই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে বাধা দিতে ইচ্ছা করিল না। সেই জন্যই বর্ত্তমান কালের অনেক মনীষাসম্পন্ন স্বদেশভক্ত ইটালীয়ান্ দুঃখ করেন যে, মধ্যযুগের ইটালীর পৌরতন্ত্রই ইটালীতে এ পর্য্যন্ত একটা জাতি গঠন করিতে দেয় নাই। তাঁহারা বলেন, ইটালী তখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহারা এতই ক্রোধ হিংসাদির বশীভূত ছিল যে, তাহারা কিছুতেই সম্মিলিত হইয়া একটা বৃহৎ রাষ্ট্র বা জাতি গঠন করিতে পারিল না। তাঁহারা দুঃখ করেন যে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় ইটালী একবার কেন্দ্রীভূত একতন্ত্র শাসনের অধীনে আসিল না; তাহা হইলে সেই শাসনের চাপে একটা জাতি গঠিত হইতে পারিত, ইটালী তাহা হইলে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত থাকিতে পারিত। সুতরাং মনে হয় যে, এই যুগে গণতন্ত্রপদ্ধতি

সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থার মধ্যেও উন্নতি, স্থায়িত্ব বা বিস্তৃতির বীজ সংগ্রহ করিতে পারে নাই অর্থাৎ তাহার ভবিষ্যৎ তখন শূন্য ছিল। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত মধ্যযুগের ইটালীর শাসনব্যবস্থার সহিত প্রাচীন গ্রীসের সমাজব্যবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে। গ্রীসেও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতন্ত্রের সমাবেশ; পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদাই প্রতিযোগিতা, এবং প্রায়ই শত্রুতা; কখন কখনও বা একটা সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলে সম্মিলিত হইত। এ তুলনায় গ্রীসেরই উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হয়। যদিও ইতিহাসে এথেন্স, স্পার্টা এবং থীব্‌স্ নগরীর অনেক অনাচার দুর্নীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি ইহা নিঃসন্দেহ যে, ঐ সকল নগরে ইটালীর গণতন্ত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শান্তি শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের শাসন ছিল। অথচ গ্রীসের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা কত অল্পকালের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল। ঐ শক্তিবিভাগ ও রাষ্ট্রবিভাগের মধ্যে না জানি, কি বলক্ষয়কর নীতিই অনুস্যূত ছিল! যখনই গ্রীস্ মাসিডনিয়া ও রোমের ন্যায় পরাক্রান্ত প্রতিবেশীর সম্পর্কে আসিল, তখনই তাহার পরাজয় ঘটিল। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতন্ত্র এত প্রতিভাগৌরব ও ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধি সত্ত্বেও আত্মরক্ষার জন্য একটা সম্মিলিত শক্তি গঠন করিতে পারিল না। ইটালীতে সেই একই কারণের একই পরিণাম হইবার সম্ভাবনা আরও কত না অধিক ছিল। কারণ, গ্রীসের তুলনায় সেখানে মানবসমাজ ও চিত্তের বিকাশ অতি অল্পই ঘটিয়াছিল।

যেখানে গণতন্ত্রপদ্ধতি বিজয়ী হইয়াছিল, যেখানে ফিউড্যাল্ ভূস্বামিতন্ত্র তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া গিয়াছিল, সেই ইটালীতেই যখন গণতন্ত্রমূলক সমাজ বন্ধনের চেষ্টা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না, তখন ইউরোপের অন্যান্য অংশে যে সে চেষ্টা আরও শীঘ্র পরাভূত হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

আমি সংক্ষেপে সেই ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে বিবৃত করিব। ইউরোপের আর এক অংশের সহিত ইটালীর বিশেষ সাদৃশ্য ছিল; তাহা ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্পেনের কয়েকটি প্রদেশ; যথা—কাটালোনিয়া, নাভার্ ও বিস্কে। সেখানেও নগরগুলি অনেক পরিমাণে পুষ্টি, মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণের মধ্যে অনেকেই পৌরপ্রধানদিগের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন; যাজকসম্প্রদায়ের এক অংশ তাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন; এক কথায় দেশের অবস্থা অনেকটা ইটালীর মত হইয়াছিল। সুতরাং একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রোভাঁস লাংডক ও আকিত্যানের নগরগুলি রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করিয়া আল্প্‌সের পরপারবর্ত্তী নগরগুলির মত স্বাধীন গণতন্ত্র গঠন করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দক্ষিণ-ফ্রান্সের পার্শ্বেই উত্তর-ফ্রান্সের পরাক্রান্ত ফিউড্যাল্ সমাজ ছিল। এই সময়েই আল্‌বিজেন্সদিগের পাষণ্ডী ধর্ম্মমতের অভ্যুত্থান হইল, এবং ভূস্বামিতন্ত্র উত্তর-ফ্রান্সের সহিত পৌরতন্ত্র দক্ষিণ-ফ্রান্সের সংগ্রাম বাধিয়া গেল। সিমন ডি মণ্টফোর্টের নেতৃত্বে আলবিজেন্সদিগের বিরুদ্ধে যে ক্রুসেড বা ধর্ম্ম-যুদ্ধাভিযান হয়, তাহার ইতিহাস আপনারা জানেন। ইহা দক্ষিণ-ফ্রান্সের গণতন্ত্রমূলক সমাজবন্ধন-চেষ্টার বিরুদ্ধে উত্তর-ফ্রান্সের ভূস্বামি-তন্ত্রের সংগ্রাম। দক্ষিণ ফরাসীদিগের স্বদেশপরায়ণতা সত্ত্বেও উত্তর-ফ্রান্সই জয়ী হইল; দক্ষিণে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য ছিল না, এবং সভ্যতার সেখানে এতদূর উন্নতি হয় নাই যে, সন্ধিবন্ধনের দ্বারা সেই ঐক্যের স্থান তাহারা পূরণ করিতে পারে। গণতন্ত্র সমাজবন্ধনের চেষ্টা পরাভূত হইল, এবং এই ক্রুসেডের ফলে দক্ষিণ-ফ্রান্সের ফিউড্যাল্ ভূস্বামিতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

পরবর্ত্তী কালে সুইজারলাণ্ডের পর্ব্বতমালার মধ্যে গণতন্ত্রের চেষ্টা

অপেক্ষাকৃত সফলতা লাভ করিল। সেখানে কর্ম্মক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল; তাহাদিগকে কেবল একজন বিদেশী রাজার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; তিনি যদিও সুইস্‌দিগের অপেক্ষা পরাক্রান্ত ছিলেন, তথাপি তিনি ইউরোপের প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতিগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন না। সুইস্‌রা অত্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সহিত সংগ্রাম চালাইলেন। সুইজারলাণ্ডের ফিউড্যাস্‌ অভিজাতবর্গ অনেক পরিমাণে নগরগুলির পক্ষই অবলম্বন করিলেন; তাঁহারা গণতন্ত্রের প্রবল সহায় হইলেন বটে, কিন্তু এই সহায়তার ফলে সুইস্‌ গণতন্ত্রের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহার উপর একটা আভিজাত্যের ছাপ পড়িয়া গেল।

এখন উত্তরফ্রান্স, ফ্লাণ্ডার্সের পৌরসঙ্ঘ, রাইননদীর তীর ও হান্সেয়াটিক লীগের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। সেখানে গণতন্ত্রনীতি নগরগুলির অভ্যন্তরে সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল; অথচ আরম্ভ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এ নীতি বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিবে না, সমগ্র সমাজের শাসনভার অধিকার করিতে পারিবে না। উত্তরের নগরগুলি চারি দিকে ফিউড্যাল্‌ সমাজকর্ত্তৃক বেষ্টিত ছিল, ফিউড্যাল্‌ ভূস্বামী ও ফিউড্যাল্‌ রাজশক্তিকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদিগকে সর্ব্বদাই আত্মরক্ষায় নিযুক্ত থাকিতে হইত। ইহা সুস্পষ্ট যে, তাহারা কেবল আত্মরক্ষা করিতেই সমর্থ হইয়াছিল, অধিকার বিস্তৃতির কোন চেষ্টা করে নাই। তাহারা নিজেদের বিশিষ্ট অধিকারগুলি বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু নগরপ্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যেই তাহারা আবদ্ধ ছিল। গণতন্ত্রসমাজবন্ধন প্রাচীরসীমার মধ্যেই আবদ্ধ রহিল, আর অগ্রসর হইল না; নগরের বাহিরে পল্লীপ্রদেশে গিয়া পড়িলেই গণতন্ত্রের আর কোন সন্ধান পাই না।

গণতন্ত্রের পক্ষ হইতে সমাজবন্ধনের যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার পরিণতি এখন দেখিতে পাইলেন; ইটালীতে সে চেষ্টা জয়যুক্ত হইল, কিন্তু তাহার উন্নতি বা স্থায়িত্বের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না; দক্ষিণ দিকে সে চেষ্টা পরাভূত হইল; সুইজারলাণ্ডের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহা ক্ষুদ্র আকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিল; উত্তরে ফ্লাণ্ডার্সের পৌরতন্ত্রে, রাইনতীরে, হান্সেয়াটিক লীগে ইহা পুরপ্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিল। এই অবস্থায় যদিও সমাজের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা পৌরতন্ত্র হীনবল ছিল, তথাপি ফিউড্যাল্ অভিজাতবর্গ ইহাকে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। ভূস্বামিগণ পুরীগুলির ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিতেন এবং তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি দেখিয়া শঙ্কিত হইতেন; গ্রাম্য জনপদের মধ্যে এই গণতন্ত্রের ভাব প্রবেশ করিতে লাগিল; গ্রাম্য কৃষকগণ বারম্বার দৃঢ়তার সহিত বিদ্রোহ করিতে লাগিল। প্রায় সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া ফিউড্যাল্ অভিজাতবর্গ পৌরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দল বাঁধিয়া ফেলিল। দুই অসমান শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল; কারণ, পুরীগুলি ছিল পরস্পর স্বতন্ত্র, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া ছিল না, চিন্তাবিনিময় ছিল না, তাহাদের সমস্ত চিন্তাচেষ্টাই স্ব স্ব সীমায় আবদ্ধ ছিল। অবশ্য বিভিন্ন দেশের পৌরপ্রধানদিগের মধ্যে কতকটা সহানুভূতি ছিল; বর্গণ্ডীর ডিউকদিগের সহিত সংগ্রামে ফ্লাণ্ডার্সের পৌরসমাজের জয়পরাজয়ের বার্ত্তায় ফরাসী পৌরসমাজের চিত্ত আলোড়িত হইত সত্য; কিন্তু এ আলোড়ন ক্ষণস্থায়ী ও নিষ্ফল; ইহার ফলে কোন যথার্থ ঐক্যবন্ধন বা সন্ধিবন্ধন হয় নাই; পুরীগুলি পরস্পরকে শক্তিদান করিতে পারে নাই। সুতরাং পৌরসমাজ অপেক্ষা ফিউড্যাল্ সমাজের অনেক বেশী সুবিধা হইল। কিন্তু ফিউড্যাল্ সমাজের নিজের মধ্যেই অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা, সুতরাং সে পৌরসমাজ-

গুলিকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারিল না। কিয়ৎকাল এই সংঘর্ষ চলিবার পর, যখন তাহাদের প্রতীতি হইল যে, সম্পূর্ণ বিজয় লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন ঐ সকল গণতন্ত্রবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌরপ্রধান-দিগকে মানিয়া লওয়া আবশ্যক হইল, তাহাদিগের সহিত সন্ধি করা ও তাহাদিগকে রাষ্ট্রের অঙ্গস্বরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক হইল। তখন এক নূতন চেষ্টা আরম্ভ হইল, একটা সন্ধিবদ্ধ সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইল। এ চেষ্টার লক্ষ্য ছিল ফিউড্যাল্ ভূস্বামী, পৌরবর্গ, যাজকবর্গ ও রাজন্যবর্গ, সমাজের এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানের বিরোধ মিটাইয়া, পরস্পর বিদ্বেষ সত্ত্বেও সকলকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করান।

ফ্রান্সের ষ্টেট্স্ জেনারাল, স্পেন ও পর্টুগালের কর্ত্তেস্, ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট, জার্ম্মানীর ডীট্, এগুলি যে কি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। এই সকল বিভিন্ন সম্মিলনীর উপাদান কি কি ছিল, তাহাও আপনারা জানেন। ফিউড্যাল্ অভিজাতগণ, যাজকগণ ও পৌরগণ এক শাসনাধীন একটি সম্মিলিত সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য এই সমস্ত সম্মিলনীতে একত্র হইতেন। বিভিন্ন নামধারী এই সকল সম্মিলনীর একই লক্ষ্য, একই চেষ্টা।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্রান্সের ষ্টেট্স্ জেনারালটিকে ধরা যাউক। এই সম্মিলনী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। ইহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী কি ছিল না ছিল, ইহার সভ্যসংখ্যা কত ছিল, কি কি বিষয়ে এখানে আলোচনা হইত, কত দিন পরে পরে ইহা আহূত হইত, এক একটী অধিবেশনের স্থায়িত্ব কতটুকু ছিল—এ সকল বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। ইতিহাস হইতে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট, সাধারণ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। ফ্রান্সের ইতিহাসে এই সকল সম্মিলনীর প্রকৃতি সম্বন্ধে

সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এগুলি যেন আকস্মিক ব্যাপার, প্রজার হাতেই হউক বা রাজার হাতেই হউক, এগুলি যেন শেষ অস্ত্র ; রাজার অর্থ চাই, অর্থাভাব মোচনের অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ষ্টেট্‌স্ জেনারাল ডাকিলেন। প্রজাগণ অন্যায় অকল্যাণ প্রতিবিধানের অন্য কোন উপায় পাইল না, তখন তাহারা ষ্টেট্‌স্ জেনারালের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এ সম্মিলনীতে অভিজাতবর্গ উপস্থিত হইতেন, যাজকবর্গও যোগদান করিতেন, কিন্তু তাঁহারা উদাসীন ভাবে আসিতেন ; কারণ, তাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের যথার্থ কার্য্য এ উপায়ে সম্পন্ন হইবে না, সমাজ শাসনে তাঁহারা যথার্থ যে অংশ গ্রহণ করেন, এ সম্মিলনীর দ্বারা তাহাতে কোন সহায়তা হইবে না। পৌরগণের উৎসাহও ইহা অপেক্ষা অধিক ছিল না, ইহা এমন একটা অধিকার নহে, যাহা পরিচালন করিতে তাঁহারা ব্যগ্র, কেবল প্রয়োজনের তাড়নাতেই তাঁহারা ইহা মানিয়া যাইতেন মাত্র। এই সকল সম্মিলনীর রাষ্ট্রনৈতিক অনুষ্ঠানের ইহাই যথার্থ পরিচয়। ইহারা কখনও বা একেবারে নগণ্য, কখনও বা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত। রাজার পরাক্রম যখন অধিক, তখন ইহাদের নম্রতা ও বশ্যতা একেবারে চরম সীমায় উপনীত হইত। রাজার অবস্থা যখন দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত, সম্মিলনীর উপর যখন তাঁহার একান্ত নির্ভর, তখন সভ্যগণের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হইত এবং সম্মিলনী তখন কোন অভিজাত ষড়্‌যন্ত্র বা দুরাকাঙ্ক্ষ নেতার হস্তে অস্ত্রস্বরূপে পরিণত হইত। সুতরাং তাহাদের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইত ; তাহাদের আশ্বাস ও উদ্যম অল্প ছিল না, কিন্তু তাহারা কিছুই করিয়া যাইতে পারে নাই। যে সমস্ত বড় বড় অনুষ্ঠান বাস্তবিক পক্ষে ফরাসীসমাজের উপর কাজ করিয়াছে, শাসনতন্ত্রগঠন, ব্যবস্থা প্রণয়ন বা শাসন ব্যাপারে

যে সমস্ত সংস্কার সাধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোনটিই ষ্টেট্‌স্ জেনারাল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাই বলিয়া যে তাহাদের কোনই কার্য্যকারিতা বা প্রভাব ছিল না, তাহা মনে করিলে চলিবে না। তাহাদের একটা নৈতিক প্রভাব হইয়াছে, এবং সাধারণতঃ এই নৈতিক প্রভাবের বড় একটা হিসাব লওয়া হয় না। তাহারা যুগ যুগান্তর ধরিয়া রাষ্ট্রনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে, দেশের লোকের যে কর বসাইবার অধিকার আছে, স্বকীয় শাসন-ব্যাপারে যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে, শাসকবৃন্দের উপর একটা দায়িত্ব আরোপ করিবার অধিকার আছে, এইরূপ কতকগুলি মূল রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব তাহারা প্রবলভাবে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে।

এই সমস্ত তত্ত্ব যে ফ্রান্সে কখনই লুপ্ত হয় নাই, তাহা ষ্টেট্‌স্ জেনারালের জন্য। দেশের লোকের চিন্তা ও ব্যবহারে এইরূপে স্বাধীনতার স্মৃতি উজ্জীবিত করিয়া রাখা একটা সামান্য উপকার নহে। ষ্টেট্‌স্ জেনারালের ইহাতেই কৃতিত্ব; কিন্তু তথাপি সে কখনও দেশ শাসনের প্রধান যন্ত্র হইতে পারে নাই; সে কখনও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির অঙ্গ-স্বরূপ পরিণত হয় নাই। দেশের জনসমাজ যে কয়েকটি বিভিন্ন খণ্ড সমাজে বিভক্ত, তাহাদিগকে একত্র করিয়া একটি বৃহৎ জাতীয় সমাজ গঠন করার জন্য ষ্টেট্‌স্ জেনারালের সৃষ্টি; কিন্তু এ উদ্দেশ্য সে সাধন করিতে পারে নাই।

স্পেন ও পর্ত্তুগালের কর্ত্তেসেরও সেই এক পরিণাম। তবে সহস্র বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া এ পরিণাম নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। স্থানকালবিশেষে কর্ত্তেসের মর্য্যাদারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আরাগন ও বিস্কে প্রদেশে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেছিল, অথবা মুরদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলিতেছিল, সুতরাং

সেখানে কর্ত্তেসের অধিবেশনও ঘন ঘন হইত, পরাক্রমও বেশী ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে, যথা ১৩৭০ ও ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দের কাস্তিল্ কর্ত্তেসে, অভিজাতবর্গ ও যাজকবর্গ আহূতই হইত না। ঘটনাবলী ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে এইরূপ রাশি রাশি বিশেষ তথ্যের হিসাব লইতে হয়। কিন্তু আমাকে এখানে সাধারণ ভাবেই আলোচনা করিতে হইবে; সেই সাধারণ হিসাবে ফ্রান্সের ষ্টেট্স্ জেনারালের মত কর্ত্তেস্ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, তাহারা ইতিহাসে আকস্মিক ব্যাপার মাত্র, তাহারা কখনও একটা পদ্ধতি বা শৃঙ্খলা বা রীতিমত শাসন-প্রণালী গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।

ইংলণ্ডের ভাগ্য অন্যরূপ। এ বিষয়ে আমি এখন বিশেষভাবে আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহি। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় জীবন লইয়া একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করিব। ইংলণ্ডের ইতিহাসের গতি কি কি কারণে ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পৃথক্ হইল, এখানে কেবল সেই সম্বন্ধেই দুই এক কথা বলিব।

প্রথম দেখিতে হইবে, ইংলণ্ডে এমন কোন ভূস্বামী ছিল না, এমন কোন পরাক্রান্ত প্রজা ছিল না যে, ব্যক্তিগত ভাবে রাজার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারে। ইংলণ্ডের বেরন্ ও বড় বড় ভূস্বামীকে রাজশক্তিকে বাধা দিবার জন্য একত্র দল বাঁধিতে হইয়াছিল। এইরূপে অভিজাত-সমাজে সঙ্ঘনীতি ও যথার্থ রাষ্ট্রনৈতিক রীতিনীতির প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। তাহা ছাড়া ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণকে ক্রমশঃ নানা ঘটনাবলীর তাড়নায় পৌরবর্গের সহিত সম্মিলিত হইতে হইয়াছিল, তাঁহাদিগের সহিত একত্র পার্লিয়ামেণ্টের হাউস্ অব্ কমন্সে অর্থাৎ সাধারণ জনসভায় বসিতে হইয়াছিল। এইরূপে সাধারণ জনসভা সেখানে ইউরোপের অন্যান্য দেশের জনসম্মিলনী অপেক্ষা প্রভাবশালী হইয়া উঠিল, দেশের

শাসনব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিবার যথার্থ সামর্থ্য লাভ করিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইংরেজের পালিয়ামেণ্টের কিরূপ অবস্থা ছিল, দেখা যাউক। হাউস্ অব্ লর্ডস্ অর্থাৎ অভিজাতসভা রাজার মন্ত্রিসভার মত ছিল, শাসনব্যাপারে তাহারা মুখ্যভাবে সংযুক্ত ছিল। সাধারণ জনসভা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও পৌরবর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। শাসনকার্য্যে তাহাদিগের কোন যোগ ছিল না, কিন্তু তাহারা প্রজার নানা অধিকার প্রতিষ্ঠা করিত, এবং একান্ত উত্তমের সহিত প্রজাদিগের ব্যক্তিগত ও স্থানীয় স্বার্থ রক্ষা করিত। সমগ্রভাবে পার্লিয়ামেণ্ট এখনও শাসনভার গ্রহণ করে নাই, কিন্তু এখনই ইহা একটি রীতিমত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, শাসন ব্যাপারের অপরিহার্য্য যন্ত্রস্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে। এইরূপ সমাজের বিভিন্ন উপাদান সম্মিলিত করিয়া একটি রীতিমত রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠনের চেষ্টা ইংলণ্ডে সফলতালাভ করিল, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশে সর্ব্বত্রই ব্যর্থ হইয়া গেল।

আমি জার্ম্মানী সম্বন্ধে কেবল দুই এক কথা বলিব। জার্ম্মান ইতিহাসের প্রধান লক্ষণটি নির্দ্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। সেখানে এই মিশ্রণ ও একীকরণের চেষ্টা তেমন উত্তমের সহিত চলে নাই। সমাজের বিভিন্ন উপাদান ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এখানে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করিতেছিল। যদি প্রমাণ আবশ্যক হয়, আধুনিক কাল হইতেই একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কেবল জার্ম্মানীতেই এত দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাচীন ফিউড্যাল্ নির্ব্বাচনপ্রথানুসারে রাজশক্তি গঠিত হইয়া আসিয়াছে। আমি অন্য পোলাণ্ড বা শ্লাভোনীয় জাতিদিগের কথা আনিতেছি না, তাহারা ত অনেক বিলম্বে ইউরোপীয় সভ্যতার গণ্ডীমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহা

ছাড়া ইউরোপের মধ্যে কেবল জার্ম্মানীতেই যাজকরাজ্য স্থায়ী হইয়াছে, জার্ম্মানীতেই কেবল রাষ্ট্রীয় সত্তাসম্পন্ন যথার্থ রাজক্ষমতা-মণ্ডিত স্বাধীন পৌরতন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, আদিম ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান একমাত্র জাতীয় সমাজে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা অন্যত্র অপেক্ষা জার্ম্মানীতে নিস্তেজ ও নিষ্ফল হইয়াছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যে সমস্ত বড় বড় চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস এখন আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। আপনারা দেখিলেন যে, সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। প্রসঙ্গক্রমে আমি এই ব্যর্থতার কারণগুলিও নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে এই সকল বিভিন্ন কারণ এক মূলকারণের অন্তর্নিহিত। সমাজ তখনও ঐক্য বন্ধনের পক্ষে যথেষ্ট উন্নত হয় নাই; মানুষের চিন্তা ও মানুষের জীবন সমস্ত ব্যাপারই তখন সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এমন কোন সাধারণ স্বার্থবোধ বা সাধারণ মতের উদ্ভব হয় নাই, যাহা দ্বারা বিশেষ স্বার্থ ও বিশেষ মতামত নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। উন্নত ও চিন্তাশীল মনীষীদিগের মনেও তখন শাসন ব্যাপার ও রাষ্ট্রীয় ন্যায়ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন সম্যক্ ধারণা জন্মে নাই। বোধ হয় ইহা আবশ্যক ছিল যে, একটা সক্রিয় ও সতেজ সভ্যতা আসিয়া আগে সমাজের এই সকল পরস্পরবিরোধী উপাদানগুলিকে পেষণযন্ত্রে চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া দিবে; ইহা আবশ্যক ছিল যে, প্রথমে নানা বিচিত্র স্বার্থ, বিধিবিধান, রীতিনীতি ও চিন্তাকল্পনা একীকৃত ও কেন্দ্রীভূত হইবে; এক কথায় আবশ্যক ছিল যে, একটা সাধারণ শক্তি ও সাধারণ মতের উদ্ভব হইবে। যে যুগে এই বিরাট্ কেন্দ্রীকরণ ব্যাপার সম্পন্ন

হইয়াছিল, এখন আমরা সেই যুগের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছি। এই ব্যাপারের পূর্ব্বলক্ষণ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে লোকের চিন্তা ও রীতিনীতির অবস্থা, একটা কেন্দ্রশক্তি ও সাধারণ লোকমত গঠনের দিকে সমাজের গতি, ইহাই পরবর্ত্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

একাদশ অধ্যায়

এখন আমরা আধুনিক ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছি। যে সমাজ, যে রীতিনীতি, যে মতামত, যে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত সমগ্র ইউরোপখণ্ডে অক্ষুণ্ণপ্রতাপে বিরাজমান ছিল, এবং যাহা এখন পর্য্যন্ত ফরাসী-বিপ্লব সত্ত্বেও ইউরোপীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সেই সমাজের স্বচনা এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীতেই আধুনিক সমাজের স্বচনা। এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একবার মনে করিয়া লউন, কোন্ কোন্ পথ অতিক্রম করিয়া আমরা এ স্থলে আসিয়া উপনীত হইলাম। প্রথমতঃ রোমীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা আধুনিক ইউরোপের সমস্ত মৌলিক উপাদানগুলিরই সন্ধান পাইয়াছি, পরে দেখিয়াছি, কিরূপে তাহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন বিকাশ ও প্রভুত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইতিহাসের প্রথম যুগে এই সকল বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব কিরূপে স্বতন্ত্রভাবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ বিশেষ স্থানে, বিশিষ্ট আকারে গণ্ডীবদ্ধ জীবন গঠন করিতে চাহিয়াছিল, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এ উদ্দেশ্য যখনই সিদ্ধ হইল,—ভূস্বামিতন্ত্র, পৌরতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র যখনই তাহাদের বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করিয়া সামাজিক জীবনে এক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া বসিল, সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, তাহারা আবার পরস্পর সন্নিহিত হইয়া, পুনর্ম্মিলিত হইয়া একটা সাধারণ জনসমাজ, একটা জাতি ও জাতীয় শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে চায়। ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই তখন এককালে একাধিক শক্তির অধিষ্ঠান—একদিকে

যাজকতন্ত্র, একদিকে পৌরতন্ত্র, অন্য দিকে ভূস্বামিতন্ত্র। অথচ একটা সম্মিলিত জাতীয় সমাজ ও সমাজতন্ত্র গড়িতে হইলে এই সমস্ত খণ্ডসমাজ ও খণ্ডশক্তির উপর একটা ব্যাপক সমাজ ও ব্যাপক শাসনতন্ত্রের আবশ্যক। সমস্ত দেশেই তখন সন্ধান আরম্ভ হইল, এমন একটা নেতৃশক্তি কোথায় পাওয়া যায়, যাহা সমাজকে ঐক্যদান করিবে, যাহা এক নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সূত্রে সমাজকে বন্ধন করিতে পারিবে। তাহারা যাজকতন্ত্র, ভূস্বামিতন্ত্র, পৌরতন্ত্র, রাজতন্ত্র,—একে একে প্রত্যেকের নিকটই এই ঐক্যসূত্র প্রার্থনা করিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, এ সকল চেষ্টা সফল হয় নাই। কিরূপে সমগ্র সামাজিক জীবনের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া, সেই অধিকারের প্রভাবে নিজকে স্থায়িভাবে একটা যথার্থ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়, পূর্ব্বোক্ত খণ্ডসমাজতন্ত্রগুলির মধ্যে কেহই তাহা তখন জানিত না। আমরা দেখিয়াছি যে, সাধারণ জাতীয় স্বার্থ বা সাধারণ জাতীয় ভাব ও চিন্তার অভাবই এই অকৃতকার্য্যতার কারণ। সমস্তই তখন ছিল বিশিষ্ট, খণ্ডিত, স্থানবদ্ধ, গণ্ডীবদ্ধ; এ সমাজ যদি বিস্তৃতি ও ঐক্য লাভ করিতে চায়, এককালে সমৃদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে চায়, তাহা হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবলভাবে কেন্দ্রীকরণনীতি অনুসরণ করিলে তবে সে সামর্থ্য লাভ করিবে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আমরা সমাজকে এই অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি।

তদানীন্তন সমাজের অবস্থা যে ভাবে আপনাদের সমক্ষে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম, সমাজ কিন্তু একেবারেই তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে যে কি চাহে, কি খুঁজিতেছে, নিজেই তাহা স্পষ্টরূপে জানিত না; অথচ সে এমনি ব্যগ্রতাসহকারে সন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছে, যেন সে জানে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অবসান হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ

স্বভাবতঃই যেন সহজসংস্কারবশে কেন্দ্রীকরণের পথে অগ্রসর হইল। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতিহাসের ইহাই বিশেষ লক্ষণ। সে যুগে ইউরোপ সাধারণ স্বার্থ ও সাধারণ চিন্তা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে; স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও গণ্ডীবদ্ধতার ভাব দূর করিয়া, মানুষের জীবন ও মানুষের চিন্তার ঐক্য ও উন্নতিসাধন করিতে যত্ন করিয়াছে; এক কথায় নূতন করিয়া জাতীয় জীবন ও জাতীয় শাসনতন্ত্র গঠন করিতে চাহিয়াছে। এ ব্যাপারের পূর্ণ বিকাশ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতেই ইহার সূত্রপাত। এই সূত্রপাতের ইতিহাসই আপাততঃ আমাদের আলোচ্য বিষয়। কি সামাজিক জীবনে, কি চিন্তারাজ্যে, এই যে কেন্দ্রীকরণব্যাপার, ঘটনাপরম্পরার স্বাভাবিক স্রোতে কোন প্রকার প্রাক্‌সঙ্কল্প বা চিন্তা চেষ্টা ব্যতিরেকে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, ইহারই নীরব নিগূঢ় ধারা আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে।

এইরূপে মানুষ এমন অনেক কার্য্য সাধন করে, যাহার সমগ্র কল্পনা তাহার চিত্তে কখনও স্থান পায় নাই, তাহার বুদ্ধি কখনও ধারণা করিতে পারে না। সে সজ্ঞানে স্বাধীনভাবে এমন অনেক ব্যাপার সৃষ্টি করে, যাহা বাস্তবিক পক্ষে তাহার নিজের সৃষ্টি নহে। যতক্ষণ তাহার সৃষ্টি কালক্রমে বাহ্য আকার ধারণ করিয়া বাস্তব সত্তা লাভ না করে, ততক্ষণ সে তাহা চিনিতেও পারে না, বুঝিতেও পারে না; এবং যখন বোঝে, তখনও সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারে না। অথচ তাহারই দ্বারা, তাহারই বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা এ সৃষ্টি সাধিত হয়। মনে করুন, একটি বৃহৎ ও জটিল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সমগ্র যন্ত্রটির পরিকল্পনা একজন মাত্র লোকের মনে রহিয়াছে এবং যন্ত্রের বিভিন্ন খণ্ড নির্ম্মাণের ভার ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর হস্তে ন্যস্ত;

এই সকল শিল্পিগণ পরস্পরের নিকট অপরিচিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; ইহারা কেহই সমগ্র যন্ত্রের আকৃতি প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না; অথচ প্রত্যেকেই বুদ্ধিসহকারে স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা স্বেচ্ছায় নিজ নিজ অংশ সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে। এইরূপেই জগতে বিধাতার উদ্দিষ্ট কর্ম্ম মানুষের হস্তদ্বারাই সম্পন্ন হয়; এইরূপেই সভ্যতার ইতিহাসে যে দুইটি বৃহৎ তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার সমন্বয় সাধিত হয়;—এক দিকে বিধাতৃবিহিত নিয়তি, বিজ্ঞান যাহার সন্ধান পায় না, মানুষের ইচ্ছাশক্তি যাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না—অপর দিকে মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টা, মানুষ যাহা নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়, নিজের বুদ্ধি, নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে সম্পন্ন করে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতিহাস যথার্থভাবে বুঝিবার জন্য, আধুনিক সমাজের এই সূচনাংশের সুস্পষ্ট ও যথাযথ ধারণা করিবার জন্য, আলোচ্য তথ্যগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা আবশ্যক। প্রথমে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তথ্যের আলোচনা করিব, যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় জাতি এবং রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গঠনের সহায়তা সাধিত হইয়াছে. সেগুলির সন্ধান লইব। পরে আমরা মানসিক তথ্যের আলোচনা করিব; মানুষের চিন্তা, ধারণা ও রীতিনীতির মধ্যে কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, লক্ষ্য করিব এবং তাহা হইতে বাহির করিতে চেষ্টা করিব, তখন কোন্ কোন্ মত গঠিত হইতেছে। রাষ্ট্রনৈতিক তথ্যের আলোচনায়, অল্পের মধ্যে সহজে বুঝাইবার জন্য আমি একে একে ইউরোপের বড় বড় দেশগুলির দিকে আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব এবং দেখাইতে চেষ্টা করিব, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বা তাহাদের কি অবস্থা ছিল, অবসানকালেই বা কি অবস্থা দাঁড়াইল।

প্রথমে ফ্রান্সের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ও

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ জাতীয় বিগ্রহের যুগ, তখন ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের তুমুল বিগ্রহ। এ যুগে ফ্রান্স বিদেশী শাসনের হস্ত হইতে ফ্রান্সের স্বাধীনতা ও ফরাসীর নাম রক্ষার জন্য যুদ্ধে নিরত। ইতিহাসের দিকে একবার মাত্র দৃক্‌পাত করিলেই দেখিবেন যে, যদিও তখন গৃহ-বিবাদ ও দেশদ্রোহিতার অসদ্ভাব ছিল না, তথাপি ফ্রান্সের সকল শ্রেণীর লোক অদম্য উৎসাহে উদ্দীপনা সহকারে এই সংগ্রামে মিলিত হইয়াছিল। কি ভূস্বামিবর্গ, কি পৌরবর্গ, কি কৃষকবর্গ, সকলেরই মধ্যে স্বদেশপ্রেম দেখা দিয়াছিল। এই উন্মাদনা লোকসমাজে কিরূপ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল, তাহার যদি অন্য কোন প্রমাণ নাও থাকিত, তাহা হইলে এক জোয়ান্ অব্ আর্কের ইতিহাসই যথেষ্ট প্রমাণ। জোয়ান্ অব্ আর্ক সাধারণ কৃষকের গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিল। সাধারণ জনসমাজের যে সমস্ত ভাব, বিশ্বাস ও রাগদ্বেষ, জোয়ান তাহা-দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত হইয়াছিল। রাজসভাসদ্ ও সেনাপতি-সমাজে জোয়ান্‌কে অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, এমন কি, বৈরিতার চক্ষে দেখিত; কিন্তু জনসাধারণ ও সামান্য সৈনিকবৃন্দ বরাবর তাহার দিকে ছিল। লরেনের কৃষকগণ তাহাকে অর্লেয়াঁর পৌরবর্গের সাহায্যে পাঠাইয়াছিল। এই স্বাধীনতা-সমরে সর্ব্বসাধারণ কিরূপে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল, এই ঘটনাই তাহার সুন্দর প্রমাণ।

এইরূপে ফরাসী জাতীয়তার গঠন আরম্ভ হইল। ভালোয়া রাজ-গণের শাসনকাল পর্য্যন্ত ভূস্বামিতন্ত্রই ফ্রান্সে আধিপত্য করিয়াছিল; ফরাসীজাতি, ফরাসীচিত্ত, ফরাসী স্বাদেশিকতা, এ সকলের তখন পর্য্যন্ত অস্তিত্ব ছিল না। ভালোয়ারাজগণের সঙ্গে সঙ্গেই যথার্থ ফ্রান্সের উদ্ভব ঘটিল। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের সময়েই নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া ভূস্বামী, পৌর, কৃষক, সকল শ্রেণীর লোক সর্ব্বপ্রথম একটা নৈতিক

বন্ধনে আবদ্ধ হইল। এ বন্ধন জাতীয় নামের বন্ধন, জাতীয় সম্মানের বন্ধন, বিদেশী শত্রুকে পরাজয় করিবার জন্য জাতীয় ইচ্ছার বন্ধন। কিন্তু যথার্থ রাষ্ট্রনৈতিক ভাব যাহাকে বলে, শাসনতন্ত্র ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ঐক্যসাধন বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, সেরূপ কোন লক্ষ্য এখানে দেখিতে প্রত্যাশা করিবেন না। এ যুগের ফ্রান্সে যে জাতীয় ঐক্য দেখা যায়, তাহা জাতীয় নামের ঐক্য, জাতীয় সম্মানের ঐক্য, জাতীয় রাজশাসনের ঐক্য। সে রাজশাসনের প্রকৃতি কিরূপ, গঠন কিরূপ, দেখিবার আবশ্যক নাই, তাহার মধ্যে বিদেশী প্রবেশ না করিলেই হইল। এইরূপে ইংরেজের সহিত এই সংঘর্ষই ফরাসীর জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করিল, ফরাসীজাতিকে ঐক্যবন্ধনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল। এ দিকে যখন জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে ফ্রান্স আপনার জাতীয় সত্তা গড়িয়া তুলিতেছিল, সেই সময়েই বাস্তব ক্ষেত্রেও ফ্রান্স আপনার রাষ্ট্রদেহ গড়িয়া তুলিতেছিল, ফ্রান্সের রাষ্ট্রসীমা তখন নিয়ন্ত্রিত, বিস্তৃত ও দৃঢ়ীকৃত হইতেছিল। যে সমস্ত প্রদেশ লইয়া ফ্রান্স গঠিত, তাহার অধিকাংশই এই সময়ে ফরাসীরাষ্ট্রভুক্ত হয়। সপ্তম চার্লসের সময়ে, ইংরেজগণ বিতাড়িত হইলে পর, নরমাণ্ডী, আঁগুমোয়া (Angumois), তুরেন্ (Touraine), পোয়াতু (Poitous), সঁ্যাতোঁজ্ (Saintonge) প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ইংরেজাধিকৃত প্রদেশই এখন নিঃসংশয়ে ফরাসীরাষ্ট্রভুক্ত হইল। একাদশ লুইর সময়ে রুসীয়িয় (Rousillion), সেরদাঞি (Cerdagne), বর্গণ্ডী, ফ্রাঁষ্-কোঁতে (Franche Comte), পিকার্দী, আর্তোয়া (Artois), প্রোভাঁস্ (Provence), মেন্, আঁজু (Anjou) এবং পের্ষ্, এই দশটি প্রদেশ ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। অষ্টম চার্লস্ ও দ্বাদশ লুইর সময়ে, রাজ্ঞী আনের সহিত বিবাহসূত্রে বৃটানী ফরাসী অধিকারে আসিল। এইরূপে

একই সময়ে একই ঘটনাস্রোতে জাতীয় চিত্ত ও জাতীয় রাষ্ট্র একসঙ্গে গঠিত হইতে লাগিল, একসঙ্গে শক্তি ও ঐক্য অর্জ্জন করিল।

এখন জাতীয় শাসনতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক ; এ ক্ষেত্রেও একই রূপ ঘটনা এবং একই রূপ পরিণাম। ষষ্ঠ চার্ল্‌সের রাজ্যকালে ও সপ্তম চার্ল্‌সের রাজ্যকালের প্রথমার্দ্ধে ফরাসী শাসনতন্ত্র যেরূপ ঐক্যহীন, অসংলগ্ন ও শক্তিহীন ছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই। সপ্তম চার্ল্‌সের রাজত্বের শেষভাগে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য। ইতিমধ্যে যে শাসনতন্ত্র বল, বিস্তৃতি ও শৃঙ্খলা লাভ করিয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখা যায়। রাষ্ট্রশাসনের সমস্ত অঙ্গ ও উপাদান,—রাজস্ব বলুন, সৈনিকবল বলুন, আইন বলুন, সমস্তই তখন বৃহদাকারে যথাসম্ভব নীতি-শাস্ত্রানুসারে পুনর্গঠিত হয়। এই যুগেই স্বাধীন অশ্বারোহিদল এবং স্বাধীন ধনুর্দ্ধারী পদাতিকদল লইয়া স্থায়ী সেনা গঠিত হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও সৈন্যগণের অত্যাচার উৎপীড়নে যে সমস্ত প্রদেশ বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সপ্তম চার্ল্‌স্ এই সকল নবগঠিত স্থায়ী সেনার সাহায্যে সেই সেই স্থানে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ সকলেই সমস্বরে এই স্থায়ী সেনার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকারিতায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। এই যুগেই রাষ্ট্রের প্রধান রাজস্ব জনকর (Poll-tax) স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল ; ইহাতে জনসাধারণের স্বাধীনতায় আঘাত পড়িল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা শাসনতন্ত্র সুব্যবস্থিত ও শক্তিশালী হইল। এই সময়ে শাসনতন্ত্রের আর একটি প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ বিচারব্যবস্থা বিস্তৃত ও নিয়ন্ত্রিত হইল ; পার্লিয়ামেণ্ট অর্থাৎ বিচারালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচটি নূতন পার্লিয়ামেণ্ট গঠিত হইল ; যথা—একাদশ লুইর সময়ে গ্রেনোবল্ (Grenoble), বর্দো (Bordeaux) ও দিজোঁ (Dijon) পার্লিয়া-

মেণ্ট ; এবং দ্বাদশ লুইর সময়ে রুয়াঁ (Rouen) এবং এ (Aix) পার্লিয়ামেণ্ট। প্যারীনগরের পার্লিয়ামেণ্টও এই সময়ে অধিকতর শক্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করিল। এইরূপে শাসনতন্ত্রের যে তিনটি মূল উপাদান অর্থাৎ সৈন্যবল, রাজস্ব ও বিচারব্যবস্থা, এই তিন বিষয়ে ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র পঞ্চদশ শতাব্দীতে এমন একটা স্থায়ী ও সুনিয়ন্ত্রিত আকার ধারণ করিল,যাহা তৎপূর্ব্বে অপরিজ্ঞাত ছিল। সাধারণ জাতীয় শক্তি স্পষ্টরূপে ভূস্বামিতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিল।

এই সময়ে আর একটি বিভিন্নপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এ পরিবর্ত্তন তেমন সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং ঐতিহাসিকগণও ইহার তাৎপর্য্য তেমন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ; কিন্তু বোধ হয়, ইহা পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন অপেক্ষাও গুরুতর। একাদশ লুই শাসনপ্রণালীর মধ্যে যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছিলেন, আমি তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

একাদশ লুই কিরূপে উচ্চশ্রেণীর অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কিরূপে তাহাদিগকে হীনতা স্বীকার করাইয়াছিলেন, পৌরবর্গ ও নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের প্রতি তিনি কিরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। এ সকল কথার মধ্যে সত্য আছে, যদিও ইহার মধ্যে অত্যুক্তির ভাগ নিতান্ত অল্প নহে। ইহাও সত্য যে, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজার সহিত একাদশ লুইর বিভিন্ন ব্যবহার রাষ্ট্রমধ্যে যে পরিমাণ উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছে, সে পরিমাণে রাষ্ট্রের উপকার সাধন করে নাই। কিন্তু তিনি তাহা অপেক্ষা একটি বড় কাজ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত শাসনতন্ত্র প্রায় কেবল পশুশক্তি ও বাস্তব উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। যুক্তি-প্রয়োগাদির দ্বারা লোকচিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করা, সুকৌশলে ধীরে ধীরে লোকমত গঠন করা, এক কথায় যাহাকে বলে নীতিকৌশল

—এ সকলের দিকে পূর্ব্বে কেহ দৃক্‌পাত করে নাই। এ নীতিকৌশলের মধ্যে অবশ্য মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার ভাগই অধিক ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে নেতৃত্বশক্তির ও বিবেচনাশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যাইত। একাদশ লুই শাসনপ্রণালীতে দৈহিক উপায়ের পরিবর্ত্তে মানসিক উপায়, বলের পরিবর্ত্তে কৌশল, ভূস্বামি-নীতির পরিবর্ত্তে ইটালীয় নীতি অবলম্বন করিলেন। যে দুইটি লোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই যুগের ইতিহাস পূর্ণ, সেই একাদশ লুই ও শার্ল ল্য তেমেরেয়ারের (Charles le Temeraire) তুলনা করিয়া দেখুন। চার্ল্‌স্ প্রাচীন শাসনপদ্ধতির প্রতিনিধি; বলপ্রয়োগের দ্বারাই তিনি সমস্ত কার্য্য সম্পন করিতেন, তিনি অনবরতই যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন; সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা বা মানুষের চিত্ত অধিকার করতঃ স্বকার্য্য সাধন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অন্য দিকে যুদ্ধ না করিয়া বাক্যালাপের দ্বারা কৌশলে লোকের স্বার্থবুদ্ধি ও চিত্তগতিকে স্বকার্য্যের অনুকূল করিয়া আনাতেই একাদশ লুইর আনন্দ ছিল। তিনি শাসনতন্ত্রের বাহ্য আকার বা প্রতিষ্ঠানাদির কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই, কেবল গুপ্ত-কার্য্যপ্রণালী ও গুপ্তকৌশল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে ইহা অপেক্ষাও একটা মহত্তর বিপ্লবের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে—কেবল মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক উপায়প্রণালীর মধ্যে নহে, রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে ন্যায়ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, মিথ্যা প্রবঞ্চনার পরিবর্ত্তে প্রকাশ্য ব্যবহার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা। তথাপি বলিতে হইবে যে, যে নীতি অবলম্বন করিয়া একাদশ লুই অবিরাম বলপ্রয়োগ বর্জ্জন করিলেন, বাহুবলের উপর বুদ্ধিবলের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন, সংহার দ্বারা নহে—চিত্তজয়ের দ্বারা শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন, সে নীতি বিশেষ উন্নতির পরিচায়ক। একাদশ লুই তাঁহার সমস্ত পাপ দুর্নীতি সত্ত্বেও

কেবলমাত্র স্বীয় উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির বলে এই মহৎ পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছিলেন।

এখন ফ্রান্স হইতে স্পেনে আসা হউক; সেখানেও ঐ একইরূপ ঘটনা; স্পেনেও ফ্রান্সের মতই পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাতীয় ঐক্য গঠিত হইয়াছিল। সেই সময়ে গ্রানাডাবিজয়ের দ্বারা খৃষ্টীয় ও আরবগণের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষের অবসান হয়। সেই সময়েই দেশের সমস্ত ব্যাপার কেন্দ্রীকৃত হয়; ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার বিবাহের দ্বারা কাষ্টাইল ও আরাগনের এই দুই স্বতন্ত্র রাজ্য একত্র মিলিত হয়। ফ্রান্সের মত এখানেও রাজশক্তি বিস্তৃত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশক্তির প্রয়োগক্ষেত্রস্বরূপ এখানে কতকগুলি কঠোরতর প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটিল। বিচার ব্যবস্থার কেন্দ্রস্বরূপ ফ্রান্সে উঠিয়াছিল পার্লিয়ামেণ্ট, এখানে উঠিল, ইন্‌কুইজিশন্। এই ইন্‌কুইজিশন্ যখন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে, তখন ইহা যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতেই তাহার ভবিষ্যৎ প্রকৃতির সমস্ত বীজ নিহিত ছিল, তবে তখনও তাহা পুষ্টিলাভ করে নাই। ইন্‌কুইজিশন্ প্রথমতঃ বরং রাষ্ট্রশাসনেরই অঙ্গীভূত ছিল, ধর্ম্মশাসনের নহে; ধর্ম্মবিশ্বাস সংরক্ষণ অপেক্ষা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তদানীন্তন ফ্রান্সের সহিত তদানীন্তন স্পেনের সাদৃশ্য কেবল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নহে, ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কেও দেখিতে পাওয়া যায়। ফার্ডিনাণ্ড একাদশ লুইর মত এতটা কৌশলী, ক্ষিপ্রচিত্ত বা অবিশ্রান্তকর্ম্মা ছিলেন না সত্য, কিন্তু উভয়ের চরিত্র ও শাসনপ্রণালীর মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কল্পনামূলক তুলনার ও সাদৃশ্য সন্ধানের আমি কোন সার্থকতা দেখি না, কিন্তু এখানে সমগ্রভাবে ও বিশেষ তথ্যে একটা সুগভীর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

জার্ম্মানীতেও সেই এক ব্যপার। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে নবরোমক সাম্রাজ্য অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের হস্তে ফিরিয়া আসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সম্রাট্‌তন্ত্র এমন একটা স্থায়িত্ব লাভ করিল, যাহা পূর্ব্বে সে কখনও করে নাই। ইহার পরে সম্রাট্‌-নির্ব্বাচন ব্যাপারের আর কোন সার্থকতা রহিল না। বংশগত উত্তরাধিকারীকে বরণ করিয়া লওয়া ভিন্ন নির্ব্বাচন প্রথার অন্য কোন তাৎপর্য্য থাকিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে প্রথম মাক্‌সিমিলিয়ান স্বকীয় বংশের প্রাধান্য এবং নিয়মিতরূপে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র কেন্দ্রশক্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন; সপ্তম চার্লস্‌ শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনোদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম একটি স্থায়ী সেনা গঠন করিয়াছিলেন। মাক্‌সিমিলিয়ানও স্বীয় রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম একই উদ্দেশ্যে একই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। একাদশ লুই ফ্রান্সে ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন, মাক্‌সিমিলিয়ান জার্ম্মানীতে ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব্বত্রই কেন্দ্রশক্তির কল্যাণোদ্দেশে সভ্যতার একইরূপ উন্নতি সাধন ঘটে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের ইতিহাসে দুইটি বড় বড় ঘটনা দেখা যায়,—বাহিরে ফ্রান্সের সহিত সংঘর্ষ; দেশের মধ্যে ইয়র্কের সহিত ল্যাঙ্কাষ্টারের সংঘর্ষ—একদিকে অন্তর্ব্বিগ্রহ, অপর দিকে বহির্বিগ্রহ। এই দুই বিভিন্নপ্রকার বিগ্রহের পরিণামে একই ফল প্রসব করিল। ফরাসীদিগের সহিত সংঘর্ষে ইংরেজ জনসাধারণ যে উদ্যমের সহিত নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে কেবল রাজশক্তিই লাভবান্‌ হইয়াছিল। যদিও ইংরেজ জাতি তখনই রাজার লোলুপ হস্ত হইতে জাতির সম্পদ্‌ ও লোকবল দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিবার শক্তি ও নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিল, তথাপি এ ক্ষেত্রে তাহারা একেবারে অবাধে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরহিত হইয়া রাজশক্তির হস্তে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিল। পঞ্চম হেনরীর রাজ্যকালেই

রাজাকে যাবজ্জীবনের জন্য একটা বড় শুল্ক মঞ্জুর করা হয়। বহির্বিগ্রহের যখন অবসান হইল, অন্তর্বিগ্রহ তখনও চলিতে থাকিল; ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাষ্টার, এই দুই বংশের মধ্যে সিংহাসনের জন্য কলহ বাধিল। তাহাদের রক্তাক্ত কলহের যখন শেষ হইল, তখন দেখা গেল, উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ অভিজাতবর্গ তখন বিধ্বস্ত, সর্ব্বস্বান্ত ও পূর্ব্বক্ষমতা পরিচালনে অসমর্থ। ভূস্বামিসঙ্ঘ এখন আর রাজসিংহাসন টলাইতে পারে না। সে সিংহাসনে এখন টিউডরবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম হেন্‌রীর সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন যুগ আসিল, সে যুগ রাষ্ট্রনৈতিক কেন্দ্রীকরণের যুগ, রাজশক্তির বিজয়-গৌরবের যুগ।

ইটালীতে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অন্ততঃ ঐ নামে হয় নাই; কিন্তু তাহাতে ফলের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতেই পৌরগণতন্ত্রগুলির অধঃপতন হয়; এমন কি, যেখানে নামটি বজায় থাকিল, সেখানেও দুই একটি বিশেষ পরিবারের মধ্যে শাসনশক্তি আবদ্ধ হইল; গণতন্ত্রের তখন জীবনবায়ু নিঃশেষ হইয়াছে। ইটালীর উত্তরাংশে প্রায় সমস্ত লম্বার্ড গণতন্ত্রগুলি মিলানের ডিউকের অধিকারভুক্ত হইল। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্স মেডিচি পরিবারের শাসনে আসিল। ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে জেনোয়া মিলানের অধীন হইল। ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্ব্বিশেষে অধিকাংশ গণতন্ত্রের স্থলেই রাজপরিবারের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। অনতিবিলম্বেই বিদেশী রাজগণ ইটালীর উত্তর ও দক্ষিণ অংশে, উত্তরে মিলানের উপর ও দক্ষিণে নেপল্‌স্ রাজ্যের উপর আধিপত্য দাবী করিতে লাগিল।

ইউরোপের যে কোন দেশের জাতীয় সমাজ, শাসনতন্ত্র, জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রসীমার আলোচনা করি না কেন, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, সমাজের প্রাচীন উপাদান, প্রাচীন গঠনগুলি এ যুগে বিলুপ্ত হইবার

মুখে রহিয়াছে। পরম্পরাগত স্বাতন্ত্র্যাধিকারগুলি বিনষ্ট হইতেছে, এবং তৎস্থলে নূতন নূতন ব্যাপকতর শক্তির উদ্ভব হইতেছে। প্রাচীন ইউরোপীয় স্বাতন্ত্র্যের এই পতনেতিহাস গভীর বিষাদের উদ্রেক করে সন্দেহ নাই; সে সময়ে ইহা তীব্রতম ক্ষোভ ও ক্রোধের কারণ হইয়াছিল। ফ্রান্সে, জার্ম্মানীতে এবং বিশেষতঃ ইটালীতে পঞ্চদশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমিকগণ এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে উদ্যমের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল এবং অকৃতকার্য্য হইয়া নৈরাশ্যের সহিত বিলাপ করিয়াছিল। কারণ, সর্ব্বত্রই এই বিপ্লবের ফলে খণ্ডস্বাতন্ত্র্যের স্থলে যথেচ্ছতন্ত্র কেন্দ্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সকল স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় স্বদেশপ্রেমিকের উৎসাহের প্রশংসা ও তাঁহাদের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না; তথাপি মনে রাখিতে হইবে, এই বিপ্লব কেবল যে অনিবার্য্য ছিল, তাহা নহে, কল্যাণকরও ছিল। ইউরোপীয় সমাজের আদিম ব্যবস্থা, ভূস্বামিবর্গের ও যাজক, পৌর প্রভৃতি খণ্ড সমাজের যে সমস্ত স্বতন্ত্র অধিকার ছিল, তদ্দ্বারা সমাজে ঐক্য বন্ধন ও শৃঙ্খলাস্থাপন হয় নাই। নিরুপদ্রব শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নতিতেই সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা। যে সমাজ-ব্যবস্থা বর্ত্তমানে শান্তি-শৃঙ্খলা দিতে পারে না ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অব্যাহত রাখিতে পারে না, সে ব্যবস্থা শীঘ্রই পরিবর্জ্জিত হয়। প্রাচীন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা, প্রাচীন স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারের পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই দশা ঘটিয়াছিল। তাহারা সমাজে শৃঙ্খলাও আনিতে পারে নাই, উন্নতির অবসরও দিতে পারে নাই। এই শান্তিশৃঙ্খলা ও উন্নতির জন্য মানুষ এখন অন্যত্র, অন্য নীতি ও অন্য উপায়ের সন্ধান করিতে লাগিল। পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাগুলির ইহাই তাৎপর্য্য।

এই যুগে আর একটি ব্যাপারের সূচনা হইল, ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে তাহার প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নিয়মিত স্থায়ী আকার ধারণ করিতে লাগিল। যে সমস্ত বড় বড় মৈত্রীবন্ধনের দ্বারা পরবর্ত্তী কালে ইউরোপীয় শক্তি-সাম্যের সম্ভব হইল, এই সময়েই যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই হউক বা শান্তির উদ্দেশ্যেই হউক, সেই সমস্ত সন্ধিবন্ধন গঠিত হইল। ইউরোপের পর-রাষ্ট্রনীতির উদ্ভব এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এই শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপ মহাদেশের প্রধান প্রধান শক্তি—রোমের পোপ, মিলানের ডিউক, ভেনিসীয় গণতন্ত্র, জার্ম্মান সম্রাট্, স্পেন ও ফ্রান্সের রাজা, সকলেই পরস্পরের সহিত সম্পর্ক পাতাইতেছে, আপোষ পরামর্শ করিতেছে, মিলিত হইতেছে এবং পরস্পরের মধ্যে একপ্রকার শক্তিসাম্য রক্ষা করিতেছে। যখন সপ্তম চার্লস্ নেপল্স্‌রাজ্য অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন, তখন স্পেন, পোপ ও ভেনিস্ তাঁহার বিরুদ্ধে একটি মণ্ডলী বাঁধিয়া ফেলিল। কয়েক বৎসর পরে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ভেনিসের বিরুদ্ধে কাঁব্রের মণ্ডলী গঠিত হইল। তাহার পর ১৫১১ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ লুইর বিরুদ্ধে "হোলি লীগ" বা ধর্ম্মমণ্ডলী নামে একটি মণ্ডলী গঠিত হইল। এই সমস্ত মৈত্রীবন্ধনের মূল কারণ ইটালী; একাধিক রাজশক্তি তখন এই ইটালী অধিকারের কামনা করিতেছেন, এবং প্রত্যেকেরই ভয়, পাছে অন্য কেহ ইটালীকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া অতিপরাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই সমস্ত ঘটনা রাজশক্তির বিকাশ পক্ষে সবিশেষ অনুকূল হইল। একদিকে এই সকল পররাষ্ট্রঘটিত ব্যাপার এক কিম্বা অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোক দ্বারাই পরিচালিত হইতে পারে; কারণ, মন্ত্রগুপ্তিই পররাষ্ট্রনীতির মূল উপাদান; অন্য দিকে জনসাধারণের তখন এতটা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ছিল না যে, এইরূপ একটা মৈত্রীবন্ধনের ফল কি হইতে পারে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে; এ সমস্ত ব্যাপারের সহিত

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার যে কোন যোগ আছে, তাহা তাহারা বুঝিত না; সুতরাং এ সমস্ত ব্যাপারে কোন মনোযোগ না দিয়া, তাহারা কেন্দ্র-শাসনশক্তির বুদ্ধি বিবেচনার উপর সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। এইরূপে পররাষ্ট্রনীতি জন্মকাল হইতেই রাজগণের হস্তে পতিত হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় চিত্তে এই ধারণা দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, দেশ স্বাধীন হইলেও, রাষ্ট্রীয় করনির্দ্ধারণ ও অন্যান্য বিষয়ে দেশের লোকের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিলেও, পররাষ্ট্রনীতি ব্যাপারে কেবলমাত্র রাজশক্তির অক্ষুণ্ণ অধিকার, দেশের লোকের সে ক্ষেত্রে কোন অধিকার নাই। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাস খুলিয়া দেখুন, এই ধারণার প্রভাব কত অধিক ছিল, এলিজাবেথ, প্রথম জেম্‌স্ ও প্রথম চার্লসের আমলে এই ধারণার জন্য প্রজাবর্গের স্বাতন্ত্র্যাধিকার কত বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সর্ব্বদা এই নীতির দোহাই দিয়া রাজশক্তি সন্ধিবিগ্রহ, বাণিজ্যসম্পর্ক ও সমস্ত বাহ্য ব্যাপারে অক্ষুণ্ণ অধিকার দাবী করিয়াছে; এবং এই নীতির সাহায্যেই যথেচ্ছাচারী রাজশক্তি দেশের লোকের অধিকারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াছে। রাজশক্তির এই বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে ইউরোপের জনবর্গ অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করিয়া আসিয়াছে; এবং সঙ্কোচের ফলে তাহাদের অধিকতর ক্ষতি হইয়াছে এই কারণে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপের ইতিহাস মূলতঃ পররাষ্ট্রনীতি দ্বারাই গঠিত। তিন শতাব্দী ধরিয়া রাষ্ট্রের বহিঃসম্পর্কই ইতিহাসের প্রধান ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভাগে জাতিসকল তখন সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, অন্ততঃ ইউরোপের মহাদেশখণ্ডে তখন আভ্যন্তরীণ শাসনে কোন বিশেষ উপদ্রব বা গোলযোগ হয় নাই, আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপার লইয়া জনসাধারণকে ব্যস্ত থাকিতে হয় নাই। এখন হইতে রাষ্ট্রের বহিঃসম্পর্ক,

বহির্বিগ্রহ, পররাষ্ট্রের সহিত সর্ত্তের আদানপ্রদান, মৈত্রীবন্ধন—এই সমস্তই মনোযোগ আকর্ষণ করে ও ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করে; সুতরাং জাতীয় ভাগ্যের অধিকাংশই এখন কেন্দ্রবর্ত্তী রাজশক্তিদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতে লাগিল।

বাস্তবিক পক্ষে, অন্যরূপ ঘটিবার তখন কোন সম্ভাবনা ছিল না বলিলেই হয়। এরূপ ব্যাপারে কৃতকার্য্যতার সহিত হস্তক্ষেপ করিতে হইলে সভ্যতার যে পরিমাণ উন্নতি এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও রাষ্ট্রনৈতিক নৈপুণ্যের যেরূপ বিকাশ আবশ্যক, সে কালে জনসাধারণের সেরূপ বিকাশ হয় নাই। ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রজাবর্গ এরূপ উপযোগিতা হইতে অনেক দূরে ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে প্রথম জেম্‌সের আমলে কিরূপ ঘটিয়াছিল দেখুন; তাঁহার জামাতা বোহিমিয়ার নির্ব্বাচিত রাজা তাঁহার সিংহাসন হারাইলেন; এমন কি, তাঁহার বংশ-পরম্পরাগত পালাটিনেট রাজ্যও হারাইলেন। সমস্ত প্রোটেষ্টাণ্ট জগৎ তাঁহার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ, এই জন্য ইংলণ্ডেও তাঁহার পক্ষে লোকমত প্রবল ছিল। রাজ-জামাতাকে পালাটিনেট্-রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জেম্‌স্ যাহাতে তাঁহার জামাতার পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হন, সেই উদ্দেশ্যে তখন সাধারণের মধ্যে একটা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। পার্লিয়ামেণ্ট ভীষণভাবে যুদ্ধ প্রার্থনা করিল এবং তজ্জন্য অর্থাদি জোগাইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। জেম্‌স্ কিন্তু অনিচ্ছুক; তিনি পাশ কাটাইতে লাগিলেন, জার্ম্মানীতে কতিপয় সৈন্য পাঠাইলেন এবং পরক্ষণেই আসিয়া পার্লিয়ামেণ্টকে বলিলেন, ভাল করিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইলে নয় লক্ষ পাউণ্ড আবশ্যক। তাঁহার এই হিসাব যে অত্যুক্তিদুষ্ট, তাহা কেহই বলে না, সম্ভবতঃ তত অর্থেরই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে

পিছাইয়া গেল, এবং নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত নয় শত মাইল দূরবর্ত্তী এক রাজ্য জয় করিয়া, ন্যায্য অধিকারীর পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে মাত্র সত্তর হাজার পাউণ্ড মঞ্জুর করিল। এরূপ ব্যাপারে সাধারণের অজ্ঞান ও অক্ষমতার ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয় ; তাহারা বাস্তব তথ্যের কোন সন্ধান না লইয়া, কোনরূপ দায়িত্ব স্কন্ধে না লইয়া কার্য্য করিত। জনসাধারণের তখন এমন অবস্থা নহে যে, এ সকল ব্যাপারে সুনিয়মিতভাবে কার্য্য-কারিতার সহিত হস্তক্ষেপ করিতে পারে। রাষ্ট্রের বহিঃসম্পর্ক যে কেন্দ্র-রাজশক্তির হস্তে আসিয়া পড়িল, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। কেবল রাজশক্তিই তখন এই সকল ব্যাপার পরিচালন করিতে সমর্থ ছিল। অবশ্য রাজা যে সব সময়ে সাধারণের কল্যাণের দিকে তাকাইয়া কার্য্য করিতেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কার্য্যের মধ্যে অন্ততঃ একটা যোগসূত্র বা বিচার-বুদ্ধির পরিচয় থাকিত।

এখন দেখিলেন, এ যুগের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়—জাতিসমূহের আভ্যন্তরীণ অবস্থাই আলোচনা করি বা রাষ্ট্রের বহিঃসম্পর্কের বিষয়ই আলোচনা করি, সামরিক ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা বা রাজস্বের বন্দোবস্ত, যে কোন দিকেই তাকাই না কেন—সর্ব্বত্র একই ব্যাপার দেখিতে পাইব ; সর্ব্বত্রই কেন্দ্রীকরণের দিকে, ঐক্যবন্ধনের দিকে, জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণ ও জাতীয় শাসনশক্তি গঠনের দিকে গতি। ইহাই পঞ্চদশ শতাব্দীর নিগূঢ় কার্য্য ; এ কার্য্যের ফলে তখনই কোন বৃহৎ পরিণাম বা যথার্থ বিপ্লব উদ্ভূত হয় নাই সত্য, কিন্তু পর-বর্ত্তী কালের বড় বড় বিপ্লবের পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল। এখন আমি আর এক প্রকার তথ্যের অবতারণা করিব ; মানবচিত্তের বিকাশ ও বিশ্বজনীন চিন্তার গঠন ও পুষ্টি—এই দিক্ দিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করা যাউক। সেখানেও দেখিবেন, ঐ একই ব্যাপার, ঐ একই পরিণাম।

প্রথমতঃ আমি যাজকতন্ত্রসম্পর্কিত ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিব। আমরা দেখিয়াছি, পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্ম-চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার প্রবল বিশ্বজনীন চিন্তা ইউরোপের জন-সাধারণের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সেই ধর্ম্মচিন্তার একমাত্র নিয়ামক, প্রচারক ও প্রযোক্তা ছিল যাজকতন্ত্র। অবশ্য অনেক সময়ে স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা, এমন কি, বিচ্ছেদের চেষ্টাও হইয়াছিল, এবং এই সমস্ত চেষ্টা দমন করিতে যাজকসঙ্ঘকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে জয়ী হইয়া আসিয়াছে। যাজকতন্ত্র যে সমস্ত ধর্ম্মমত অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা লোকচিত্তে ব্যাপক বা স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই; আল্‌বিজেন্‌স্‌ সম্প্রদায়ই নির্ম্মূল হইয়া গেল। যাজকতন্ত্রের অভ্যন্তরে অনবরত বাদবিতণ্ডা চলিত বটে, কিন্তু তাহার কোন সুস্পষ্ট ফল দেখা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক নূতন ব্যাপার দেখা দিল। নূতন নূতন চিন্তা, পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্যভাবে আত্মঘোষণা করিল ও যাজকতন্ত্রকে বিচলিত করিয়া তুলিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে যাজকতন্ত্রের মধ্যে এক মহা বিচ্ছেদ ঘটিল, পোপের আসন রোম হইতে আভীনিয়োঁতে স্থানান্তরিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই পোপের উদ্ভব হইল—একজন রোমে, একজন আভীনিয়োঁতে। এই পোপদ্বয়ের কলহ ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে পিসার ধর্ম্মসংসদ্‌ এই কলহের নিবৃত্তিকল্পে উভয় পোপকেই পদচ্যুত করিয়া, পঞ্চম আলেক-জাণ্ডার নামে এক তৃতীয় পোপ মনোনীত করিলেন। ইহাতে কলহ নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, ঘোরতর হইয়া উঠিল; দুই পোপের স্থানে তিন পোপ হইল। বিশৃঙ্খলা ও অনাচার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ সিগিস্‌মণ্ডের আমন্ত্রণে কন্সটান্সের ধর্ম্মসংসদ্‌

সম্মিলিত হইল। এ সংসদ্ কিন্তু নূতন পোপনির্ব্বাচনের দিকে গেল না, যাজকতন্ত্রের সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিল। ইহাঁরা প্রথমে ঘোষণা করিলেন যে, সাধারণ ধর্ম্মসংসদ্ সাময়িক সম্মিলনী নহে; ইহা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ও ইহার ক্ষমতা পোপেরও উর্দ্ধে। সংসদ্ যাজকতন্ত্রের মধ্যে এই সকল নীতি প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার লইল; এবং চর্চ্চের মধ্যে উৎপীড়ন দ্বারা অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি যে সকল অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল, সেগুলির উচ্ছেদ সাধনের সংকল্প করিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ্ একটি অনুসন্ধান-সমিতি বা সংস্কার-সমিতি গঠন করিল। প্রত্যেক বিভিন্ন জাতি হইতে সংসদে যে সমস্ত প্রতিনিধি আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইল। যাজক-তন্ত্রের মধ্যে কি কি অনাচার ও কলঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে, এবং কিরূপে সেগুলির প্রতীকার হয়, এই সমস্ত নির্দ্ধারণ করিয়া সংসদের নিকট বিজ্ঞাপন করা, সংস্কার-সমিতির উপর এই কর্ত্তব্যের ভার দেওয়া হইল। সংসদ্ শেষে সংস্কার-সমিতির মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবেন। কিন্তু সংসদ্ যখন এই কার্য্যে নিযুক্ত, তখন প্রশ্ন উঠিল যে, যাজকতন্ত্রের অধিনায়ক পোপের অনুপস্থিতিতে, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে অনাচার প্রতিকারকার্য্যে সংসদের অধিকার আছে কি? রোমীয় দলের প্রভাবে এবং কতকগুলি সরলমনা সঙ্কোচভীরু লোকের সাহায্যে সাব্যস্ত হইল যে, অধিকার নাই। সংসদ্ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম মার্টিন নামে একজন নূতন পোপ নির্ব্বাচন করিল। এই পোপকে বলা হইল, তিনি যেন তাঁহার পক্ষ হইতে যাজকতন্ত্র সংস্কারের একটা খসড়া প্রদান করেন। এই খসড়া মঞ্জুর হইল না এবং সংসদ্ ভাঙ্গিয়া গেল। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে বাসেল নগরে ঐ একই উদ্দেশ্যে এক নূতন সংসদের অধি-বেশন হইল। এ সংসদ্ পূর্ব্ববর্ত্তী কন্স্টান্স্-সংসদের কার্য্য সম্পূর্ণ

করিতে প্রয়াসী হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। খৃষ্টীয় জগতের মধ্যে তখন যে বিচ্ছেদ, সংসদের মধ্যেও সেই বিচ্ছেদ দেখা দিল। পোপ বাসেলের সংসদ্ ফেরারায় স্থানান্তরিত করিলেন, এবং পরে সেখান হইতে ফ্লোরেন্সে লইয়া গেলেন। কতকগুলি বিশপ্ পোপের আদেশ মানিতে অস্বীকার করিয়া বাসেল্-নগরীতেই রহিয়া গেলেন ; এবং পূর্ব্বে যেমন দুই সংসদ্ ছিল, এখন সেইরূপ দুই সংসদ্ হইল। বাসেলের সংসদ্ সংস্কারপ্রস্তাব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল এবং পঞ্চম ফেলিক্স নামে এক নূতন পোপ নির্ব্বাচন করিল। কিয়ৎকাল পরে এ সংসদ্ লোসানে (Lausanne) উঠিয়া গেল ; এবং ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে তাহার ব্যর্থ জীবনলীলা সম্বরণ করিল।

এইরূপে পোপেরই জয় হইল। সংসদ্ যে ভার লইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করিতে পারিল না ; কিন্তু সে এমন কতকগুলি কাজ করিয়া গেল, যাহার ভার সে লয় নাই ; এবং সেই সব কার্য্যের ফল ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত টিকিয়া রহিল। যে সময়ে বাসেল্-সংসদের সংস্কার-চেষ্টা ব্যর্থ হইল, সেই সময়ে ইউরোপের রাজবৃন্দ সংসদ্প্রচারিত নীতি ও প্রতিষ্ঠান আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল। ফ্রান্সে বাসেল্-সংসদের সিদ্ধান্ত অনুসারে পঞ্চম চার্লস্ ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রাগ্মেটিক স্যাঙ্ক্শন্ নামে এক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন ; ইহাতে বিশপ্-নির্ব্বাচনপ্রণালী, পোপের প্রাপ্য "প্রথম ফল"-নামক করের বিলোপ-সাধন এবং যাজকতন্ত্রের প্রধান প্রধান অনাচারের সংস্কার বিঘোষিত হইল। ফ্রান্সে প্রাগ্মেটিক স্যাঙ্কশন্ রাষ্ট্রবিধিরূপে বিজ্ঞাপিত হইল। জার্ম্মানীতে ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে মায়েন্ৎসের ডীট্ বা ব্যবস্থাপকসভা এই বিধি গ্রহণ করিয়া ইহাকে জার্ম্মান সাম্রাজ্যের বিধিরূপে বিঘোষিত করিল। যাজকতন্ত্র যে চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, রাষ্ট্রতন্ত্র তাহা সাধন করিতে সমর্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সংস্কার প্রস্তাবের পথে আরও নূতন নূতন বাধা উত্থিত হইল। সংসদের চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল, প্রাগ্‌মেটিক স্যাঙ্কশন্‌ও সেইরূপ ব্যর্থ হইল। জার্ম্মানীতে ইহা অতি অকস্মাৎ বিনষ্ট হইল। ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে ডীট্‌ বা রাষ্ট্রসভা পোপ পঞ্চম নিকোলাসের সহিত বন্দোবস্তের ফলে ইহা পরিত্যাগ করিল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ফ্রান্সিস্ ইহা বর্জ্জন করিয়া পোপ দশম লিওর সহিত এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। রাজবর্গের সংস্কারচেষ্টা, যাজকবর্গের সংস্কারচেষ্টার মতই ব্যর্থ হইল। কিন্তু মনে করিবেন না যে, এ চেষ্টার কোন ফলই হয় নাই। সংসদ্‌প্রবর্ত্তিত চেষ্টার ন্যায় রাজশক্তিপ্রবর্ত্তিত সংস্কারোদ্যমেরও কতকগুলি স্থায়ী ফল রহিয়া গেল, পরবর্ত্তী কালের ইতিহাসে তাহার বিস্তর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বাসেল-সংসদ্‌প্রবর্ত্তিত মূল নীতিগুলির অসামান্য প্রভাব ও উৎপাদিকা শক্তি ছিল। অনেক শক্তিমান্ উদ্যমশীল কর্ম্মী পুরুষ এই সকল নীতি গ্রহণ ও সমর্থন করিয়াছেন। পারী নগরীর জন্ দাইয়ী (D'Ailly) জের্সোঁ (Gerson) এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর আরও অনেক বিখ্যাত লোক এই সকল নীতি সমর্থনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বৃথাই বাসেল্-সংসদ্ ভাঙ্গিয়া গেল, বৃথাই প্রাগ্‌মেটিক স্যাঙ্কশন্ পরিত্যক্ত হইল; চর্চ্চশাসন সম্পর্কে ইহাদের মূলনীতি সমুদায় এবং সংস্কার সম্বন্ধে ইহাদের মতামত ফ্রান্সে বদ্ধমূল হইয়া গেল, স্থায়িত্বলাভ করিল, রাষ্ট্রসভায় প্রবেশ লাভ করিল এবং প্রবল লোকমতে পরিণত হইল। এই প্রভাবের ফলে প্রথম জান্‌সেনিষ্ট পরে গালিকান্-দলের উদ্ভব হইল। কন্স্‌টান্সের সংসদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া বস্যুয়ের প্রস্তাবচতুষ্টয় পর্য্যন্ত চর্চ্চসংস্কারের যত কিছু চিন্তাচেষ্টা-পরম্পরা, সকলেরই এক মূল হইতে উদ্ভব, এক পরিণামের দিকে গতি, একই ব্যাপারের নানা রূপান্তর। পঞ্চদশ শতাব্দীর

বৈধসংস্কারচেষ্টা ব্যর্থ হইল ত কি হইল? ব্যর্থতা সত্ত্বেও সে চেষ্টা সভ্যতার ইতিহাসের ধারায় তাহার স্থায়ী স্থান অধিকার করিয়াছে, অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

সংসদ্‌সমূহ যে বৈধ উপায়ে সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা ঠিকই করিয়াছিল; কারণ, তদ্ভিন্ন তখন বিপ্লব নিবারণের অন্য কোন উপায় ছিল না। যে সময়ে পিসা-সংসদ্ দুই পোপের দ্বন্দ্ব নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং কন্স্‌টান্সের সংসদ্ যাজকতন্ত্র-সংস্কারে নিযুক্ত হইয়াছিল, প্রায় সেই সময়েই বোহীমিয়াতে জনসাধারণের মধ্যে এক প্রবল ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা ভীষণ বিদ্রোহের আকারে দেখা দিল। জন্ হুসের ভবিষ্যদ্‌বাণী ও বিজয়যাত্রা ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়, ঐ সময়ে তিনি প্রেগ্‌নগরীতে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এখন দেখুন, দুইটি সংস্কারের ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইল; একটি চর্চ্চের অন্তঃস্থলে যাজকপ্রধানদিগের প্রবর্ত্তিত—এ চেষ্টার মধ্যে বিচক্ষণতা ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না; অন্য ধারা চর্চ্চের বাহিরে এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রবাহিত, এ চেষ্টার মধ্যে একটা রুদ্র উদ্দীপনা ও উন্মাদনা ছিল। এই দুই সংস্কার-ধারার মধ্যে একটা বিরোধ উপস্থিত হইল। সংসদ্ জন্ হুস্ ও প্রেগবাসী জেরোমকে কন্স্‌টান্সে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে, বিদ্রোহী ও বিধর্ম্মি-রূপে দণ্ডিত করিল। এ ব্যাপার বুঝিতে আমাদের এখন কোন কষ্ট হয় না। এককালে দুই স্বতন্ত্র সংস্কারধারার অবস্থিতি; একদিকে শাসনতন্ত্র-প্রবর্ত্তিত চেষ্টা, অন্য দিকে জনসাধারণ-প্রবর্ত্তিত চেষ্টা; উভয় চেষ্টার মূল কারণ এক, চরম পরিণতি এক, অথচ পরস্পরের মধ্যে প্রতিকূলতা ও সংগ্রাম—এ ব্যাপার আমরা এখন বেশ বুঝিতে পারি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহাই ঘটিয়াছিল। জন্ হুসের লৌকিক সংস্কারচেষ্টা ক্ষণ-কালের জন্য প্রদমিত হইল; তাঁহার শিষ্যগণ হুসের মৃত্যুর তিন বৎসর

পরে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এ যুদ্ধ দীর্ঘকাল প্রবলবেগে চলিয়াছিল, কিন্তু সম্রাট্ই শেষে জয়ী হইলেন। কিন্তু সংসদের সংস্কারচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় লোকচিত্তের আন্দোলন প্রশমিত হইল না। তখন কেবল সুযোগের অপেক্ষা রহিল এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেই সুযোগ পাইবামাত্র এই অসন্তোষাগ্নি ব্যাপকভাবে পুনঃ প্রজ্জলিত হইল। যদি সংসদ্-প্রবর্ত্তিত সংস্কার প্রয়াস কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে ষোড়শ শতাব্দীর রিফর্মেশন্ বা ধর্ম্মসংস্কার নিবারিত হইতে পারিত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি চেষ্টা নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিত—কারণ, উভয় চেষ্টার একত্র অভ্যুত্থান হইতেই বুঝা যায় যে, সংস্কারের তখন একান্ত আবশ্যক ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ধর্ম্মসম্পর্কে ইউরোপের অবস্থা তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইল—উচ্চশ্রেণী সংস্কারের জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিলেন এবং জনসাধারণের সংস্কারচেষ্টা প্রারম্ভেই বলপূর্ব্বক প্রদমিত হইল বটে, কিন্তু পুনরুত্থানের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল। কিন্তু এ সময়ে মানবচিত্তের এই চাঞ্চল্য শুদ্ধমাত্র ধর্ম্মের ক্ষেত্রে দেখা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আপনারা জানেন, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমের সভ্যতা ইউরোপে পুনঃ প্রতিষ্ঠালাভ করে। আপনারা জানেন, দান্তে, পেত্রার্কা, বোকাচিও এবং তাঁহাদিগের সমসাময়িকগণ কিরূপ আগ্রহের সহিত গ্রীক্ ও লাটিন পুথি সন্ধান, প্রকাশ এবং প্রচার করিতে লাগিয়াছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে সামান্য একটা আবিষ্কারেই তখন কি উল্লাসধ্বনি উত্থিত হইত।

এই উত্তেজনার সময়ে ইউরোপে প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমের শিক্ষা-দীক্ষা অবলম্বন করিয়া এক পণ্ডিতমণ্ডলীর উদ্ভব হইল; মানবচিত্তের বিকাশে তাঁহারা কি পরিমাণে যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার মূল্য

এখনও সম্যক্ স্বীকৃত হয় নাই। এই ক্লাসিকাল-পণ্ডিতমণ্ডলী শুদ্ধ যে সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন, হোমর-ভার্জ্জিল আদির গ্রন্থ লইয়াই যে তাঁহারা উন্মত্ত থাকিতেন, তাহা নহে; শিক্ষাদীক্ষা, আচার ব্যবহার, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, জ্ঞানবিজ্ঞান সমেত সমগ্র প্রাচীন সমাজ তাঁহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রীস্ ও রোম রাষ্ট্রনীতিতে, দর্শনে ও সাহিত্যে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং প্রাচীন জগতের এই প্রভাবাতিশয্যে বিস্ময়ের কিছুই নাই। উন্নতচিত্ত, মার্জ্জিতবুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শী লোক যে স্বকীয় যুগের গ্রাম্য আচার ব্যবহার, অসংলগ্ন চিন্তা ও বর্ব্বরোচিত রীতিনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া এমন একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সমুন্নত সমাজের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিবে, এমন কি, অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? এইরূপে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একদল স্বাধীন চিন্তাশীল লোকের মণ্ডলী গ্রথিত হইল—এ মণ্ডলীতে অনেক বিশপ্, অনেক ব্যবহারবিদ্, অনেক পণ্ডিত একত্র সম্মিলিত হইল।

এই উন্মাদনার মধ্যে তুর্কীকর্ত্তৃক কন্সটাণ্টিনোপল্ অধিকার এবং প্রাচ্য রোমকসাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিল; সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিরাশ্রয় গ্রীক ইটালীতে পলায়ন করিল। এই গ্রীক আগন্তুকগণ প্রত্নবিদ্যায় সমুন্নত ছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে অনেক পুঁথি ছিল এবং প্রাচীন সভ্যতার আলোচনার পক্ষে সহস্র নূতন উপায় ও উপকরণ তাঁহাদের আয়ত্ত ছিল। ক্লাসিকাল-পণ্ডিতমণ্ডলী কি দ্বিগুণ শ্রদ্ধা ও উদ্যমে অনুপ্রাণিত হইলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সময়ে যাজকপ্রধান-গণ, বিশেষতঃ ইটালীতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না হউক, ঐশ্বর্য্যবিলাসে চরম পরিণতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গর্ব্বের সহিত অলস লালসাময়

কলাকুশল সভ্যতার বিচিত্র সম্ভোগে গা ঢালিয়া দিলেন; তাঁহারা সাহিত্য ও কলাবিদ্যার চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, সামাজিক আমোদ-প্রমোদে ও দৈহিক সুখসম্ভোগে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কার্ডি-নাল বেম্বোর ন্যায় যে সকল লোক এই সময়ে রাষ্ট্রনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল দেখুন; একদিকে মানসিক উৎকর্ষ, অন্য দিকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, একদিকে রমণী-সুলভ আচার ব্যবহার, অন্য দিকে চিন্তারাজ্যে অসমসাহসিকতা—এ অপূর্ব্ব মিশ্রণ দেখিয়া আপনারা বিস্মিত হইবেন। এ যুগের মানসিক উৎকর্ষ ও নৈতিক অপকর্ষ দেখিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের কথা মনে উদিত হয়। মানসিক উত্তেজনার দিকে, নূতন নূতন চিন্তার দিকে, সহজ সুখকর জীবনযাত্রার দিকে সেই প্রবল আসক্তি; সেই রমণীসুলভ কোমলতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা; রাষ্ট্রীয় উদ্যম ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সেই একান্ত অসদ্ভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্তির অদ্ভুত সজীবতা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণের সহিত উচ্চশ্রেণীর অভিজাত-সম্প্রদায়ের যে সম্পর্ক, পঞ্চদশ শতাব্দীতে সাহিত্যিকদিগের সহিত যাজক-প্রধানদিগের সেইরূপ সম্পর্ক ছিল। সকলের একই মতামত, একই আচার ব্যবহার, তাহারা একত্রে বেশ মিলিয়া মিশিয়া জীবনযাপন করিত, বহির্জ্জগতে যে সমস্ত বিপ্লব ও আন্দোলন প্রস্তুত হইতেছে, সে দিকে তাহারা দৃক্‌পাতও করে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজসভাসদ্‌-গণ যেরূপ ফরাসীবিপ্লবের কোন পূর্ব্বসূচনাই লক্ষ্য করে নাই, কার্ডিনাল বেম্বোপ্রমুখ পঞ্চদশ শতাব্দীর যাজকপ্রধানগণ সেইরূপ লুথার ও কাল্‌ভিনের অভ্যুত্থানের কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। উভয়ের অবস্থা একইরূপ।

তাহা হইলে দেখা গেল, নৈতিক জগতে এ যুগের ইতিহাসে তিনটি

বৃহৎ ঘটনা—প্রথম, চর্চ্চপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা ; দ্বিতীয়, জনসাধারণ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসংস্কারোদ্যম ; এবং সর্ব্বশেষে চিন্তারাজ্য সংস্কার, যাহার ফলে এক স্বাধীন চিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতমণ্ডলীর অভ্যুত্থান। এই সমস্ত পরিবর্ত্তন সম্পন্ন হইতেছিল রাষ্ট্রীয় জগতের এক মহাবিপ্লবের মধ্যে, যখন চারিদিকের খণ্ডসমাজ ভাঙ্গিয়া জাতীয় সমাজ ও জাতীয় শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিতেছে।

ইহাই সব নহে। এই যুগে মানুষের বাহ্যকর্ম্মবৃত্তিও অসাধারণ সজীবতা প্রদর্শন করিয়াছিল। এ যুগ সমুদ্রযাত্রার যুগ, অসমসাহসিকতার যুগ, সর্ব্ববিধ আবিষ্কার উদ্ভাবনের যুগ। এই যুগেই পর্ত্তুগীজগণ আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া ভাস্কোডিগামার নেতৃত্বে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিয়াছিল, কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিল, এবং ইউরোপের বাণিজ্য অসামান্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সহস্র নূতন আবিষ্কার আসিয়া জুটিল ; যে সমস্ত আবিষ্কার পূর্ব্বে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল, সেগুলিও প্রসার লাভ করিল। বারুদের আবিষ্কার হইয়া রণপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইল ; কম্পাশের আবিষ্কার হইয়া নৌচালন-পদ্ধতি বদলাইয়া গেল। তৈলচিত্রশিল্পের বিকাশ হইয়া সমস্ত ইউরোপ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিত্রে ছাইয়া গেল ; তামার ব্লক খোদাই হইয়া এই সমস্ত চিত্রের বহুল প্রচার হইতে লাগিল। আধুনিক ধরণের কাগজের বহুল প্রসার হইল ; এবং ১৪৩৬ হইতে ১৪৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হইল,—এ মুদ্রাযন্ত্রের কত নিন্দা প্রশংসা বাহির হইয়াছে, কিন্তু ইহার গুণ ও ইহার প্রভাব সহস্র বক্তৃতাতেও নিঃশেষ-রূপে বর্ণনা করা যায় না।

এখন দেখিলেন, এ শতাব্দীর মহত্ত্ব ও কার্য্যকলাপ কিরূপ—ইহার মহত্ত্বের অসম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে মাত্র, ইহার কার্য্যকলাপের সম্পূর্ণ

পরিণতি এ যুগের মধ্যে ঘটে নাই। আকস্মিক সংস্কারচেষ্টা যেন ব্যর্থ হইয়া গেল, শাসনতন্ত্রগুলি শক্তিমান্ হইয়া উঠিল, জাতীয় জীবন যেন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। মনে হয়, সমাজ যেন আর এক উচ্চতর অবস্থার জন্য, দ্রুততর উন্নতির জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু সে সমস্ত মহাবিপ্লব ষোড়শ শতাব্দীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দী পথ প্রস্তুত করিল মাত্র।

দ্বাদশ অধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহের আলোচনায় আমরা অনেক সময় ইউরোপীয় সমাজের বিশৃঙ্খলা ও অসংলগ্নতা লইয়া অভিযোগ করিয়াছি; এরূপ অসংলগ্ন, খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত সমাজ বোধগম্যরূপে বর্ণনা করা যে কত কঠিন, তাহা দেখিয়াছি; কোন্ যুগে এই বিশৃঙ্খলা অতিক্রম করিয়া আমরা একটা ব্যাপক সার্ব্বজনীন ঐক্যবদ্ধ সমাজের দেখা পাইব, তাহারই জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এখন আমরা সেই সার্ব্বজনীন ঐক্যের যুগে উপনীত হইয়াছি; এ যুগ ব্যাপক তথ্যের ও সার্ব্বজনীন চিন্তার যুগ, শৃঙ্খলা ও ঐক্যের যুগ। এখানে কিন্তু আমাদের সমক্ষে আর এক প্রকার সমস্যা। সামাজিক ইতিহাসের খণ্ড তথ্য ও খণ্ড ব্যাপারগুলির মধ্যে যোগসূত্র কোথায়, কিরূপে তাহারা পরস্পরের সহকারিতা করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোন সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করা যায় কি না, এক কথায় এই সকল বিক্ষিপ্ত ব্যাপারের সাহায্যে সমাজের কোন একটা সমগ্র মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা যায় কি না—এই চেষ্টাতেই এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে বহু ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। এখন আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে সমস্তই বিপরীত; সামাজিক জীবনের সমস্ত উপাদান ও ঘটনা এখন রূপান্তরিত হইয়া পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে; মানুষে মানুষে এখন নানারূপ বিচিত্র ও জটিল সম্বন্ধ। মানুষের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের সম্পার্ক, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক, মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধির ক্ষেত্র—সর্ব্বত্রই এই জটিলতা। পূর্ব্বে যে সমস্ত যুগের আলোচনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে অনেকগুলি ব্যাপার স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌ভাবে পরস্পর সম্পর্ক-রহিত হইয়া ঘটিয়া গিয়াছে। এখন আমরা আর সেই

পরস্পরবিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যের দেখা পাইব না। এখন হইতে সমস্ত ব্যাপারই পরস্পরকে স্পর্শ করিতেছে, পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, পরস্পরকে রূপান্তরিত করিতেছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যথার্থ ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করা, এরূপ একটা ব্যাপক ও জটিল ঘটনাস্রোতের গতিপরিণতি নির্দ্দেশ করা, পরস্পরসম্বদ্ধ এই অসংখ্য বিচিত্র উপাদানের যথাযথ হিসাব লওয়া—ইহা অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার আর কি হইতে পারে? কারণ, আমাদিগকে এমন একটা মুখ্য ব্যাপার আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহা একটি বৃহৎ যুগের সুদীর্ঘ ঘটনাবলীর সমষ্টিস্বরূপ, যাহা যুগের বিশিষ্ট প্রকৃতির পরিচয় দেয় ও সভ্যতার ইতিহাসে ইহার যথার্থ প্রভাব ও কার্য্যকারিতা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এখন আমরা যে বৃহৎ ঘটনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তাহাতেই এই দুরূহত্বের পরিচয় পাইবেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে আমরা এমন একটি ঘটনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, যাহা প্রকৃতপক্ষে না হউক, মূলতঃ ধর্ম্মসম্পৃক্ত। আমি ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধের কথা বলিতেছি। ব্যাপারটি যদিও বৃহৎ, দীর্ঘকালব্যাপী ও বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ, তথাপি ইহার সাধারণ প্রকৃতি আবিষ্কার করিতে এবং ইহার ঐক্যসূত্র ও প্রভাব নির্দ্দেশ করিতে আমাদিগকে অনেক ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। এখন আমাদিগকে ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্ম-বিপ্লবের আলোচনা করিতে হইবে। সচরাচর ইহা রিফর্মেশন নামে অভিহিত হয়। রিফর্মেশন শব্দের অর্থ ধর্ম্মসংস্কার; কিন্তু আমি এ স্থলে ধর্ম্মবিপ্লব অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করিব; এ বিপ্লব ভাল, কি মন্দ, সে বিষয়ে কোনরূপ ব্যঞ্জনা এ শব্দের মধ্যে থাকিবে না। এখন আরম্ভেই দেখুন, এই সঙ্কট ব্যাপারের যথার্থ স্বরূপ চিনিয়া লওয়া ও সাধারণভাবে ভাষায় প্রকাশ করা কত কঠিন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তই

রিফর্মেশনের জীবনকাল ; এই সময়ের মধ্যেই ইহার উদ্ভব ও অবসান। বলিতে গেলে, সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনারই জীবনকাল সীমাবদ্ধ। তাহাদের প্রভাব অনন্তকালব্যাপী ; সমস্ত অতীত ও সমস্ত ভবিষ্যতের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; তথাপি ইহা সত্য যে, তাহাদের একটা স্থান-কালবিশিষ্ট সত্তা আছে ; তাহাদের উদ্ভব, বৃদ্ধি ও বিকাশ এক বিশেষ যুগের মধ্যেই সমাপ্ত হয়, এবং তাহার পর হইতে তাহারা ক্রমশঃ অবলুপ্ত হইয়া ইতিহাসের ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করে ও অন্য কোন নূতন ঘটনার জন্য পথ মুক্ত করিয়া দেয়।

রিফর্মেশনের জন্মকাল সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করিবার কোন সার্থকতা নাই ; তবে ১৫২০ খৃষ্টাব্দে যখন লুথার, পোপ দশম লিওর আদেশপত্র প্রকাশ্যভাবে অগ্নিসাৎ করিয়া, নিজকে রোমক চর্চ্চ হইতে রীতিমতভাবে বিচ্ছিন্ন করিলেন, সেই সময়কেই স্থূলভাবে রিফর্মেশনের জন্মকাল ধরিয়া লইতে পারি। এই সময় হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন ওয়েষ্টফালিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, তখন পর্য্যন্ত রিফর্মেশনের জীবনকাল। এই ধর্ম্মবিপ্লবের সর্ব্বপ্রথম ও বৃহত্তম ফল হইল ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট হিসাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ; উভয় দলের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই সংঘর্ষ স্থায়ী হইয়াছিল। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টফালিয়ার সন্ধি দ্বারাই অবশেষে উভয় পক্ষ পরস্পরের অধিকার স্বীকার করিয়া লইল ; তখন হইতে তাহারা ধর্ম্মভেদ সত্ত্বেও অবিরোধে পরস্পর সাহচর্য্যে অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইল। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে রাষ্ট্রীয় শ্রেণী-বিভাগ, পররাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মৈত্রীবন্ধন, এ সমস্ত ব্যাপারের সহিত ধর্ম্মভেদের কোন সম্পর্ক রহিল না। এ সময় পর্য্যন্ত নানা ব্যতিক্রম

সত্ত্বেও ইউরোপ যথার্থই দুই দলে বিভক্ত ছিল—প্রোটেষ্টাণ্ট দল ও ক্যাথলিক দল। ওয়েষ্টফালিয়ার সন্ধির পর এই প্রভেদ ঘুচিয়া গেল; এখন হইতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধ বা মৈত্রী অন্য বিষয় লইয়া ঘটিতে লাগিল, ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া নহে। এই সময়েই তাহা হইলে রিফর্মেশনের জীবনলীলা শেষ হইল, যদিও ইহার প্রভাব ও পরিণাম ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকিল। এখন সংক্ষেপে একবার এই জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক; এবং কেবলমাত্র ঘটনাবলী ও প্রধান প্রধান পাত্রের নামোল্লেখ মাত্র করিয়া, ইহার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারসমূহ নির্দ্দেশ করা যাউক। এই সামান্য নির্দ্দেশ, এই শুষ্ক অসম্পূর্ণ নামতালিকা হইতেই বুঝিতে পারিবেন, এত বিচিত্র ও জটিল ঘটনাবলীর সমগ্র বিবরণ দেওয়া এবং এই বিচিত্র তথ্যের মধ্য হইতে রিফর্মেশনের যথার্থ প্রকৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে ইহার যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করা কত দুরূহ ব্যাপার। যে সময়ে রিফর্মেশন ঝড়ের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন ইউরোপে একটা বৃহৎ রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ চলিতেছে; তখন ফ্রান্সের প্রথম ফ্রান্সিসের সহিত স্পেনের পঞ্চম চার্লসের সংগ্রাম। এ সংগ্রামের প্রথম লক্ষ্য ইটালী অধিকার, পরে জার্ম্মান সাম্রাজ্য অধিকার ও সর্ব্বশেষে ইউরোপে প্রাধান্য স্থাপন। এই সময়েই অষ্ট্রীয়ার রাজবংশ শির উন্নত করিয়া ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করিল। এই সময়েই আবার ইংলণ্ড অষ্টম হেনরীর রাজত্বে ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যাপারে নিয়মিতরূপে, স্থায়িভাবে ও ব্যাপকতররূপে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল।

এখন ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস অনুসরণ করা যাউক। ফ্রান্সের ইতিহাস তখন প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক দলের ধর্ম্মসংগ্রামে পূর্ণ। এই ধর্ম্মসংগ্রাম অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ভূস্বামিগণ তাঁহাদের লুপ্তশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য এক নূতন চেষ্টা করিলেন। ফ্রান্সের ধর্ম্মসংগ্রাম,

ক্যাথলিক লীগ গঠন, ভালোয়া-বংশের সহিত গাইস্-বংশের সংঘর্ষ, এ সমস্ত ব্যাপারের ইহাই তাৎপর্য্য।

স্পেনে দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালে হলাণ্ডের যুক্তপ্রদেশ বিদ্রোহ-ধ্বজা তুলিল। একদিকে ইন্‌কুইজিশন নামক যাজকতন্ত্র-পরিচালিত ধর্ম্মাধিকরণ, অপর দিকে রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা, এই উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। এক পক্ষের নেতা ডিউক অব্ আল্‌ভা, অপর পক্ষের নেতা প্রিন্স্ অব্ অরেঞ্জ। একদিকে যেমন অধ্যবসায় ও সুবুদ্ধির প্রভাবে স্বাধীনতার পক্ষই জয়ী হইল, অপর দিকে স্পেনের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার লোপ হইল, সেখানে রাষ্ট্রতন্ত্রে ও ধর্ম্মতন্ত্রে অপ্রতিহত রাজশক্তিরই প্রাধান্য ঘটিল।

ইংলণ্ডে এই সময়ে মেরী ও এলিজাবেথের রাজত্ব। এলিজাবেথ ছিলেন প্রোটেষ্টাণ্টদলের নেত্রী, স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাহার পর জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্টের ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজশক্তির সহিত জনশক্তির বিবাদের সূচনা।

এই সময়েই ইউরোপের উত্তরভাগে নূতন নূতন রাজশক্তির উদ্ভব হইল। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে গাষ্টেভাস্ ভাসা (Gustavas Vasa) কর্ত্তৃক সুইডেনের রাষ্ট্রীয় সত্তা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। টিউটনিক ধর্ম্মসঙ্ঘকে রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘে পরিণত করিয়া প্রশিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। এখন হইতে উত্তর ইউরোপের রাজবৃন্দ ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যাপারে এমন একটা স্থান অধিকার করিল, যাহা তাহারা পূর্ব্বে কখনও করে নাই ; ইহার গুরুত্ব শীঘ্রই ত্রিংশ বৎসরব্যাপী ধর্ম্মযুদ্ধের ইতিহাসে উপলব্ধি করা যাইবে।

এখন আবার ফ্রান্সে ফিরিয়া আসুন। সেখানে ত্রয়োদশ লুইর রাজত্ব ; কার্ডিনাল রিশেলিয় (Richelieu) ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ

শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিলেন ও জার্ম্মানীর সহিত রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রোটেষ্টাণ্টদলকে সাহায্যদান করিলেন। জার্ম্মানীতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তুর্কীদিগের সহিত সংগ্রাম; এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ত্রিংশবার্ষিক ধর্ম্মযুদ্ধ—প্রাচ্য ইউরোপের আধুনিক ইতিহাসে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘটনা। এই সময়েই গষ্টেবস্ আডোলফস্, বালেন্‌ষ্টাইন্, টিলী, ডিউক অব্ ব্রুন্সবিক্, ডিউক অব বাইমার প্রভৃতি বড় বড় লোকের অভ্যুত্থান, জার্ম্মানীর ইতিহাসে ইঁহাদের অপেক্ষা বড় নাম আর কাহারও নাই।

এই সময়েই ফ্রান্সে চতুর্দ্দশ লুই সিংহাসন আরোহণ করিলেন, এবং মন্ত্রী মাজার্যাার সহিত ফ্রঁদ্-দলের বিরোধ আরম্ভ হইল। ইংলণ্ডে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল, এবং প্রথম চার্ল্‌স্ সিংহাসনচ্যুত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

আমি কেবল সর্ব্বজনপরিচিত বৃহৎ বৃহৎ ঘটনারই উল্লেখ করিলাম; এখন দেখুন, এই সকল ঘটনার সংখ্যাধিক্য, বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব কিরূপ। যদি অন্য প্রকারের ঘটনার সন্ধান করেন, যে সকল ঘটনা এত সুপ্রকট নহে, যে সকল ঘটনাসমষ্টি বিশেষ কোন আখ্যায় অভিহিত করা যায় না—তাহা হইলে সেরূপ ঘটনারও অভাব নাই। কারণ, এ সময়ে প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়;—একদিকে অধিকাংশ বড় বড় রাষ্ট্রে তখন বিশুদ্ধ রাজতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব, অন্য দিকে হলাণ্ডে তখন ইউরোপের প্রবলতম গণতন্ত্রের উদ্ভব এবং ইংলণ্ডে বিধিবদ্ধ রাজতন্ত্রের একরূপ পাকাপাকি প্রতিষ্ঠা। যাজকতন্ত্রের মধ্যে এই সময়ে প্রাচীন মঠধারী সম্প্রদায়গুলির রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হইল, এবং তাহাদের স্থলে জেসুইট্ সম্প্রদায় নামে এক নূতন ধরণের ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিপত্তি লাভ করিল। কন্স্‌টান্স ও বাসেলের ধর্ম্ম-

সংসদের যেটুকু প্রভাব অবশিষ্ট ছিল, এই যুগে ট্রেণ্টের ধর্ম্মসংসদ্ কর্ত্তৃক তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল এবং যাজকতন্ত্রের মধ্যে রোমের পোপ-সভার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যাজকতন্ত্র ছাড়িয়া দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করুন, মানবচিত্তের স্বাধীন গতি লক্ষ্য করুন; সেখানে দেখিবেন, দুই মনীষীর আবির্ভাব,—বেকন ও দেকার্ত্; ইহাঁরা চিন্তা-জগতে যে বিপ্লব আনয়ন করিলেন, আধুনিক ইতিহাসে এত বড় বিপ্লব আর কখনও হয় নাই। যে দুই চিন্তাধারা আধুনিক জগতে আধিপত্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিয়াছে, ইহাঁরা সেই দুই ধারার প্রবর্ত্তক। এই সময়েই আবার ইটালীয় সাহিত্যের গৌরবযুগ এবং ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের প্রবর্ত্তনযুগ। অবশেষে এই যুগেই বড় বড় উপনিবেশসমূহের প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক বাণিজ্যপদ্ধতির বিকাশ। অতএব যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, এ যুগের রাষ্ট্র-নৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ঘটনাবলী পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন যুগের ঘটনাসমূহ অপেক্ষা সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে ও গুরুত্বে অধিক। মানবচিত্তের ক্রিয়াশক্তি এই সময়ে নানা দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ, ব্যক্তির সহিত শাসনী শক্তির সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, এবং বিশুদ্ধ চিত্তপ্রয়াস, সর্ব্বত্রই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক কথায় এ যুগ বড় বড় লোক ও বড় বড় ঘটনার যুগ। এবং আমরা যে ধর্ম্মবিপ্লবের আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তাহা এই ঘটনাবহুল যুগের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এই ঘটনাই এ যুগের যথার্থ পরিচায়ক এবং এই জন্য ইহা রিফর্মেশন যুগ নামেই অভিহিত। যে সমস্ত প্রবল কারণসমষ্টিদ্বারা এ যুগের ইতিহাস গঠিত, তন্মধ্যে রিফর্মেশনই প্রবলতম, রিফর্মেশনেই অন্যান্য কারণের কেন্দ্রসমাবর্ত্তন, সমস্ত ব্যাপারই রিফর্মেশনের প্রভাবে রূপান্তরিত

হইয়াছে, অথবা রিফর্মেশনের উপর নিজ নিজ প্রভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে এমন একটি মহাব্যাপারেব প্রকৃতিনির্দ্দেশ ও সমগ্র বর্ণনা করিতে হইবে, যাহা একটি বৃহৎঘটনাপূর্ণ মহাযুগের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা।

এরূপ বিচিত্র, বিরাট্, ঘনসম্বদ্ধ ঘটনাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিক ঐক্য-সূত্র আবিষ্কার করা যে কত কঠিন, তাহা আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। অথচ ইহা আবশ্যক। ঘটনাসমূহ যখন সম্পূর্ণ হইয়া ইতিহাসে পরিণত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে বৃহত্তম, ব্যাপকতম ব্যাপারগুলিই আমরা জানিতে চাহি, সেইগুলিকেই আমরা মূল্যবান্ মনে করি। আমরা খণ্ড ঘটনা ও খণ্ড তথ্যের মধ্যে কার্য্যকারণসম্পর্ক দেখিতে চাই। এই সমস্ত ব্যাপক সাধারণ তথ্যই ইতিহাসের অমর অংশ; অতীত ও বর্ত্তমান ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এইরূপ সাধারণ তথ্য অবলম্বন করিয়াই বুঝিতে হয়। বিশেষ তথ্য হইতে সাধারণ তথ্যে উপনীত হওয়া, বিচ্ছিন্ন তথ্যের মধ্যে সংযোগসূত্র আবিষ্কার করিয়া সেগুলিকে বুদ্ধিগম্য করিয়া তোলা, ইহাই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যাহাতে আমরা অসম্পূর্ণ ও অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দ্রুতগতি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত না হই, সে বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম দৃষ্টিপাতেই ঘটনাবিশেষের বা যুগবিশেষের প্রকৃতি ও পরিণাম সম্বন্ধে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতে যে আনন্দ আছে, তাহার প্রলোভন নিতান্ত সামান্য নহে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তাহার ইচ্ছাবৃত্তির ন্যায় সর্ব্বদাই কার্য্য করিবার জন্য উন্মুখ, সে বাধাবিঘ্ন সহ্য করিতে পারে না, অবাধগতিতে শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধান্তে আসিতে চায়; যে সমস্ত তথ্য তাহার সিদ্ধান্তের প্রতিকূল, সেগুলি সে ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া যায়; কিন্তু আমরা ভুলিয়া গেলেই ত তথ্য বিনষ্ট হয় না; একদিন

এই সমস্ত অনাদৃত তথ্য বিস্মৃতির গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগের ভ্রান্তি ঘোষণা করিবেই করিবে। এই বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায় আছে; সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত নিঃশেষে সমগ্র তথ্যের আলোচনা করা। ইচ্ছাশক্তির পক্ষে যেমন নৈতিক বিধিনিষেধ, মানুষের বিচারবুদ্ধির পক্ষে সেইরূপ তথ্য। আমাদের ইচ্ছাশক্তি যেমন নৈতিক বিধিনিষেধের শাসন মানিয়া চলিতে বাধ্য, আমাদের বিচারবুদ্ধি সেইরূপ তথ্যের ভার বহন করিতে বাধ্য। তথ্যসমূহের সম্যক্ পরিচয় লইয়া, তাহাদিগের ব্যাপ্তি ও গুরুত্বের যথাযথ পরিমাপ লইয়া, তবে আমাদের বিচারবুদ্ধি পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক সাধারণ সিদ্ধান্তের দিকে উড়িবার অধিকার পায়, তখনই সে ঊর্দ্ধ হইতে সমস্ত ব্যাপারের সমগ্রসম্পূর্ণ ধারণা করিতে সমর্থ হয়। আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত তথ্যের পরিচয় না লইয়া আমরা যদি তাড়াতাড়ি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যাই, তাহা হইলে ভ্রান্তি ও বিফলতার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। এ ঠিক অঙ্কের হিসাবের মত, এক স্থানে ভ্রম হইলে অনবরত ভ্রম হইতে ভ্রমান্তরে চলিয়া যাইতে হইবে। ইতিহাসের আলোচনায় প্রথম উদ্যমেই যদি আমরা সমস্ত তথ্যের দিকে মনোনিবেশ না করি, ত্বরিত সিদ্ধান্তের প্রলোভনে বিচার-প্রণালীর কঠোর পন্থা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে কত যে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

আমি একরূপ আমার বিরুদ্ধেই আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি। আমি আপনাদিগের সমক্ষে কেবলমাত্র কতকগুলি সাধারণ তথ্য ও সাধারণ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এই সমস্ত সাধারণ ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিশেষ তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আপনাদিগের সহিত বিচার ও আলোচনা করিবার অবকাশ পাই নাই।

সেই জন্যই এই জটিল তথ্যপূর্ণ বিরাট্ যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সময় আপনাদিগকে এইরূপে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি; কারণ, এ যুগের আলোচনায় ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা যত অধিক, সেরূপ আর কোন যুগের অলোচনায় নহে। এই কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিয়া, এখন আমি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী যুগসমূহের আলোচনা করিয়াছি, সেই প্রণালীতে রিফর্মেশন যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব, এ যুগের প্রধান ব্যাপার কোন্‌টি, ইহার সমগ্র প্রকৃতি কিরূপ; এক কথায়, ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে এ যুগের যথার্থ স্থান ও কৃতিত্ব কোথায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের কি অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা একবার স্মরণ করুন। আমরা দেখিয়াছি, সে যুগে ধর্ম্মসংস্কারের জন্য দুইটি বিরাট্ চেষ্টা হইয়াছিল—একদিকে সংসদসমূহকর্ত্তৃক বৈধ সংস্কার-চেষ্টা, অন্য দিকে বোহেমিয়াতে হুস্‌পন্থিগণ কর্ত্তৃক বিপ্লবমূলক সংস্কার-চেষ্টা। দুই চেষ্টাই একের পর এক অবরুদ্ধ ও নিষ্ফল হইয়া গেল। তথাপি আমরা দেখিয়াছি যে, এ উদ্যম একেবারে প্রতিষিদ্ধ হইবার নহে, কোন না কোন আকারে ইহার পুনরুদ্ভব অবশ্যম্ভাবী,—পঞ্চদশ শতাব্দী যাহা চেষ্টা করিয়াছে, ষোড়শ শতাব্দী তাহা সাধন করিবেই করিবে। আমি ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব না; সে সমস্ত বিশেষ ঘটনা সর্ব্বজনবিদিত বলিয়াই ধরিয়া লইব। মানবজাতির ভবিষ্য নিয়তি গঠনের পক্ষে ইহার সাধারণ প্রভাব কিরূপ, সেই দিকেই মনোনিবেশ করিব।

রিফর্মেশনের কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া ইহার বিপক্ষগণ কতকগুলি আকস্মিক দুর্ঘটনা হইতে ইহার উদ্ভব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা বলেন, পোপ-স্বাক্ষরিত ইন্‌ডল্‌জেন্স্

বা নিষ্কৃতিপত্র কেবলমাত্র ডমিনিকান-সম্প্রদায়ই বিক্রয় করিতে পারিতেন, সেই জন্য অগষ্টাইন-সম্প্রদায় ঈর্ষ্যান্বিত হন। মার্টিন লুথার ছিলেন একজন অগষ্টাইন, সুতরাং তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিপ্লবের প্রধান কারণ এই ঈর্ষ্যা। কেহ কেহ বলেন, রাজাদিগের দুরাকাঙ্ক্ষা, যাজকবর্গের সহিত তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং চর্চ্চের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করিবার জন্য অভিজাতবর্গের লোভ,—এই সমস্ত কারণ হইতেই রিফর্মেশনের উদ্ভব। এইরূপে তাঁহারা মানবচরিত্রের কুপ্রবৃত্তির দিক্ হইতে, মানুষের স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত লোভদ্বেষাদির সাহায্যে এই মহাবিপ্লবটি বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

অন্য দিকে রিফর্মেশনের স্বপক্ষ ও সমর্থকগণ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তখনকার কালে চর্চ্চের মধ্যে যে সমস্ত অন্যায় অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার সংস্কার আবশ্যক হইয়াছিল বলিয়াই রিফর্মেশনের উদ্ভব; তাঁহারা রিফর্মেশনের যে পরিচয় দেন, তাহাতে মনে হয়, ইহা শুদ্ধমাত্র ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের অন্যায় অনাচার নিরাকরণ, যেন ইহা কেবল চর্চ্চের বিশুদ্ধ আদিম স্বরূপ পুনর্গঠনের জন্য একটা সুচিন্তিত প্রয়াস। এই উভয়বিধ ব্যাখ্যার কোনটিই যথার্থ মনে হয় না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম অপেক্ষা অধিক সত্য আছে মানি, অন্ততঃ এ ব্যাখ্যাটি যে উচ্চতর এবং আলোচ্য ব্যাপারের বিরাটত্ব ও মর্য্যাদার পক্ষে অনুরূপ, তাহা মানিতেই হইবে; তথাপি আমার মনে হয়, ইহাও যথার্থ ব্যাখ্যা নহে। আমার মতে রিফর্মেশন ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা বা লোভদ্বেষাদি হইতে উদ্ভূত একটা আকস্মিক ব্যাপারও নহে, আবার শুদ্ধমাত্র কাল্পনিক ধর্ম্মাদর্শ হইতে উদ্ভূত ধর্ম্মসংস্কারচেষ্টাও নহে। ইহার মূলে এমন একটি গভীরতর ও প্রবলতর কারণ বিদ্যমান, যাহা সমস্ত বিশেষ কারণের শীর্ষস্থ কারণ। ইউরোপ এতদিন তাহার অধিকাংশ জ্ঞান ও চিন্তা কর্ত্তৃপক্ষের হস্ত হইতে

নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, এবং ইহাই তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া বরাবর বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে; এখন হইতে সে নিজের বুদ্ধিবিচার খাটাইয়া সেই সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তা যাচাই করিয়া লইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে লাগিল; এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবচিত্তের মুক্তিসাধনের জন্য যে বিরাট্ আন্দোলন উপস্থিত হইল, সেই আন্দোলনই রিফর্মেশনের যথার্থ স্বরূপ। আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে কর্তৃশক্তির বিরুদ্ধে মানবচিত্তের বিদ্রোহ—ইহাই রিফর্মেশনের যথার্থ পরিচয় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই যুগে মানবচিত্তের অবস্থা ও মানবচিত্তানুশাসক চর্চ্চের অবস্থা যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দুইটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। মানবচিত্ত এখন পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত যুগ অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয়, স্বাধীন বিকাশ ও অধিকার বিস্তারের জন্য অধিকতর উন্মুখ। বহুযুগসঞ্চিত নানা কারণের সমবায়ে এই নূতন সক্রিয়তার উদ্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব্বে এমন অনেক যুগ আসিয়াছে, যখন প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে নানা পাষণ্ডমত আবির্ভূত হইয়াছে ও কিয়ৎকাল পরে অন্তর্দ্ধানপূর্ব্বক অন্যান্য পাষণ্ডমতের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। এইরূপ অনেক যুগে নূতন নূতন দার্শনিক মতের আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে, মানবচিত্তের এই সমস্ত বিচিত্র প্রয়াস একাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সঞ্চিত ও স্তূপীকৃত হইয়া আসিয়াছে। অবশেষে এখন এই সমস্ত ব্যাপারের ফল ফলিবার সময় আসিল। তাহা ছাড়া চর্চ্চের অন্তঃস্থলেই যে সমস্ত বিচিত্র শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও আনুকূল্য লাভ করিয়াছিল, তাহারও ফল ফলিতে লাগিল। চর্চ্চপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ হইতে কতকগুলি লোক কিঞ্চিৎ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া বাহির হইতে লাগিল এবং তাহাদের সংখ্যা

দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সমস্ত শিক্ষিত লোক অবশেষে সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও বিচার করিতে চাহিল; কারণ, এখন তাহারা এমন একটা শক্তি অনুভব করিতে লাগিল, যাহা পূর্ব্বে কখনও করে নাই। সর্ব্বশেষে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকসভ্যতার যে পুনরুজ্জীবনের কথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, তাহার প্রভাবে মানবচিত্তে নবীন প্রাণের সঞ্চার হইল।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সমস্ত কারণের একত্র সমবায়ে মানুষের মনে একটা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিল, সকলেই এখন উন্নতির প্রেরণা অনুভব করিতে লাগিল।

এদিকে যে যাজকতন্ত্র এত দিন পর্য্যন্ত মানুষের মনের উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে, তাহার অবস্থা একেবারে অন্যরূপ। মানুষের মন যখন চঞ্চল ও সক্রিয় হইয়া উঠিল, যাজকতন্ত্রের তখন একেবারে অচল ও নিষ্ক্রিয় অবস্থা। যাজকতন্ত্রের ও রোমের পোপসভার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিপত্তি তখন অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, ইউরোপীয় সমাজ এখন আর তাহার অধিকার মানে না; ঐহিক রাষ্ট্রসমূহই এখন সমাজের অধিপতি, চর্চ্চ নহে। তথাপি চর্চ্চ এখনও তাহার বাহ্য আস্ফালন, বাহ্য বৈভব ও মর্য্যাদা ছাড়িয়া দেয় নাই। বহু প্রাচীন শাসনশক্তির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া আসিয়াছে, চর্চ্চের ভাগ্যে এখন সেই দশা ঘটিল। চর্চ্চের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, তাহার অধিকাংশই এ সময়ের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। এ কথা সত্য নহে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে চর্চ্চ নিরতিশয় অত্যাচারী ও যথেচ্ছতন্ত্র ছিল। ইহাও সত্য নহে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে চর্চ্চে যথার্থ অনাচারের পরিমাণ বা গুরুত্ব অন্য সময় অপেক্ষা অধিক ছিল। বরং এ সময়ে চর্চ্চের শাসন যেরূপ শিথিল ও উদার ছিল, সেরূপ বোধ হয়, আর কোন সময়ে ছিল না। সমস্ত

ব্যাপারই স্বাভাবিক গতিতে যে দিকে যায় যাউক, চর্চ্চের তাহাতে এখন কোন আপত্তি নাই, শুদ্ধ এইটুকুমাত্র লোকে তাহাকে মানিয়া লউক, যাহাতে তাহার প্রাচীন অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে তাহার অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত না হয়, যাহাতে তাহার প্রাপ্য কর বন্ধ না হইয়া যায়। মানবচিত্তকে সে নিরুপদ্রব শান্তিতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল. মানবচিত্ত যদি তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দিত। কিন্তু শাসনতন্ত্র যখন দুর্ব্বল ও প্রতিপত্তিহীন হইয়া পড়ে, যখন তাহার ভাল করিবারও ক্ষমতা থাকে না, মন্দ করিবারও ক্ষমতা থাকে না, ঠিক সেই সময়েই সে আক্রান্ত হয়; কারণ, সেই সময়েই তাহাকে আক্রমণ করা সম্ভব, পূর্ব্বে তাহাকে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না।

এই সময়ে মানবচিত্ত ও চিত্তশাসক যাজকতন্ত্রের অবস্থা আলোচনা করিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রিফর্মেশনের যথার্থ স্বরূপ—স্বাধীনতার জন্য এক নবীন উদ্যম, মানবচিত্তের একটা বিদ্রোহ। ব্যক্তিগত বা জাতীয় বা রাজকীয় স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাত বা চর্চ্চসংস্কার বা অনাচার নিরাকরণের আবশ্যকতা প্রভৃতি রিফর্মেশনের যে সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, মানবচিত্তের এই স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা সে সমস্ত কারণের উর্দ্ধে।

ধরিয়া লউন, ধর্ম্ম-সংস্কার আন্দোলনের দুই এক বৎসর পরেই, যখন সে তাহার সমস্ত দাবীদাওয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছে ও তাহার সমস্ত অভিযোগ বিবৃত করিয়াছে, এমন সময় যাজকতন্ত্র সংস্কারকদিগের সমস্ত মত স্বীকার করিয়া লইয়া বলিল,—"আচ্ছা, তাহাই হউক। আমি সমস্ত সংস্কার করিয়া দিব; আমি এখন হইতে বৈধ ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্রে পরিণত হইব; আমি সমস্ত উৎপীড়ন, যথেচ্ছাচারিতা ও অন্যায় কর বন্ধ করিয়া দিতেছি। এমন কি, ধর্ম্মমতের ক্ষেত্রেও আমি পরিবর্ত্তন করিতে, ব্যাখ্যা করিয়া দিতে ও আদিম শাস্ত্রব্যাখ্যার পুনঃ

প্রবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগ দূর করিয়া অবশেষে আমার পূর্ব্ব পদবী ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। আমি পূর্ব্বে যেমন মানবচিত্তের একমাত্র নিয়ামক ও শাসক ছিলাম, এখনও আমার পূর্ব্বক্ষমতা ও পূর্ব্ব অধিকার সমেত তাহাই থাকিতে চাই।” আপনারা কি মনে করেন, ধর্ম্মবিপ্লব ইহাতেই শান্ত হইত, ইহাতেই বিপ্লবের গতি নিরুদ্ধ হইত? আমার তাহা মনে হয় না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ইহা অগ্রসর হইয়াই চলিত,—প্রথমে সংস্কার দাবী করিয়া, পরে সে স্বাধীনতা দাবী করিত। ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক সঙ্কট শুদ্ধমাত্র সংস্কার আন্দোলন লইয়া নহে, ইহা যথার্থ পক্ষে একটা বিপ্লবকারী সঙ্কট। এই বিপ্লবকারী প্রকৃতি বাদ দিলে রিফর্মেশনের যথাযথ আলোচনা অসম্ভব; ইহার প্রকৃতি, ইহার দোষ-গুণ সমস্তই বিপ্লবসুলভ।

এখন একবার রিফর্মেশনের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ইতিহাস আলোচনা করা যাউক। এ আলোচনায় সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে, বিভিন্ন দেশে ইহার প্রভাবে কি কি ফল ফলিল। মনে রাখিবেন, নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে নানা অসমান সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে ইহার বিকাশ ঘটিয়াছিল। যদি দেখি, অবস্থাবৈষম্য এবং সুবিধাবৈষম্য সত্ত্বেও, রিফর্মেশন সর্ব্বত্রই এক লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, এক ফল প্রসব করিয়াছে এবং এক বিশিষ্ট প্রকৃতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে হইবে যে, এই প্রকৃতিই রিফর্মেশনের মূলগত প্রকৃতি, এই লক্ষ্য ও পরিণামই ইহার যথার্থ লক্ষ্য ও পরিণাম।

বাস্তবিক পক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লব যেখানে যেখানে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সর্ব্বত্রই ইহা মানবচিত্তের সম্পূর্ণ মুক্তিসাধন না করুক, স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই। অবশ্য অনেক স্থলে ধর্ম্মবিপ্লব সত্ত্বেও মানুষের মন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাদির প্রকৃতি অনুসারে কোথাও

বা স্বাতন্ত্র্যপ্রবণ, কোথাও বা দাসত্বপ্রবণ রহিয়া গেল। কিন্তু রিফর্মেশনের প্রভাবে ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের শক্তি কোথাও একেবারে বিলুপ্ত, কোথাও নিরস্ত্র হইয়া গেল। এতদিন মানুষের চিন্তার উপর যাজকতন্ত্র যে প্রণালীবদ্ধ অমোঘ শাসন বিস্তার করিয়াছিল, রিফর্মেশন সে শাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিল। নানা বিচিত্র ঘটনাসমষ্টির মধ্যে রিফর্মেশনের সর্ব্বত্রই এই ফল প্রসব করিল। জার্ম্মানীতে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ছিল না; রিফর্মেশনও সেখানে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আনে নাই। বরং ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে রাজন্যবর্গের শক্তিক্ষয় না হইয়া শক্তিবৃদ্ধিই ঘটিল। মধ্য যুগের যে সমস্ত স্বাতন্ত্র্যমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল, রিফমেশন তাহাদিগের আনুকূল্য না করিয়া বরং প্রতিকূলতাই করিয়াছিল। তথাপি ইহার প্রভাবে জার্ম্মানীতে মানবচিন্তা যে পরিমাণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেরূপ আর কোথাও পায় নাই।

ডেন্মার্কে কি পৌরপ্রতিষ্ঠানে, কি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে: সর্ব্বত্রই যথেচ্ছতন্ত্রের আধিপত্য ছিল, অথচ সেখানেও রিফর্মেশনের প্রভাবে মানুষের চিন্তা মুক্তপক্ষে নানাদিকে প্রধাবিত হইল।

হলাণ্ডে তখন গণতন্ত্রের আধিপত্য এবং ইংলণ্ডে বিধিবদ্ধ রাজতন্ত্রের শাসন। উভয় দেশেই বহুকাল ধরিয়া যাজকতন্ত্রের অমোঘ শাসন চলিয়াছিল, অথচ এখানেও অন্যান্য দেশের ন্যায় মানবচিত্তের মুক্তিসাধন হইল। ফ্রান্সের অবস্থা রিফর্মেশনের প্রভাববিস্তারের পক্ষে অনুকূল ছিল না; কারণ, এখানে সংস্কারকপক্ষ পরাজিত হইয়াছিল, অথচ এখানেও মানুষের চিন্তা চেষ্টায় একটা স্বাধীনতার ভাব আসিল। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ নাঁতের অনুশাসন প্রত্যাহৃত না হওয়া অবধি ফ্রান্সে রিফর্মেশনের একটা বৈধ সত্তা ছিল। এই দীর্ঘকাল মধ্যে সংস্কারকগণ লিখিয়াছেন, তর্ক করিয়াছেন এবং প্রতিপক্ষগণকে

তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। এই তর্কযুদ্ধ, এই পুস্তিকা-প্রবন্ধের বাদপ্রতিবাদ, প্রাচীন মত ও নবীন মতের পরস্পর বিচারার্থ সভা-সমিতি—কেবল এই একমাত্র উপায়ে ফ্রান্সে যে যথার্থ স্বাধীনতা আসিল, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। এই যে স্বাধীনতা আসিল, তাহাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইল, ফরাসী যাজকবর্গের গৌরববৃদ্ধি হইল এবং সাধারণ ভাবে মানুষের চিন্তা লাভবান্ হইল। বস্যুয়ের সহিত ক্লোদের ধর্ম্মবিষয়ে যে সমস্ত বিচার বিতর্ক হইয়াছিল, তাহার কথা একবার ভাবুন; আপনারা কি মনে করেন, চতুর্দ্দশ লুই ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে এতটা স্বাধীনতা দিতে সম্মত হইতেন? রিফর্মেশন ও তাহার বিরোধী দলের মধ্যে বিচার বিতর্কে যে স্বাধীনতা দেখা দিল, সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স আর কোন বিষয়ে এতটা স্বাধীনতা লাভ করে নাই। ধর্ম্মবিষয়ক বিচারে তখন যে পরিমাণ সাহস ও স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যাইত, টেলেমেকস্-প্রণেতা ফেনেলোঁর রাষ্ট্রীয় চিন্তায় সে পরিমাণ সাহস দেখা যায় না। নাঁতের অনুশাসন প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বরাবর এইরূপ অবস্থা ছিল। এ দিকে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪০ বৎসর যাইতে না যাইতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বিরাট্ চিত্তবিপ্লব উপস্থিত হইল। চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের অনুকূলে ধর্ম্মবিপ্লবের প্রভাব অবসান না হইতেই দার্শনিক বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গেল।

এখন দেখিলেন, যেখানেই ধর্ম্মবিপ্লবের আন্দোলন প্রবলভাবে চলিয়াছে, সর্ব্বত্রই জয়পরাজয়নির্ব্বিশেষে ইহার প্রভাবে মানুষের চিন্তা অধিকতর সক্রিয় ও স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে।

রিফর্মেশন শুদ্ধ যে এই ফল প্রসব করিল, তাহা নহে, এই ফলেই সে সন্তুষ্ট হইয়া গেল; যেখানে সে এই ফল লাভ করিয়াছে, সেখানে সে আর কিছু চাহে নাই; কারণ, মানবচিত্তের বন্ধনমুক্তিই রিফর্মেশনের

আদিম ও মজ্জাগত প্রকৃতি। জার্ম্মানীতে রাষ্ট্রীয় দাসত্ব টিকিয়া রহিল, রিফর্মেশন তাহার উচ্ছেদকল্পে কোন চেষ্টা করে নাই। ইংলণ্ডে নব-প্রতিষ্ঠিত প্রোটেষ্টান্ট চর্চ্চে শ্রেণীবিন্যস্ত যাজকপ্রধানদিগের আধিপত্য রহিল এবং রোমক চর্চ্চের মত বহু অনাচার ও কুপ্রথা রহিয়া গেল, রিফর্মেশন সমস্তই স্বীকার করিয়া লইল।

যে রিফর্মেশন অন্যান্য বিষয়ে একান্ত আগ্রহ ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছে, সে এ সব ক্ষেত্রে এতটা শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য দেখাইল কি করিয়া? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সে মুখ্যতঃ যাহা চায়, তাহা পাইয়াছে—মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক ব্যাপারে কর্ত্তৃশক্তির যে প্রভুত্ব, তাহা সে নষ্ট করিতে পারিয়াছে, মানবচিত্তের বন্ধনমুক্তি সাধিত হইয়াছে। তাই পুনরায় বলি, যেখানে যেখানে সে এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়াছে, সেখানে সেখানে সে সর্ব্ববিধ শাসনপদ্ধতি ও ঘটনাসংস্থান মানিয়া লইয়াছে।

এখন বিপরীত দিক্ হইতে এই সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা করা যাউক; যে সব দেশে রিফর্মেশনের আন্দোলন প্রবেশ করিতে পারে নাই বা প্রারম্ভেই প্রশমিত হইয়া গিয়াছে, সে সব দেশে কি হইয়াছিল, দেখা যাউক। ইতিহাস বলিতেছে, সে সব দেশে মানবচিত্তের বন্ধন-মুক্তি হয় নাই। স্পেন ও ইটালী, এই দুই বড় বড় দেশ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অন্যান্য দেশে যখন রিফর্মেশনের প্রভাবে মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধি অভূতপূর্ব্ব সচলতা ও স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়াছে, ইটালী ও স্পেনে তখন রমণীসুলভ দৌর্ব্বল্য ও অলসতার প্রাদুর্ভাব। সুতরাং দুই বিপরীত দিক্ হইতেই আমাদের সিদ্ধান্ত এককালে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে।

চিন্তার স্বাধীন স্ফূর্ত্তি এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যথেচ্ছতন্ত্র কর্ত্তৃশক্তির

অধিকার বিলোপ, ইহাই সুতরাং রিফর্মেশনের মজ্জাগত প্রকৃতি, ইহার প্রভাবের চূড়ান্ত ফল, ইহার ভাগ্যবিবর্ত্তনের মুখ্য ঘটনা।

আমি ইচ্ছা করিয়াই "ঘটনা" শব্দটি ব্যবহার করিলাম। বাস্তবিকপক্ষে মানবচিত্তের বন্ধন-মুক্তিসাধন রিফর্মেশনের প্রভাবে সর্ব্বত্রই ঘটিল বটে, কিন্তু এ ঘটনা সংস্কারকদিগের উদ্দেশ্যভুক্ত ছিল না, তাঁহারা কখনও ইহাকে রিফর্মেশন আন্দোলনের মুখ্য তত্ত্বরূপে গ্রহণ করেন নাই। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে সিদ্ধি সঙ্কল্পকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, বোধ হয়, ইচ্ছাকেও অতিক্রম করিয়াছে। অন্যান্য বিপ্লবে দেখা যায়, সঙ্কল্পের তুলনায় পরিণাম অত্যন্ত খর্ব্ব ও নিকৃষ্ট; এ ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত, বিপ্লবের পরিণাম বিপ্লবকারীদিগের মতামত ছাড়াইয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অপেক্ষা পরিণাম মহৎ; রিফর্মেশন পরিণামে যাহা সাধন করিল, পূর্ব্ব হইতে তাহা ভাবে নাই বা স্বীকার করে নাই।

রিফর্মেশনের বিপক্ষদল ইহার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ করিয়াছিলেন, সংস্কারকদিগের মুখ বন্ধ করিবার জন্য সংস্কার আন্দোলনের কোন্ কোন্ কুফল লইয়া তাঁহারা আস্ফালন করিতেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

তাঁহারা মুখ্যতঃ দুই বিষয়ে রিফর্মেশনের উপর দোষারোপ করিতেন —প্রথমতঃ নানা বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ও মানুষের মনকে অতিমাত্র স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে ধর্ম্মসমাজের সমগ্রতা নাশ। দ্বিতীয় অভিযোগ—সংস্কারের নামে অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রাদুর্ভাব। তাঁহারা সংস্কারকদিগকে বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছ; এমন কি, নিজেরাই যথেচ্ছাচার সৃষ্টি করিতেছ; আবার সৃষ্টির পর সেই যথেচ্ছাচার পেষণ ও দমন করিতে চাও। সেও আবার

কঠোরতম বলপ্রয়োগের দ্বারা দমন করিতে চাও। এক অবৈধ কর্ত্তৃত্বাধিকারের বলে তোমরাই আবার পাষণ্ডমত দলন করিতে ব্যস্ত।”

রিফর্মেশনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বড় বড় আক্রমণ হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে ধর্ম্মমতঘটিত বাদবিবাদ ছাড়িয়া দিলে দেখিবেন, সমস্ত দোষারোপের মূলে এই দুইটি কথা রহিয়াছে।

সংস্কারকদল এই সমস্ত আক্রমণে অত্যন্ত সঙ্কোচে পড়িতেন। যখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিপক্ষদল সম্প্রদায়বহুলতা লইয়া দোষারোপ করিতেন, তখন তাঁহারা সাহস করিয়া বলিতে পারিতেন না,—“হাঁ, রিফর্মেশনের ফলে বহু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতেছে সত্য ; কিন্তু ইহাদের উদ্ভব ও বিকাশ অন্যায়ও নহে, অস্বাভাবিকও নহে।” তাঁহারা বরং এই সমস্ত বিচিত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ধর্ম্মচ্যুত, সমাজচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিতেন, তাহাদের অস্তিত্ব লইয়া পরিতাপ করিতেন, এবং তাহাদিগকে অস্বীকার করিতেন। যখন তাঁহাদিগের অত্যাচার উৎপীড়ন লইয়া দোষারোপ করা হইত, তখনও তাঁহারা সঙ্কোচের সহিত আত্মসমর্থন করিতেন। তাঁহারা বলিতেন,—“প্রয়োজনের তাড়নাতেই আমরা এরূপ করিতেছি। আমরা যখন সত্যের অধিকারী, তখন আমাদের ভ্রান্তি দমন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে ; কেবলমাত্র আমাদের বিশ্বাস, আমাদের প্রতিষ্ঠানাদিই বৈধ; রোমক চর্চ্চ ভ্রান্ত, এই জন্যই তাহার সংস্কারক-দিগকে দণ্ড দিবার যথার্থ অধিকার নাই।”

শুধু যে প্রতিপন্থী রোমকচর্চ্চের পক্ষ হইতেই সংস্কারকদিগের বিরুদ্ধে অত্যাচারের জন্য দোষারোপ করা হইত, তাহা নহে, রিফর্মেশনের সন্তানস্বরূপ যে সমস্ত নূতন সম্প্রদায় উদ্ভূত হইল, তাহারাও রিফর্মেশনের নেতৃপক্ষকর্ত্তৃক ধর্ম্মসমাজচ্যুত হইয়া অনেক সময় বলিত,—“তোমরা

যাহা করিয়াছ, আমরা ত তাহাই করিতেছি ; তোমরাও যেমন স্বতন্ত্র দল গড়িয়াছ, আমরাও ত তেমনি স্বতন্ত্র দল গড়িয়াছি।" সংস্কারকগণ এ কথার কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া আরও বিপন্ন হইয়া পড়িতেন, এবং অনেক সময় উত্তরস্বরূপ অত্যাচারের মাত্রা চড়াইয়া দিতেন।

বাস্তবিক পক্ষে রিফর্মেশন যখন চিন্তাজগতে একাধিপত্যের উচ্ছেদসাধনে নিযুক্ত, তখন সে চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের যথার্থ তত্ত্ব অবগত ছিল না। সে বাস্তবিকপক্ষে মানুষের চিত্ত বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল, অথচ সে ভাণ করিত, সে যেন বিধিগত অধিকারের বলে সমাজশাসন করিতেছে। কার্য্যক্ষেত্রে সে স্বাধীন বিচার ও স্বাধীন অনুসন্ধানের দিকে প্রবণতা দেখাইয়াছে, অথচ বিচারক্ষেত্রে সে বলিত,—"আমি অবৈধ কর্ত্তৃশক্তির পরিবর্ত্তে বৈধ কর্ত্তৃশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতেছি।" সংস্কারকগণ সংস্কার আন্দোলনের মূল উৎসেরও সন্ধান রাখিত না, চরম পরিণতিরও পরিচয় পায় নাই। এইরূপে রিফর্মেশনের মধ্যে দুই দোষ প্রবেশ করিল। একদিকে তাঁহারা মানবচিন্তার সমস্ত অধিকার জানিতেনও না, মানিতেনও না, আত্মপক্ষের জন্য যে সমস্ত অধিকার দাবী করিয়া চীৎকার করিতেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অপর পক্ষের সেই সমস্ত অধিকার লঙ্ঘন করিতেন ; অন্য দিকে কেমন করিয়া যে চিন্তাজগতে কর্ত্তৃত্বশক্তির সীমা পরিমাপ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। আমি দমনশাসনকারী কর্ত্তৃত্বশক্তির কথা বলিতেছি না ; কারণ, চিন্তাক্ষেত্রে এরূপ শক্তির কোন অধিকার থাকা উচিত নহে ; আমি বিশুদ্ধ নৈতিক শক্তির কথাই বলিতেছি, যাহা কেবলমাত্র প্রভাববিস্তারদ্বারা শুদ্ধ মনের উপর ক্রিয়া করে। সমাজের চিন্তারাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইলে এবং সনাতন সামাজিক মতামতের প্রভাব নিয়মিত ভাবে বজায় রাখিতে হইলে যাহা আবশ্যক, অধিকাংশ সংস্কার-প্রভাবান্বিত

দেশে এমন একটা কিছুর অভাব ছিল। তাহারা স্বাধীনতার সহিত পারম্পর্য্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে নাই; এবং ইহার নিঃসন্দিগ্ধ কারণ এই যে, রিফর্মেশন নিজের মূলতত্ত্ব ও পরিণাম নিজেই ধারণা করিতে পারে নাই।

এই কারণেই আবার রিফর্মেশনের মধ্যে একটা অসঙ্গতি ও সঙ্কীর্ণ-চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। বিপক্ষদলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এইখানেই ইহার খর্ব্বতা ছিল। সংস্কারবিরোধী দল স্বকীয় উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিল, তাহারা কি করিতেছে ও কি করিতে চায়, তাহা ভাল করিয়াই জানিত; তাহারা ক্রিয়াকলাপের সহিত মূলনীতির সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিত, তাহাদের কার্য্যাবলীর সমস্ত ভবিষ্য পরিণাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া চলিত। রোমক চর্চ্চের শাসনতন্ত্রের ন্যায় সুসঙ্গত ও প্রণালীবদ্ধ শাসনতন্ত্র আর কখনও হয় নাই। কার্য্যক্ষেত্রে রোমক চর্চ্চ অনেক স্থলে যেরূপ শৈথিল্য ও দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছে, রিফর্মেশন সেরূপ করে নাই; কিন্তু তত্ত্বক্ষেত্রে তাহার বিশিষ্ট পদ্ধতি যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে ও তাহার কার্য্যকলাপের মধ্যে যে সুসঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে, সংস্কারকদিগের মধ্যে সেরূপ হয় নাই। আমি যে কি করিতেছি ও কি করিতে চাই, এটা সম্পূর্ণরূপে জানা, একটা বিশেষ মত ও সঙ্কল্প সজ্ঞানে বিচারবুদ্ধি সহকারে ধরিয়া থাকা,—ইহা অসামান্য শক্তির আকর। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লবের ইতিহাসে ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সকলেই জানেন যে, রিফর্মেশনের সহিত লড়াই করিবার জন্য রোমক চর্চ্চ যে প্রধান উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তাহা জেস্যুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা। এই জেস্যুইট-দিগের ইতিহাস আলোচনা করুন; দেখিবেন, তাহারা সর্ব্বত্রই অকৃতকার্য্য হইয়াছে। যেখানেই তাহারা কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ

করিয়াছে, সেইখানেই তাহারা রোমক চর্চ্চের ভাগ্যে দুর্গতি আনিয়াছে। ইংলণ্ডে তাহারা রাজার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, স্পেনে প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ঘটনাপরম্পরার সাধারণ গতি, আধুনিক সভ্যতার বিকাশ, মানবচিত্তের বন্ধনমুক্তি প্রভৃতি যে যে শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য জেসুইট্-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, সকলেই তাহাদিগকে পরাভূত করিল। শুদ্ধ যে তাহারা অকৃতকার্য্য হইল, তাহাই নহে, তাহারা কিরূপ উপায় প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাও মনে করুন। তাহাদের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে না আছে দীপ্তি, না আছে গৌরব; এমন কিছুই নাই, যাহাতে কল্পনাকে চমকিত বা অভিভূত করিতে পারে। তাহারা কোন মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করে নাই, কোন স্থলে বৃহৎ জনসঙ্ঘকে অনুপ্রাণিত করিয়া কাজে নামায় নাই; তাহারা কেবল বক্রপন্থা ও গৌরবহীন গুপ্ত উপায় অবলম্বনে কাজ করিয়াছে। তাহাতে কল্পনা জাগাইবার বা জনসমূহের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার মত কিছুই ছিল না। যে রিফর্মেশনের বিরুদ্ধে সে লড়াই করিল, সে যে শুধু জয়ী হইল, তাহা নহে, গৌরবের সহিত জয়লাভ করিল; সে বড় বড় উপায় অবলম্বন করিয়া বড় বড় ব্যাপার সম্পন্ন করিল; সে জনসমূহকে জাগাইয়া দিল, বড় বড় মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটাইল, এবং প্রকাশ্য দিবালোকে রাষ্ট্রসমূহের আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। এক কথায়, ভাগ্যপরিণাম ও বাহ্য ঘটনা, সমস্তই জেসুইটদিগের বিরুদ্ধে গেল; তাহাদিগের জীবনলীলায় বিষয়বুদ্ধিও চরিতার্থ হইল না—কারণ, সে চায় কৃতকার্য্যতা,—কল্পনাও তৃপ্ত হইল না—কারণ, সে চায় গৌরবদীপ্তি। অথচ তাহাদের মধ্যে যে একটা মহত্ত্বগৌরব ছিল, তাহাদের নাম, প্রভাব ও ইতিহাসের সহিত যে একটা মহৎ কল্পনা জড়িত আছে, তাহা সুনিশ্চিত। এ কিরূপে হইল?

ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা কি যে করিতেছে ও কি যে করিতে চায়, তাহা ভাল করিয়াই জানিত; তাহাদের কার্য্যকলাপের অন্তর্নিহিত মূলনীতির ও উদ্দিষ্ট পরিণামের তাহারা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ধারণা করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের চিন্তার মহত্ত্ব ছিল, দৃঢ় সঙ্কল্পের মহত্ত্ব ছিল; এবং সেই জন্যই নিকৃষ্ট ঘৃণ্য উপায় অবলম্বন এবং ঘন ঘন পরাজয় সত্ত্বেও তাহারা উপহাসাস্পদ হইয়া পড়ে নাই। অপর দিকে যেখানে সঙ্কল্প অপেক্ষা পরিণাম মহৎ, যেখানে অনুষ্ঠাতৃগণ স্বকৃত অনুষ্ঠানের মূলনীতি ও চরম পরিণাম সম্বন্ধে অজ্ঞ, সেই রিফর্মেশন পক্ষে এমন একটা অপূর্ণতা, অসঙ্গতি ও সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়িল, যাহাতে বিজয়ী হইয়াও তাহারা তত্ত্বযুক্তি হিসাবে নিকৃষ্ট পদে পড়িল। এই নিকৃষ্টতা অনেক স্থলে বাহ্যঘটনাতেও প্রতিফলিত হইল। নবীন ও প্রাচীন ধর্ম্মতন্ত্রের সংঘর্ষে এইখানেই রিফর্মেশনের দুর্ব্বলতা; এই দুর্ব্বলতা অনেক সময় তাহাকে বিপন্ন ও সঙ্কুচিত করিয়াছে, তাহাকে যথোপযুক্তরূপে আত্মসমর্থন করিতে দেয় নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লব আরও নানা দিক্ হইতে বিচার করা যায়। রিফর্মেশনের ধর্ম্মমত. ধর্ম্মের উপর এই সকল মতের প্রভাব, মানবাত্মার সহিত ভগবান্ ও অনন্ত ভবিষ্যতের সম্বন্ধ, এই সকল বিষয়ে আমি কিছুই বলি নাই, আমার কিছু বলিবারও নাই। শুদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার সহিত এই ধর্ম্মবিপ্লবের বিচিত্র সম্বন্ধ বিষয়ে দুই এক কথা বলিতে চাই। রিফর্মেশনের প্রভাবে সমাজে অনেক মহৎ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। প্রথমতঃ ইহা সাধারণ জনসমাজে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দিল। এতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ছিল যাজকসম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি; ধর্ম্মবৃক্ষের ফল তাঁহারা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতেন বটে, কিন্তু বৃক্ষের উপর তাঁহাদের একাধিপত্য, বৃক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদেরই কেবল

বলিবার অধিকার ছিল। রিফর্মেশনের প্রভাবে জনসমাজের শিরায় শিরায় ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মমতের প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া গেল ; এতদিনে খৃষ্টবিশ্বাসী জনসমাজ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিবার অধিকার পাইল। সঙ্গে সঙ্গে রিফর্মেশনের আর একটি ফল ফলিল। রিফর্মেশন রাষ্ট্রনীতি হইতে ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল ; ঐহিক রাষ্ট্রশক্তি পুনরায় স্বাধীন স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম যখন জনসমাজের অধিকারে ফিরিয়া আসিল, ঠিক সেই সময়েই সে সমাজ-শাসনের অধিকার বর্জ্জন করিল। সংস্কার-প্রভাবিত দেশসমূহে যাজকতন্ত্র-গঠনবিধির নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ধর্ম্মশাসনতন্ত্র আর ঐহিক শক্তি পরিচালনের দাবী করে না। ইংলণ্ডে নবগঠিত যাজকতন্ত্র অনেক পরিমাণে প্রাচীন যাজকতন্ত্রের অনুরূপ, সেই ইংলণ্ডেও চর্চ্চের আর কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রহিল না।

রিফর্মেশনের আরও অনেক পরিণাম-ফল উল্লেখ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি এইখানেই বিরত হইলাম। রিফর্মেশনের যাহা যথার্থ স্বরূপ অর্থাৎ মানবচিত্তের মুক্তিসাধন ও ধর্ম্মরাজ্যে একাধিপত্যের বিলোপ—এই মুখ্য তত্ত্বটি আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অবশ্য এই আধিপত্যবিলোপ সম্পূর্ণভাবে সাধিত হয় নাই, তথাপি এ পর্য্যন্ত এ উদ্দেশ্যে এরূপ বিরাট্ উদ্যম আর কখনও হয় নাই।

আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে ধর্ম্মসমাজের এবং সাধারণ সমাজের যে নানা ভাগ্যবিপর্য্যয় হইয়াছে, উপসংহারের পূর্ব্বে একবার এতদুভয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে বলি।

যাজকতন্ত্রের আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে, খৃষ্টীয় সমাজ আরম্ভে স্বাধীন স্বতন্ত্র সমাজ ছিল। একটি সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া ইহা গঠিত, ইহার না ছিল কোন প্রতিষ্ঠান, না ছিল শাসনতন্ত্র। কেবল-

মাত্র ধর্ম্মপ্রভাবেই ইহা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ইউরোপে সাধারণ সমাজও অন্ততঃ আংশিকভাবে বর্ব্বর দল লইয়া এইরূপেই গঠিত হয়। সে সমাজ একেবারে স্বাধীন, স্বতন্ত্র; আইন ছিল না, সুগঠিত শাসনব্যবস্থা ছিল না; প্রত্যেকে সুবিধা ও প্রয়োজনবোধেই সে সমাজে বাস করিত। কোন বর্দ্ধমান সমাজই এ অবস্থায় চিরকাল থাকিতে পারে না, সুতরাং এ অবস্থার অবসানকালে ধর্ম্মসমাজ এক অভিজাততন্ত্র শাসনব্যবস্থা মানিয়া লইল। তখন হইতে বিশপ্, সংসদ্ অর্থাৎ যাজকপ্রধানগণ ধর্ম্মসমাজ শাসন করিতে লাগিলেন। বর্ব্বর যুগের অবসানে সাধারণ সমাজেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিল। তখন হইতে ভূস্বামিবর্গ. ভূম্যধিকারী অভিজাতবর্গ সমাজ শাসন করিতে লাগিলেন। পরে ধর্ম্মসমাজ অভিজাততন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ রাজতন্ত্রের আদর্শে পোপ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল। রোমের পোপ-সভা যে ধর্ম্মসংসদ্ ও যাজক প্রধানদিগের সংস্কার-চেষ্টা পরাভূত করিল, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। সাধারণ সমাজেও অনুরূপ বিপ্লব সাধিত হইল; অভিজাততন্ত্রের বিনাশ সাধন করিয়াই রাজশক্তি ইউরোপে আধিপত্য স্থাপন করিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম্মসমাজের অন্তঃস্থলেই পোপ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। এই বিদ্রোহের ফলে ইউরোপে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন অনুসন্ধানের পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল। পরবর্ত্তী কালে সাধারণ সমাজেও এই বিপ্লব আমরা ঘটিতে দেখিয়াছি। যথেচ্ছতন্ত্র ঐহিক রাজশক্তি আক্রান্ত ও পরাভূত হইয়াছে। সুতরাং দেখিলেন, উভয় সমাজের একই রূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়, একই রূপ বিবর্ত্তন; কেবল ধর্ম্মসমাজ সর্ব্বদাই অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন আধুনিক সমাজের একটা মহদ্ব্যাপার অর্থাৎ স্বাধীন গবেষণা ও মানবচিত্তের উন্মুক্ত গতি আমাদের করায়ত্ত হইল। আমরা দেখিয়াছি

যে, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রশক্তি সর্ব্বত্রই ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিল। আগামী অধ্যায়ে আমরা ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আলোচনা করিব; সেখানে দেখাইব, স্বাধীন চিন্তা ও কেন্দ্রবদ্ধ রাজশক্তি—সভ্যতার উন্নতির এই উভয় ফলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সংঘর্ষ কিরূপে বাধিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আপনারা দেখিয়াছেন, ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজের বিচিত্র আকার উপাদান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দুইটি বড় বড় তথ্যের উদ্ভব হইল—একদিকে চিত্তক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার প্রসার, অপর দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে শাসনশক্তির কেন্দ্রীকরণ। প্রথম তথ্যটি যাজক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, দ্বিতীয়টি সাধারণসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। ইউরোপে এককালে মানবচিত্তের বন্ধনমুক্তি ও বিশুদ্ধ রাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এই দুই ব্যাপার সাধিত হইল।

এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, একটা যে সংঘর্ষ বাধিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়; কারণ, ইহারা পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব। একটির তাৎপর্য্য ধর্ম্মক্ষেত্রে যথেচ্ছতন্ত্র-শক্তির পরাজয়, অপরটির অর্থ রাষ্ট্রক্ষেত্রে যথেচ্ছতন্ত্র-শক্তির জয়। প্রথমটি প্রাচীন একেশ্বরতন্ত্র ধর্ম্মশাসন-পদ্ধতির বিলোপের পথ প্রস্তুত করিয়া দিল; দ্বিতীয়টি ভূস্বামিবর্গের ও পৌরবর্গের প্রাচীন স্বাতন্ত্র্যাধিকার উচ্ছেদ করিয়া দিল। এই দুই পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের একত্র অভ্যুত্থানের একমাত্র কারণ এই যে, ধর্ম্ম-সমাজের বিপ্লব সাধারণ সমাজের বিপ্লব অপেক্ষা দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়াছে। ব্যক্তিচিত্তের বন্ধনমুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হইল, কিন্তু সমাজের সর্ব্বময় শাসনশক্তি রাজতন্ত্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইবার পূর্ব্বে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটিল না। সুতরাং চিন্তা ও ধর্ম্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, এবং সমাজ ও রাষ্ট্রসম্পর্কে দাসত্ব, এই দুই ব্যাপার সমধর্ম্মী বলিয়াই যে এককালে ঘটিল, তাহা নহে; বরং এক-কালীনতা সত্ত্বেও ইহাদের পরস্পর অসঙ্গতি সুস্পষ্ট। উভয় ব্যাপারই সভ্যতার উন্নতির পরিচায়ক; কিন্তু উভয়ে উন্নতির বিভিন্ন ধাপে

অবস্থিত ; সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে উভয়ের তারিখ এক বটে, কিন্তু দার্শনিক হিসাবে ইহাদের তারিখ বিভিন্ন। সুতরাং পরস্পর বোঝা পড়া হইবার পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে যে একটা সংঘর্ষ বাধিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী।

প্রথম সংঘর্ষ বাধিল ইংলণ্ডে। বিজয়ী রাজতন্ত্রকর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিলোপের বিরুদ্ধে রিফর্মেশন-প্রসূত স্বাধীন চিন্তার সংগ্রাম ; এবং কি রাষ্ট্রশাসনে, কি ধর্ম্মশাসনে, উভয়ত্র যথেচ্ছতন্ত্রশক্তির উচ্ছেদসাধনের প্রয়াস ;—ইহাই ইংরেজবিপ্লবের সারমর্ম্ম, ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে ইহাই ইহার তাৎপর্য্য।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, অন্য স্থানে না হইয়া সর্ব্বাগ্রে ইংলণ্ডেই কেন এই বিরোধ বাধিল ? ইংলণ্ডে যেমন ধর্ম্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লব আসিল, ইউরোপের মহাদেশখণ্ডে সেরূপ ঘটিল না কেন ?

মহাদেশখণ্ডে রাজশক্তির যে যে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ইংলণ্ডেও তাহাই ঘটিয়াছে। টিউডরদিগের আমলে ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র যেরূপ কেন্দ্রসংহতি ও কার্য্যকরী শক্তি লাভ করিল, সেরূপ আর কখনও করে নাই। ইহা হইতে এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, টিউডরদিগের শাসনে পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচার উপদ্রবের আধিক্য ঘটিল বা ইংলণ্ডের পক্ষে এ শাসন অকল্যাণকর হইল। আমার বিশ্বাস, প্ল্যাণ্টাজেনেট-বংশীয় রাজগণের শাসনে টিউডর-শাসন অপেক্ষা অন্যায় অত্যাচার উপদ্রবের ভাগ বরং অধিক ছিল। ইহাও আমার বিশ্বাস যে, এই সময়ে ইউরোপের মহাদেশখণ্ডে বিশুদ্ধরাজতন্ত্রের শাসন ইংলণ্ডের রাজশাসন অপেক্ষা কঠোর ও যথেচ্ছাচারী ছিল। টিউডরদিগের আমলে নূতন এই হইল যে, যথেচ্ছতন্ত্রশাসন পদ্ধতিবদ্ধ হইল ; রাজতন্ত্র একটা আদিম স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বাধিকার ধারণ করিল ; ইহা একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদবী গ্রহণ করিল।

অষ্টম হেন্‌রী, এলিজাবেথ, প্রথম জেমস্ বা প্রথম চার্ল্‌স্ যে সকল তত্ত্বের দোহাই দিতেন ও যে সকল অধিকার দাবী করিতেন, প্রথম বা তৃতীয় এডওয়ার্ড তাহার কিছুই জানিতেন না। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে শেষোক্ত নৃপতিদ্বয়ের ক্ষমতা প্রথমোক্ত রাজগণের তুলনায় যথেচ্ছাচারিতা বা ব্যাপকতা হিসাবে একেবারেই নিকৃষ্ট ছিল না। সেই জন্যই বলি, ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের মূলতত্ত্ব ও নীতিপদ্ধতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল. কার্য্যকরী ক্ষমতার কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে নাই। রাজশক্তি এখন যথেচ্ছতন্ত্র অধিকার ধারণ করিল এবং ঘোষণা করিয়া দিল, সে সমস্ত বিধিবন্ধনের উর্দ্ধে; এমন কি, যে সমস্ত বিধিবন্ধন সে মানিয়া চলিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে, তাহারও উর্দ্ধে।

তাহা ছাড়া. মহাদেশখণ্ডে যেরূপে ধর্ম্মবিপ্লব সাধিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডে সেরূপে হয় নাই। এখানে রাজাদিগের চেষ্টাতেই ধর্ম্মবিপ্লব ঘটে। অবশ্য ইহাও সত্য যে. অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও অনেক দিন হইতে জনসাধারণের মধ্যে সংস্কারচেষ্টার অঙ্কুর সঞ্চিত ছিল, এবং রাজ-আনুকূল্য ব্যতিরেকেও এ অঙ্কুর নিশ্চয়ই অনতিবিলম্বে ফলবান্ হইত। কিন্তু রাজা অষ্টম হেন্‌রী নিজেই অগ্রণী হইয়া সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে কর্ত্তৃশক্তিই বিপ্লব ঘটাইল। ইহার ফলে ইংলণ্ডে মানবচিত্তের স্বাতন্ত্র্যসাধনের দিক্ হইতে রিফর্মেশনের কার্য্য অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অসম্পূর্ণ হইয়া রহিল। ধর্ম্মবিপ্লব এখানে বিপ্লবকারী রাজবৃন্দের স্বার্থ অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য হইল। রাজা ও বিশপ্-সম্প্রদায় এখানে প্রাচীন পোপ-শাসিত যাজকতন্ত্রের ধনসম্পত্তি ও ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসিল। অনতিবিলম্বেই ইহার পরিণামফল অনুভূত হইতে লাগিল। বলা হইতে লাগিল, ইংলণ্ডের রিফর্মেশনের

কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; অথচ যে সমস্ত কারণে রিফর্মেশনের প্রবর্ত্তন, তাহা সমস্তই রহিয়া গেল। সুতরাং রিফর্মেশন আর এক আকারে জনসাধারণের মধ্যে পুনরাবির্ভূত হইল। পূর্ব্বে যেমন সে রোমের পোপ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়াছিল, এখন সেইরূপ সে ইংরেজ বিশপ্‌দিগের বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"তোমরাও ত এক একজন পোপ"। যখনই ধর্ম্মসংস্কারের সাধারণ উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, যখনই প্রাচীন রোমক চর্চ্চের সহিত লড়াই করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই সংস্কারপক্ষীয় সমস্ত দল একত্র মিলিয়া সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু যেই আসন্ন বিপদ্‌ কাটিয়া গিয়াছে, অমনি আবার অন্তর্ব্বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। আবার সাধারণ সংস্কারকদল রাজকীয় ও অভিজাতপক্ষীয় সংস্কারক-দলকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের অনাচার লইয়া দোষারোপ করিয়াছে, তাহাদের অত্যাচার লইয়া অভিযোগ করিয়াছে, এবং তাহাদিগকে বারংবার বলিয়াছে,—"তোমরা যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা পূর্ণ কর; যে শক্তি তোমরা সিংহাসনচ্যুত করিলে, আবার তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিও না।"

এই সময়েই আবার সাধারণ সমাজে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার জন্য এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল; পূর্ব্বে এ আকাঙ্ক্ষা কেহ অনুভব করে নাই, অথবা করিলেও সে আকাঙ্ক্ষা শক্তিহীন ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইংলণ্ডের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি অতিশয় দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ ভূসম্পত্তি এই সময়ে হস্তান্তরিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচীন ভূস্বামিতন্ত্র অভিজাত-বর্গের উচ্ছেদের ফলে এবং অন্যান্য নানা কারণে ভূসম্পত্তি যে ভাবে বণ্টিত হইল, তাহা একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঘটনা, অথচ এ বিষয়ে

সেরূপ মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। সমস্ত দলিলপত্র হইতে দেখা যায় যে, সে সময়ে ভূম্যধিকারীর সংখ্যা অপরিমিতরূপে বাড়িয়া গিয়াছে এবং অধিকাংশ ভূসম্পত্তি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বা পৌরবর্গের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। উর্দ্ধতন অভিজাতবর্গকে লইয়া গঠিত লর্ডসভা সে সময়ে কমন্সসভা অপেক্ষা ধনসম্পদ্ হিসাবে নিকৃষ্ট ছিল। সুতরাং এ সময়ে এককালে বাণিজ্য-সম্পদের বৃদ্ধি ও ভূসম্পত্তির হস্তান্তরকরণ ঘটিয়াছিল। এই দুই প্রভাবশালী ঘটনার মধ্যে আর এক নূতন প্রভাব আসিয়া জুটিল। মানুষের মনে এক নূতন আন্দোলন। সাহিত্যিক ও দার্শনিক উদ্যম হিসাবে এলিজাবেথের যুগ বোধ হয় ইংরেজী ইতিহাসের মহত্তম যুগ; এ যুগ মহৎ ও উর্ব্বর কল্পনার যুগ। পিউরিটানগণ নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদের সতেজ অথচ সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমতের সমস্ত পরিণাম মানিয়া লইয়া সোজাপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর এক দল লোক ছিলেন, যাঁহাদের চিত্তের গঠন বিপরীতপ্রকার; তাঁহারা যতটা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, ততটা নীতিপরায়ণ ছিলেন না; তাঁহারা কোন নীতি বা পদ্ধতির ধার ধারিতেন না; তাঁহাদের কৌতূহল তৃপ্তি করিতে পারে বা উত্তেজনার খোরাক জোগাইতে পারে, এরূপ যে কোন বস্তু তাঁহারা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন। যেখানেই বুদ্ধিবৃত্তির চালনায় আনন্দ ও সজীবতা আনে, সেখানে শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন অনুভূত হইবে, এই স্বাতন্ত্র্যাকাঙ্ক্ষা অবিলম্বে জনসাধারণের মন হইতে রাষ্ট্র-শাসনের ক্ষেত্রে সংক্রামিত হইবে।

ইউরোপের মহাদেশখণ্ডে রিফর্মেশন-প্রভাবিত কোন কোন দেশে এইরূপ একটা অনুভূতি, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছিল; কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করার কোন উপায় ছিল না; তাহারা জানিত না, কোথায় উপায়ের সন্ধান পাওয়া

যাইবে; জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা রীতিনীতির কোথাও তাহারা আনুকূল্য পায় নাই; সুতরাং তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অনিশ্চিত অনির্দ্দিষ্টরূপেই রহিয়া গেল, তৃপ্ত হইল না। ইংলণ্ডের অবস্থা অন্যরূপ; সেখানে ষোড়শ শতাব্দীতে রিফর্মেশনের পদানুসরণ করিয়া যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভাব পুনরাবির্ভূত হইল, তাহা দেশের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই আনুকূল্য ও অবলম্বন পাইল।

ইংলণ্ডের স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভব-বৃত্তান্ত সকলেই জানেন; সকলেই জানেন, কেমন করিয়া ভূস্বামিপ্রধান বেরনবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া রাজা জনের নিকট হইতে "ম্যাগ্না চার্টা" বা মহাধিকারপত্র জোর করিয়া আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা হয় ত অনেকে জানেন না যে, এই অধিকারপত্র পরবর্ত্তী রাজগণ কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে প্রত্যাহৃত ও পুনরনুমোদিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ত্রিশ বারেরও অধিক এই পুনরনুমোদন ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কেবল যে প্রাচীন অধিকারপত্র পুনরনুমোদিত হইয়াছে, তাহা নহে, ইহার রক্ষা ও পুষ্টিকল্পে নূতন নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব ইহা নিরবচ্ছেদে স্থায়ী হইয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনসভা বা হাউস্ অব্ কমন্স গঠিত হইয়া দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানবর্গের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিল। প্লাণ্টাজেনেটদিগের আমলেই যথার্থভাবে ইহার মূল প্রোথিত হয়। অবশ্য সে সময়ে রাষ্ট্রব্যাপারে ইহার স্থান অতি যৎসামান্যই ছিল; তখন শাসনকার্য্যে প্রভাব হিসাবেও ইহার কোন যথার্থ প্রভুত্ব ছিল না; কেবল রাজার আমন্ত্রণেই সে শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত, তাহাও আবার অত্যন্ত অনিচ্ছা ও সঙ্কোচের সহিত,—যেন নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা কোন কথা বলিয়া ধরা দিবার ভয়ই তাহার অধিক ছিল। কিন্তু

যখনই প্রজার নিজস্ব অধিকার বা পরিবার বা সম্পদ্ রক্ষার কথা উঠিয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যাধিকারের কথা উঠিয়াছে, কমন্স-সভা তখন বিশেষ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়াছে ও ইংরেজ শাসনবিধির ভিত্তিগত মূলনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

প্ল্যাণ্টাজেনেটদিগের পর, বিশেষতঃ টিউডরদিগের আমলে কমন্স্-সভা অথবা সমগ্র পার্লিয়ামেণ্ট ভিন্নরূপে দেখা দিল। প্ল্যাণ্টাজেনেট আমলের মত এখন আর তাহারা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যাধিকার রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল না। যথেচ্ছ অবরোধ, ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ, এ সমস্ত এখন প্রায়ই ঘটিতে লাগিল, কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট সমস্তই বিনা বাক্যব্যয়ে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে। এদিকে কিন্তু রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে পার্লিয়ামেণ্ট অধিকতর উদ্যমে যোগদান করিয়াছে। ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন ও উত্তরাধিকারধারা পরিবর্ত্তনের সময় অষ্টম হেন্‌রী মধ্যস্থ-স্বরূপ একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট, বিশেষ করিয়া কমন্স-সভা এ অভাব পূর্ণ করিল। প্লাণ্টা-জেনেটদিগের আমলে পার্লিয়ামেণ্ট ছিল কেবল একটা প্রতিষেধক শক্তি, প্রজার ব্যক্তিগত অধিকারের রক্ষক; টিউডরদিগের আমলে পার্লিয়ামেণ্ট হইল রাষ্ট্রশাসনব্যাপারের ও শাসননীতির যন্ত্রস্বরূপ। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নানা অত্যাচার উপদ্রব নীরবে সহ্য করা সত্ত্বেও ইহার মর্য্যাদা ও প্রভাব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল; এখন হইতে সে যে বৃহৎ ক্ষমতা পরিচালন করিতে আরম্ভ করিল, সেই ক্ষমতার ভিত্তির উপরেই প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ইংলণ্ডের স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই কয়েকটি বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম,

স্বাধীনতার কতকগুলি মূল নীতি ও তত্ত্ব, যাহার উপর দেশের লোক ও ব্যবস্থাপক জনসভা বরাবর দৃষ্টি রাখিয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতার কতকগুলি নজীর ও দৃষ্টান্ত; এগুলির সঙ্গে অবশ্য অন্য প্রকার বিপরীত নজীর এবং দৃষ্টান্তও অনেক পরিমাণে জড়িত ছিল, তথাপি যথেচ্ছতন্ত্র অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার সময় স্বাতন্ত্র্যরক্ষী জননায়কগণের দাবীদাওয়া সমর্থন ও বৈধীকরণের পক্ষে এই সব অসম্পূর্ণ নজীরই যথেষ্ট ছিল। তৃতীয়তঃ, স্বাতন্ত্র্যানুপ্রাণিত কতকগুলি বিশেষ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান;—যথা জুরী বিচারপ্রথা ও সম্মিলনের অধিকার ও অস্ত্রধারণের অধিকার; এবং পৌর শাসন-পদ্ধতির ও পৌরাধিকারের স্বাতন্ত্র্য। চতুর্থতঃ, পার্লিয়ামেণ্ট ও তাহার ক্ষমতা; রাজা এখন তাঁহার ফিউড্যাল্ অধিকার, রাজস্ব ও নিজস্ব ভূসম্পত্তি অনেক পরিমাণে বিলাইয়া দিয়াছেন, সুতরাং এখন তাঁহাকে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই সাধারণের ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে; সুতরাং এ সময়ে রাজার পক্ষে পার্লিয়ামেণ্টের ক্ষমতার যে পরিমাণ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই।

অতএব ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ইউরোপের অন্যান্য দেশের অবস্থা হইতে একেবারে বিভিন্ন। টিউডরদিগের যথেচ্ছাচারী শাসন এবং বিশুদ্ধ রাজতন্ত্রের রীতিমত প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও এখানে নবজাগ্রত স্বাতন্ত্র্যভাবের একটা স্থির অবলম্বন ছিল।

সুতরাং এই সময় ইংলণ্ডে দুইটি জাতীয় অভাব অনুভূত হইতেছিল;—একদিকে পূর্ব্বারব্ধ রিফর্মেশনের মধ্যে যথার্থ ধর্ম্মবিপ্লব ও ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য সাধন; অন্য দিকে অভ্যুত্থানশীল রাজতন্ত্রের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। এই দুই অভাব মোচনের জন্য দুই দিক্ হইতে চেষ্টা আরব্ধ হইল। এবং উভয় চেষ্টা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের

আনুকূল্য করিতে লাগিল। যে পক্ষ ধর্ম্মসংস্কার চাহেন, তাঁহারা রাজা ও বিশপের বিরুদ্ধে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মবিবেক রক্ষার্থে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দলকে আহ্বান করিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দল সেইরূপ পিউরিটান ধর্ম্মসংস্কারকদলের সাহায্য প্রার্থনা করিল। রাষ্ট্রশাসন ও ধর্ম্মশাসন, উভয় ক্ষেত্রেই এখন রাজশক্তি একেশ্বরভাবে প্রভুত্ব করিতেছে; উভয় ক্ষেত্র হইতেই এই যথেচ্ছতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য উভয় পক্ষীয় সংস্কারকগণ একত্র মিলিত হইল। ইংরেজ বিপ্লবের ইহাই মূল ও তাৎপর্য্য।

স্বাতন্ত্র্যসাধন বা স্বাতন্ত্র্যরক্ষাই তাহা হইলে এ বিপ্লবের সার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মসংস্কারকদিগের নিকট স্বাধীনতা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র; রাষ্ট্রীয় সংস্কারকদিগের নিকট স্বাধীনতাই উদ্দেশ্য। কিন্তু উভয় পক্ষেরই আপাততঃ স্বাধীনতাই আবশ্যক; এবং এ লক্ষ্য সাধনে উভয়ে একযোগে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বিশপ্-পক্ষ ও পিউরিটান্ পক্ষের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন যথার্থ বিরোধ ছিল না; ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া কলহ অতি সামান্যই ছিল; মতভেদ যে একেবারেই ছিল না, তাহা নহে, তবে এ সংঘর্ষে সে সমস্ত মতভেদের প্রাধান্য ছিল না। বিশপ্‌গণের হস্ত হইতে কার্য্যতঃ স্বাধীনতা লাভ করাই পিউরিটানদিগের উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই তাহারা লড়াই করিয়াছিল। আর এক দল ছিল প্রেস্‌বিটিরিয়ান সম্প্রদায়; ইহাদের উদ্দেশ্য একটা নূতন ধর্ম্মশাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা, তাহার মত ও বিশ্বাস বাঁধিয়া দেওয়া, শাসনবিধি গঠন করা ও বিধিবিধান প্রণয়ন করা। কিন্তু যথাশক্তি প্রয়াস সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাহারা ইচ্ছানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। বিশপ্‌দিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থ প্রধান সহায় রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কারকদলের সম্মতি ব্যতিরেকে কার্য্য

করিতে অসমর্থ হইয়া ইহারাও স্বাধীনতাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া লইল। সুতরাং নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকল পক্ষেরই লক্ষ্য হইল স্বাধীনতা লাভ, সকলেই এক আন্দোলনে যোগ দিল। সমগ্রভাবে ধরিতে গেলে, ইংরেজী বিপ্লব সারতঃ রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব; তবে এ বিপ্লব সাধিত হইল এক ধর্ম্মপ্রধান যুগে এক ধর্ম্মপ্রবণ জাতির মধ্যে। ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মোন্মাদনা ছিল এ বিপ্লবের প্রধান অস্ত্র; কিন্তু ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রনৈতিক,—স্বাধীনতালাভ ও যথেচ্ছতন্ত্র শক্তির উচ্ছেদ সাধন, এই ছিল ইহার সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য।

এখন আমি এই বিপ্লবের বিভিন্ন দিক্ ও প্রধান প্রধান পক্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া, ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের সহিত ইহার সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিব, সে ইতিহাসে ইহার স্থান ও প্রভাব নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। অবশেষে তথ্যসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বিশুদ্ধ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তার সংগ্রামে ইহাই প্রথম অস্ত্রোদ্যম।

এই মহাসঙ্কটে তিনটি প্রধান প্রধান দলের অভ্যুত্থান ঘটিল। তিনটি বিভিন্ন বিপ্লব ইহার অন্তর্ভুক্ত, ইহারা একের পর এক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল। প্রত্যেক বিপ্লবের মধ্যে এবং প্রত্যেক বিপ্লবের প্রত্যেক পক্ষে দুইটি করিয়া দল একযোগে কার্য্য করিতেছে দেখা যায়—একদিকে ধর্ম্মসংস্কারের দল, অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দল। রাষ্ট্রীয় দল নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে, ধর্ম্মের দল পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু উভয়ের পক্ষে উভয়েরই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এই বিপ্লবব্যাপারের যুগলপ্রকৃতি প্রত্যেক ধাপে প্রত্যেক অবস্থায় মুদ্রিত হইয়া গেল।

প্রথম যে দলের অভ্যুত্থান হইল, তাহারা বৈধসংস্কারের দল। অন্যান্য

সমস্ত দল তখন এই দলের পতাকানিম্নেই সমবেত হইয়াছিল। যখন ইংরেজী বিপ্লব আরম্ভ হইল, ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে লং পার্লিয়ামেণ্ট যখন সমবেত হইল, তখন সকলেই বলিত এবং অনেকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিত যে, বৈধ সংস্কারই যথেষ্ট হইবে, সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তাঁহারা মনে করিতেন, সমস্ত প্রকার অন্যায় অনাচার নিরাকরণ পক্ষে এবং জনসাধারণের ইচ্ছানুরূপ শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে যাহা আবশ্যক, দেশের প্রাচীন বিধিবিধান ও রীতিনীতির মধ্যেই তাহা আছে। যখনই অবৈধভাবে কর সংগ্রহ বা কারাদণ্ডের যথেচ্ছ প্রয়োগ ঘটিয়াছে, অর্থাৎ যখনই দেশের সুপরিজ্ঞাত বিধিবিধানের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য হইয়াছে, তখনই এই বৈধসংস্কারের দল উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ করিয়াছে ও অন্তরের সহিত বাধা দিতে চাহিয়াছে। এ দলের সমস্ত চিন্তা ও মতামতের মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, রাজাই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা; রাজশক্তির সমস্ত অধিকার। অবশ্য তাঁহাদের অন্তরের নিগূঢ় সংস্কার জানাইয়া দিয়াছিল যে, এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য বা নিরাপদ নহে; সেই জন্য তাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেন না। কিন্তু চাপিয়া ধরিলে তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন যে, রাজশক্তি একটা অমানুষী শক্তি, ইহা সমস্ত শাসনসংযমনের উর্দ্ধে,—এবং যখনই আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তাঁহারা ইহার রক্ষার্থে উদ্যত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, রাজশক্তি তত্ত্বতঃ সমস্ত বিধিবিধানের অতীত হইলেও কার্য্যতঃ কতকগুলি নিয়মপদ্ধতি মানিয়া চলিতে বাধ্য; ইহার ব্যাপ্তি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ; এবং এই সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতি ও সীমারেখা প্রাচীন ম্যাগনাচার্টা, তদনুমোদনকারী পরবর্ত্তী বিধানসমূহ এবং দেশের প্রাচীন বিধিবিধানের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

এই হইল এ দলের রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা। ধর্ম্মবিষয়ে ইঁহাদের মত ছিল যে, বিশপ্‌গণের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, তাঁহাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা অতিমাত্র, তাঁহাদের শাসনাধিকার অত্যন্ত ব্যাপক,—এই ক্ষমতার পরিচালন নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। তথাপি এই বৈধসংস্কারের দল দৃঢ়তার সহিত বিশপ্‌তন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিতেন; এবং তাহাও শুদ্ধ ধর্ম্মশাসনতন্ত্র হিসাবে নহে, ধর্ম্মক্ষেত্রে রাজশক্তির কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিবার প্রধান উপায় ও অবলম্বনস্বরূপ তাঁহারা বিশপ্‌তন্ত্রের সহায়তা করিতে লাগিলেন। রাষ্ট্রশাসনক্ষেত্রে রাজার কর্ত্তৃত্বশক্তি সুপরিচিত প্রাচীন বিধিপদ্ধতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হউক এবং ধর্ম্মশাসনক্ষেত্রে বিশপ্‌তন্ত্র কর্ত্তৃক রাজশক্তির কর্ত্তৃত্বাধিকার বিবৃত হউক,—বৈধসংস্কারপক্ষের এই দুই মূলনীতি। এ পক্ষের নেতা ছিলেন ক্লারেণ্ডন, কোল্‌পেপার, লর্ড কাপেল এবং স্বাতন্ত্র্যনীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক লর্ড ফক্‌লাণ্ড, যিনি স্বাধীনচেতা সমস্ত অভিজাতবর্গের নেতা ছিলেন।

এই দলের পশ্চাতে আর এক দলের অভ্যুত্থান হইল; তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রবিপ্লবের দল বলিব। তাঁহাদের মতে প্রাচীন বিধিবিধান ও অধিকারপত্রাদি স্বাধীনতার পক্ষে যথেষ্ট নহে; শুদ্ধমাত্র নিয়মপদ্ধতিতে নহে, বাস্তব শাসনব্যাপারে একটা মহৎ পরিবর্ত্তন, একটা রীতিমত বিপ্লব আবশ্যক; রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিসভার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব অপহরণ করিয়া কমন্সসভাকেই রাষ্ট্রশাসনে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক; এই কমন্স্‌সভা ও ইহার নেতৃবর্গের হস্তেই যথার্থ শাসনভার ন্যস্ত হওয়া উচিত। এ পক্ষ কিন্তু এত পরিষ্কার করিয়া নিজেদের মতামত বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু ইঁহাদের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা চেষ্টার এই দিকেই গতি। বিশুদ্ধ রাজতন্ত্রের কর্ত্তৃত্বাধিকারের পরিবর্ত্তে জনবৃন্দের

প্রতিনিধিস্বরূপ কমন্সসভার কর্তৃত্বাধিকারেই ইহাঁদিগের আস্থা ছিল। জনসাধারণই যে দেশের প্রকৃত রাজা, এই বিশ্বাস তাঁহাদের রাষ্ট্রনৈতিক মতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। এ বিশ্বাসের সম্যক্ তাৎপর্য্য বা সুদূর পরিণাম ইঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু কমন্স্‌সভাই যে দেশের প্রকৃত রাজা, এই আকারে তাঁহারা এ বিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রেস্‌বিটিরিয়ান নামক একদল ধর্ম্মসংস্কারক এই রাষ্ট্রবিপ্লবদলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবপক্ষ রাষ্ট্রশাসনক্ষেত্রে যেরূপ বিপ্লব আনিতে চাহিয়াছিলেন, প্রেস্‌বিটিরিয়ানগণ ঠিক সেইরূপ এক বিপ্লব আনিতে চাহিয়াছিলেন। একদল যেমন কমন্সসভার হস্তে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে চাহিতেন, অপর পক্ষ সেইরূপ ধর্ম্ম-শাসনের সমস্ত অধিকার উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত ধর্ম্মসভাসমূহের হস্তে ন্যস্ত করিতে চাহিতেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লব অপেক্ষা এই প্রেস্‌বিটিরিয়ান্ ধর্ম্মবিপ্লব সতেজে ও সম্পূর্ণতার সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছিল; কারণ, ইহা প্রাচীন ধর্ম্মশাসনতন্ত্রের মূলনীতি ও বাহ্য গঠন, উভয়ই পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবপক্ষ কেবলমাত্র প্রাচীন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিল, প্রতিষ্ঠানসমূহের বাহ্য আকার বা গঠন পরিবর্ত্তন করিতে চাহে নাই।

এ দিকে রাষ্ট্রীয় দলের সকলেই কিন্তু প্রেস্‌বিটিরিয়ান্ চর্চ্চ-গঠন-পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন না। হাম্প্‌ডেন্, হোল্‌স্ প্রভৃতি অনেকে বোধ হয় বিশপ্‌তন্ত্রের ক্ষমতা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন; বিশপ্‌তন্ত্র যদি কেবল ধর্ম্মশাসনসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত ও মানুষের ব্যক্তিগত বিবেক বিশ্বাসকে আরও কিছু স্বাধীনতা দিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আর কোনও অভিযোগ থাকিত না।

আর এক তৃতীয় দলের উদ্ভব হইল ; তাঁহাদের দাবীদাওয়া আরও সুদূরগামী। ইঁহারা বলিতে লাগিলেন, শুদ্ধমাত্র শাসনতন্ত্রের বাহ্য আকার নহে, শাসনতন্ত্রেরই আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক; সমগ্র শাসনপদ্ধতিই অপকৃষ্ট। ইঁহারা ইংলণ্ডের অতীত যুগসমূহের ইতিহাস অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন, প্রাচীন জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদি ও জাতীয় স্মৃতি অবহেলার সহিত বর্জ্জন করিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য, বিশুদ্ধ তত্ত্বানুসারে এক নূতন শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। ইঁহারা যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা শুদ্ধমাত্র শাসনপদ্ধতির সংস্কার নহে, তাহা একটা সমাজবিপ্লব। ইতিপূর্ব্বেই যে রাষ্ট্রবিপ্লবদলের কথা বলিয়াছি, তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্ট বা জনসভার সহিত রাজশক্তির সম্পর্কবিষয়ে কতকগুলি গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন ; তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের এবং বিশেষ করিয়া কমন্স্‌সভার ক্ষমতা বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন ; উর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারীনিয়োগ ও সাধারণ শাসনব্যাপারে চরম নেতৃত্ব পার্লিয়ামেণ্টের হাতে তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সংস্কারসঙ্কল্প ইহার অধিক অগ্রসর হয় নাই। দেশের প্রতিনিধিনির্ব্বাচনপদ্ধতি, বিচারপদ্ধতি, পৌর-শাসনপদ্ধতি ও সরকারী কার্য্যনির্ব্বাহপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিবার কল্পনা তাঁহাদের মনে আসে নাই। কিন্তু এই নূতন গণতন্ত্রবাদীর দল এই সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল এবং এই আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিল। এক কথায় ইঁহারা কেবল সরকারী কার্য্যনির্ব্বাহপদ্ধতি নহে, সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের পরস্পর সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত অধিকারের যথাযোগ্য বণ্টন, এ বিষয়েও সংস্কার সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত দলের ন্যায় এ দলেও ধর্ম্মসংস্কারক ও রাষ্ট্রসংস্কারকের

সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় পক্ষে ছিলেন লড্‌লো, হারিংটন, মিল্টন প্রভৃতি যথার্থ তত্ত্বনৈতিক গণতন্ত্রবাদীর দল। ইহাঁদের সহিত আয়ারটন, ক্রম্‌ওয়েল, ল্যাম্বার্ট প্রভৃতি প্রধান সেনানায়কগণ সম্মিলিত হইলেন; ইঁহারা কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরেই গণতন্ত্রবাদী, তত্ত্বের খাতিরে নহে; ইঁহারা সকলেই অল্পাধিকপরিমাণে আন্তরিকতার সহিতই কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণা ও অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনের তাড়নায় পরিচালিত হইয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রীয় দলের চারিদিকে গণতন্ত্রবাদী ধর্ম্মসংস্কারকগণ সম্মিলিত হইলেন। যে সমস্ত ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি যীশুখৃষ্ট ভিন্ন অন্য কোন বৈধ কর্ত্তৃশক্তি মানে না,এবং তাঁহার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার নির্ব্বাচিত মহাপুরুষ ভিন্ন আর কাহারও শাসন মানিতে চাহে না,—তাহারা সকলেই এই দলে আসিয়া জুটিল। সর্ব্বশেষে কতকগুলি নিকৃষ্টতর উচ্ছৃঙ্খল যুক্তিবাদী ও অদ্ভুতকল্পনাবিষ্ট লোক, কেহ বা যথেচ্ছাচারপ্রবর্ত্তনের আশায়, কেহ বা সম্পত্তিসাম্য ও সার্ব্বজনীন নির্ব্বাচনাধিকার প্রতিষ্ঠার আশায় এই দলের নেতৃত্ব স্বীকার করিল।

দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সংঘর্ষের পর ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল, এই সমস্ত দলই একে একে বিফলমনোরথ হইয়াছে; তাহারা নিজেরাও ইহা অনুভব করিল, সর্ব্বসাধারণেরও এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস হইল। বৈধসংস্কারের দল দেখিল, প্রাচীন বিধিবিধান, প্রতিষ্ঠানপদ্ধতি সমস্তই অবজ্ঞাত ও পদদলিত হইল, এবং চারিদিকে নবীকরণের স্রোত বহিতে লাগিল। রাষ্ট্রীয় সংস্কারের দল পার্লিয়ামেণ্টের রীতিপদ্ধতি নূতনভাবে প্রয়োগ করিয়াই সংস্কার সাধন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহারা দেখিল, তাহাদের এই নূতন উদ্যমের ফলে সে রীতিপদ্ধতি ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাজপক্ষীয় ও প্রেস্‌বিটিরিয়ান্‌পক্ষীয় সভ্যগণ কমন্সসভা হইতে একে

একে বিতাড়িত হওয়ার ফলে, সামান্য কয়েকজন মাত্র সভ্য অবশিষ্ট রহিল; তাহারাও আবার জনসাধারণের ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র হইয়া পড়িল, শাসনভার পরিচালন করিবার কোন যোগ্যতা তাহাদের ছিল না। গণতন্ত্রবাদী দল অপেক্ষাকৃত কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয়, তাহারাই যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিল ও আধিপত্য লাভ করিল। কমন্স্‌সভায় এখন ৫০।৬০ জন মাত্র সভ্য অবশিষ্ট, এবং তাহারা সকলেই গণতন্ত্রবাদী। তাহারা ন্যায়তঃ বিবেচনা ও ঘোষণা করিতে পারিত যে, তাহারাই দেশের অধিপতি হইয়াছে। কিন্তু দেশ তাহাদিগকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিল, তাহারা কোথাও তাহাদিগের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। কি সেনামধ্যে, কি জনসমাজে, কোথাও তাহারা কার্য্যকরী প্রতিপত্তি লাভ করিল না। এখন আর সমাজে বন্ধনও রহিল না, শান্তি শৃঙ্খলাও রহিল না। দেশে এখন আর ন্যায়বিচার নাই; যাহা আছে, তাহা ন্যায়বিচার নহে, দলবুদ্ধিপ্রণোদিত পক্ষপাতদুষ্ট কতকগুলি খামখেয়ালী হুকুম। সমাজের মধ্যে যেরূপ শান্তি শৃঙ্খলা ছিল না, বাহিরে বড় বড় রাজপথে সেইরূপ উপদ্রবের সীমা ছিল না; চারিদিকে চৌরভয় ও দস্যুভয়। একদিকে নৈতিক অরাজকতা, অন্য দিকে বাস্তব অরাজকতা, সর্ব্বত্রই অরাজকতার প্রাদুর্ভাব। এ অরাজকতা দমন করিতে কমন্স্‌সভারও কোন ক্ষমতা ছিল না, গণতন্ত্র মন্ত্রণাসভারও কোন ক্ষমতা ছিল না।

এইরূপে তিনটি প্রধান দলই একে একে এই বিপ্লবব্যাপারে নেতৃত্ব লাভ করিল, নিজ নিজ জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে দেশ শাসন করিবার সুযোগ পাইল, কিন্তু কোন দলই কৃতকার্য্য হইল না; তিন দলেরই চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল; তাহাদের আর কিছু করিবার ক্ষমতা

রহিল না। বস্থয়ে বলেন,—"এমন সময় একজন লোক পাওয়া গেল, যিনি বুদ্ধিবিবেচনা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টির বলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা অদৃষ্টের হাতে ছাড়িয়া দেন না।" এ উক্তি কিন্তু ভ্রমপূর্ণ, ইতিহাস ইহার সমর্থন করে না। ক্রম্‌ওয়েল যেরূপ ভাগ্যের হস্তে সমস্ত অর্পণ করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কেহ করে নাই; এত দুঃসাহসিকতার সহিত লক্ষ্য সঙ্কল্প স্থির না করিয়া অদৃষ্টের স্রোতে গা ভাসাইয়া এমন ভাবে আর কে অগ্রসর হইয়াছে? তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা পরিধি ছিল না। প্রতিদিনের প্রতি ঘটনা হইতে একটা না একটা উন্নতির উপায় বাহির করিয়া লইবার এবং আকস্মিক সুযোগ কাজে লাগাইবার অদ্ভুত কৌশল তাঁহার আয়ত্ত ছিল। এ ক্ষমতা ক্রম্‌ওয়েলের যেরূপ ছিল, তাঁহার মত অবস্থার অন্য কোন লোকের সেরূপ দেখা যায় নাই। এ বিপ্লবের সমস্ত অবস্থা-বিপর্য্যয়ের পক্ষেই তিনি উপযোগী ছিলেন; ইহার আরম্ভেও তাঁহার যেরূপ উপযোগিতা ছিল, শেষেও সেইরূপ ছিল। প্রথমে তিনি ছিলেন বিদ্রোহের নেতা, অরাজকতার উত্তেজক, ইংরেজ বিপ্লবকারীদিগের মধ্যে দীপ্ততম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। পরে যখন বিপ্লবের বিরুদ্ধে স্রোত ফিরিতে লাগিল, শান্তিশৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সমাজের পুনর্গঠন ও নিয়ন্ত্রণের সময় আসিল, তখন সে কার্য্যের জন্যও ক্রম্‌ওয়েল প্রস্তুত। সাধারণতঃ বিপ্লবব্যাপারের যে দুই অংশ দুই বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয়, ক্রম্‌ওয়েল এখানে একাকী সমস্ত সম্পন্ন করিলেন। ক্রম্‌ওয়েলের সহিত মিরাবোর তুলনা চলে না বলিলেই হয়; তাঁহার বাগ্মিতা ছিল না, এবং অত্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠ হইলেও লং পালিয়ামেণ্টের প্রথম কয়েক বৎসর তিনি কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু এ কথা বলা যায় যে, তিনি একাধারে দাঁতোঁ এবং বোনাপার্ট। শাসনশক্তির উচ্ছেদসাধনে তিনি যতটা সহায়তা করিয়াছিলেন,

ততটা আর কেহ করে নাই। তিনিই আবার সেই শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন; কারণ, এ শক্তি কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠা বা পরিচালন করিতে হয়, তাহা তিনিই জানিতেন, আর কেহ জানিত না। এক-জনকে ত শাসনকার্য্য চালাইতে হইবে; আর সকলে অপারগ হইল, তিনিই কেবল কৃতকার্য্য হইলেন। এই অধিকারের বলেই তাঁহার কর্ত্তৃত্বলাভ। একবার যখন তিনি শাসনতন্ত্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন, তখন আবার সেই দুঃসাহসী দুরাকাঙ্ক্ষ অদম্যগতি ক্রম্‌ওয়েল অসাধারণ সুবুদ্ধি, সতর্কতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন শক্তিলাভের দিকে তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল, স্বীয় মস্তকে ইংলণ্ডের রাজমুকুট স্থাপন করতঃ স্বপরিবারের মধ্যে ইহা চিরস্থায়ী করিবার জন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই শেষোক্ত অভিলাষটি তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন; কারণ, তিনি সময় থাকিতে ইহার বিপদ্ দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং যদিও তিনি কার্য্যতঃ নিরবচ্ছিন্ন শাসনশক্তি পরিচালন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বরাবর জানিতেন যে, তাঁহার কালের যুগধর্ম্ম ইহার বিরোধী। জানিতেন, যে বিপ্লবে তিনি যোগ দিয়াছেন এবং যাহার সমস্ত ভাগ্যবিপর্য্যয় তিনি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, যথেচ্ছতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। জানিতেন যে, ইংলণ্ডের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা—দেশ পার্লিয়ামেণ্ট দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টরীতি অনুসারে শাসিত হউক। সেই জন্য তিনি স্বভাবতঃ এবং বস্তুতঃ যথেচ্ছতন্ত্রপরায়ণ হইলেও পার্লিয়ামেণ্ট গঠন ও পার্লিয়ামেণ্টরীতি প্রবর্ত্তনের ভার লইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনবরত সকল দলকেই আহ্বান করিয়াছিলেন; কখনও ধর্ম্মোৎসাহীর দল, কখনও গণতন্ত্রবাদীর দল, কখনও প্রেস্‌বিটিরিয়ানদল, কখনও সেনা-নায়কদল লইয়া তিনি পার্লিয়ামেণ্ট গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন।

তাঁহার সহিত একযোগে কাজ করিতে সমর্থ বা ইচ্ছুক, এরূপ একটি পার্লিয়ামেণ্ট গঠন করিবার জন্য তিনি সর্ব্ববিধ উপায়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল; প্রত্যেক দলই পালিয়ামেণ্টে আসন গ্রহণ করিবামাত্র তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধিকার কাড়িয়া লইয়া নিজেরাই দেশ শাসন করিতে চাহিল। তাঁহার নিজের স্বার্থসাধন ও নিজের ব্যক্তিগত কামনাতৃপ্তির চিন্তাই যে তাঁহার মুখ্য চিন্তা ছিল না, এ কথা আমি বলি না। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে. তিনি যদি কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে পরদিবসই তাঁহাকে পুনরায় সে ভার গ্রহণ করিতে হইত। কি পিউরিটান, কি রাজতন্ত্রী, কি গণতন্ত্রী, কি সেনানায়ক, ক্রম্ওয়েল ব্যতীত অন্য কেহই ন্যায় ও শৃঙ্খলাসহকারে দেশশাসন করিতে সমর্থ ছিল না। তাহার প্রমাণও দেখা গিয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট বা তদন্তর্ভুক্ত দলসমূহের হস্তে সাম্রাজ্যভার তুলিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না; কারণ, এ অধিকার রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাহাদের একেবারেই ছিল না। ক্রম্ওয়েলের তাহা হইলে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইল;—তিনি এমন এক পদ্ধতিতে দেশ শাসন করিতে লাগিলেন, যে পদ্ধতি দেশের অভিলাষ-বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি জানিতেন। তিনি যে শক্তি পরিচালন করিতেন, প্রয়োজনের তাড়নায় লোকে তাহা কার্য্যতঃ মানিয়া লইল বটে, কিন্তু কেহ মনের সহিত তাহা স্বীকার করিত না। ক্রম্ওয়েলের শাসনকে কোন দলই চরম ব্যবস্থাস্বরূপ মানিয়া লইল না। রাজতন্ত্রী বলুন, প্রেস্বিটিরিয়ান বলুন, গণতন্ত্রী বলুন, এমন কি, যে সেনাসঙ্ঘের মধ্যে ক্রম্ওয়েলের বিশেষ প্রতিপত্তি, তাহারাও—সকল দলেরই দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ক্রম্ওয়েলের আধিপত্য ক্ষণস্থায়ী। মূলতঃ তিনি কখনই লোকের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই; লোকে তাঁহাকে উপস্থিত প্রয়োজন-

সাধনের ক্ষণিক উপায়মাত্র মনে করিত। ইংলণ্ডের প্রোটেক্টর বা রক্ষক, সারা জীবন ধরিয়া নিজের আধিপত্য রক্ষার্থে বলপ্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন দলই তাঁহার মত শাসন করিতে পারিত না, অথচ কোন দলই তাঁহাকে শাসনকর্ত্তারূপে চাহে নাই। একযোগে সমস্ত দলই তাঁহাকে অনবরত আক্রমণ করিতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর পর শাসনশক্তি অধিকার করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র গণতন্ত্রিগণেরই ছিল। তাহারাই শাসনভার গ্রহণ করিল, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাহারা অকৃতকার্য্য হইল। তাহাদিগের মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল,তাহা নহে। এই সময়ে প্রকাশিত মিল্টন-রচিত একখানি উদ্দীপনাপূর্ণ পুস্তিকার নাম—"A Ready and Easy Way to Establish a Commonwealth"—অর্থাৎ "সাধারণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার একটি সুপ্রস্তুত ও সরল উপায়।" ইহা হইতেই বুঝিবেন, ইঁহারা কিরূপ উৎসাহান্ধ ছিলেন। শীঘ্রই তাঁহারা পুনরায় এমন অবস্থায় পড়িলেন যে, শাসনভার পরিচালন করা তাঁহা-দিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সমস্ত ইংলণ্ড তখন যে ঘটনার জন্য উন্মুখ, মঙ্ক্ তাহা নিষ্পন্ন করিবার ভার লইলেন। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল।

ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্টবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একটা যথার্থ জাতীয় ঘটনা। লোকে দেখিল, একদিকে ইহা একটা প্রাচীন শাসনতন্ত্র, প্রাচীন রীতি-পরম্পরা, দেশের প্রাচীন স্মৃতির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা ; অন্য দিকে আবার তখন ইহা নূতনও বটে, অনতিপূর্ব্ব-কালমধ্যে ইহার কোন পরীক্ষাও হয় নাই, ইহার দোষগুণও অনুভূত হয় নাই। গত বিংশ বৎসরের মধ্যে অন্য সর্ব্ববিধ শাসনতন্ত্রের পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাদের অক্ষমতা ও অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রতি লোকচিত্তে অবজ্ঞা

উৎপন্ন হইয়াছে, কেবলমাত্র রাজতন্ত্রেরই পরীক্ষা হয় নাই, তখন রাজতন্ত্রই কেবল অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়ে নাই। এই দুই কারণে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতি লোকচিত্ত অনুকূল ছিল। চরমপন্থী দলসমূহের অবশিষ্টাংশ ভিন্ন ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত আর কেহ ছিল না। জনসাধারণ উৎসাহের সহিত ইহার সপক্ষে মিলিত হইল। দেশ তখন অন্তরের সহিত চাহে একটা বৈধশাসনপদ্ধতির প্রবর্ত্তন; এবং দেশের মতে তখন রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাহার একমাত্র উপায়। রাজতন্ত্রও তাহাই প্রতিজ্ঞা করিল এবং লোকসমক্ষে বৈধ-শাসনপদ্ধতিরূপে দেখা দিতেই যত্নবান্ হইল।

দ্বিতীয় চার্লসের পুনরাগমনের পর প্রথম যে রাজতন্ত্রী দল রাজ্য পরিচালনভার গ্রহণ করিল, তাহারা পূর্ব্বোক্ত বৈধ সংস্কারের দল, প্রধান মন্ত্রী ক্লারেণ্ডন তাহাদিগের সুযোগ্য নেতা। আপনারা জানেন যে, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্লারেণ্ডনই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ইংলণ্ডে তখন তাঁহারই প্রকৃষ্ট প্রভাব। ক্লারেণ্ডন ও তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন নীতিপদ্ধতি অনুসারে কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। সে পদ্ধতিতে রাজশক্তির শাসনাধিকার অখণ্ড; তবে এ অধিকার বৈধ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে হইবে, কর প্রবর্ত্তন বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক এবং প্রজার ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে বিচারালয়-সমূহ কর্ত্তৃক এ অধিকার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; কিন্তু যথার্থ শাসন ব্যাপারে রাজশক্তির প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সেখানে পার্লিয়ামেণ্টের, বিশেষতঃ কমন্সসভার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেও রাজার অভিমতই চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে। অন্যান্য বিষয়ে এ দল বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা ও শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন, দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে যথেষ্টরূপ সচেতন ছিলেন, দেশের গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, এবং তাঁহাদের চিন্তা চেষ্টায়

সম্মানযোগ্য চরিত্র-গাম্ভীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। সপ্তবর্ষব্যাপী ক্লারেণ্ডন-শাসনের প্রকৃতি ছিল এইরূপ।

কিন্তু যে সব তত্ত্ব এ শাসনের মূল ভিত্তি, অর্থাৎ রাজার অখণ্ড কর্ত্তৃত্বাধিকার এবং পার্লিয়ামেণ্টের মতামতের ঊর্দ্ধে শাসনশক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা, এ সব তখন প্রসার প্রতিপত্তি হারাইয়াছে। যদিও রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম প্রথম একটা প্রতিক্রিয়ার স্রোত বহিয়াছিল, তথাপি বিংশবর্ষব্যাপী পার্লিয়ামেণ্ট-শাসন ও রাজপ্রতিকূলতার ফলে এ সব প্রাচীন তত্ত্ব একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। রাজতন্ত্রী দলের মধ্যভাগে শীঘ্রই এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হইল। উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত, ইন্দ্রিয়বিলাসী যথেচ্ছাচারিগণ, তৎকালপ্রচলিত চিন্তাধারা অনুসারে ধরিয়া লইলেন যে, কমন্সসভার হস্তেই শাসনশক্তি নিহিত; বৈধ শাসনশৃঙ্খলার দিকেও তাঁহাদের আগ্রহ ছিল না, রাজার অখণ্ড অধিকারের জন্যও ব্যগ্রতা ছিল না, তাঁহারা কেবল নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ব্যস্ত ছিলেন, এবং যখনই তাঁহারা প্রভাব প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ দেখিতেন, তখনই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হইতেন। জাতীয় অসন্তোষের দলের সহিত এই দল যোগদান করিল, এবং ক্লারেণ্ডন পদচ্যুত হইলেন।

এইরূপে এক নূতন শাসনপদ্ধতির আবির্ভাব হইল; এ পদ্ধতির প্রবর্ত্তক রাজতন্ত্রী দলের একাংশ; কতকগুলি ইন্দ্রিয়পরায়ণ যথেচ্ছাচারী লইয়া "কাবাল" নামক মন্ত্রিসভা এবং পরবর্ত্তী আরও অনেক মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। তাহারা নীতি, বিধি, অধিকার গ্রাহ্য করিত না; ন্যায় বা সত্যের ধার ধারিত না; প্রতি ক্ষেত্রে তাহারা কেবল অভীষ্টসিদ্ধির উপায় অনুসন্ধান করিত। যেখানে কমন্সসভার সম্মতির উপরেই কৃতকার্য্যতা নির্ভর করিতেছে, সেখানে তাহারা কমন্সসভার মতে মত

দিয়াছে। আবার যেখানে দেখিয়াছে, কমন্সসভার মত অগ্রাহ্য করাই সুবিধাজনক, সেখানে তাহাই করিয়াছে, এবং পরদিন আবার ইহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে। কোন দিন উৎকোচাদি দূষিত উপায় অবলম্বন করিয়াছে, কোন দিন বা তোষামোদ দ্বারা দেশের চিত্ত জয় করিয়াছে। দেশের সাধারণ স্বার্থ বা গৌরব বা মর্য্যাদা, এ সকল দিকে তাহাদের দৃষ্টি ছিল না। এক কথায় তাহাদের শাসনপদ্ধতি নিরতিশয় স্বার্থপরতা-দুষ্ট ও দুর্নীতিকলঙ্কিত ছিল; কোন প্রকার সাধারণ মত বা সাধারণ নীতির সহিত এ পদ্ধতির কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আসলে বাস্তব শাসনব্যাপারে ইহারা অত্যন্ত চতুরবুদ্ধি ও উদারতা দেখাইয়াছিল। কাবাল মন্ত্রিসভা, ডান্‌বীর মন্ত্রিসভা, এবং ১৬৬৭ হইতে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র ইংরেজ শাসনতন্ত্রের এইরূপ প্রকৃতি ছিল। ইহার দুর্নীতি সত্ত্বেও, সাধারণ নীতি ও দেশের প্রকৃত স্বার্থের প্রতি অবজ্ঞা সত্ত্বেও এ শাসনপদ্ধতি ক্লারেণ্ডন-শাসনপদ্ধতি অপেক্ষা লোকপ্রিয় ছিল। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, ইহা অপেক্ষাকৃত কালোপযোগী ছিল, ইহারা লোকসাধারণের মনোভাব আরও ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল। ক্লারেণ্ডনের শাসনপদ্ধতি লোকের নিকট যেরূপ অতি প্রাচীন ও অদ্ভুত বোধ হইত, এ পদ্ধতি সেরূপ ছিল না; এবং যদিও ইহা দেশের অধিকতর ক্ষতি করিল, তথাপি ইহা দেশের পক্ষে অধিকতর মনোমত হইল। তথাপি এমন একটা সময় আসিল, যখন দুর্নীতি, নীচতা, সাধারণের অধিকার লঙ্ঘন ও মর্য্যাদাহানির মাত্রা এতদূর বাড়িয়া গেল যে, জনসাধারণের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা আর সম্ভব হইল না। এই উচ্ছৃঙ্খল শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কমন্সসভার মধ্যেই একটি জাতীয় স্বদেশসেবকের দল গঠিত হইয়াছিল। রাজা স্থির করিলেন, এই দলের প্রধান নেতাদিগকে মন্ত্রিসভায় আহ্বান করিয়া

লইবেন। তখন তাঁহারা আসিয়া শাসনভার পরিচালনে নিযুক্ত হইলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন লর্ড এসেক্স, যাঁহার পিতা অন্তর্বিগ্রহের সময় পার্লিয়ামেণ্ট-সেনার অধিনায়ক ছিলেন; লর্ড রসেল; এবং লর্ড শাফ্‌ট্‌স্‌-বেরী, যিনি সদ্‌গুণ হিসাবে এতদুভয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও রাষ্ট্রনৈতিক পারদর্শিতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। জাতীয় দল শাসনকার্য্যের ভার পাইলেন বটে, কিন্তু যোগ্যতা দেখাইতে পারিলেন না। তাঁহারা জানিতেন না, কি করিয়া দেশের চিত্তশক্তির আনুকূল্য লাভ করিতে হয়; কেমন করিয়া রাজার, বা রাজসভার, বা অন্য যে কোন পক্ষের সম্পর্কে ইঁহারা আসিয়াছেন, তাহাদের স্বার্থ ও অভীষ্ট সম্বন্ধে কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। কি রাজা, কি প্রজা, কাহারও মনে তাঁহাদের যোগ্যতা বা উত্তম সম্বন্ধে ভাল ধারণা হইল না। অল্পকালের জন্য ক্ষমতা পরিচালন করিয়াই তাহারা অকৃতকার্য্য হইল। এ দলের নেতৃবৃন্দের সদ্‌গুণ, তাঁহাদের সাহস ও উদারতা, তাঁহাদের মৃত্যুমহিমা, এ সমস্তের বলে ইতিহাসে তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়াছেন, এবং বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা এ সম্মানের যোগ্য; কিন্তু যে পরিমাণ তাঁহাদের সদ্‌গুণ ছিল, সে পরিমাণ রাষ্ট্রনৈতিক সামর্থ্য ছিল না। প্রভুত্বশক্তি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু কেমন করিয়া এ শক্তি পরিচালন করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানিতেন না; যে আদর্শের জন্য তাঁহারা প্রাণ দিতে জানিতেন, সে আদর্শকে জয়ী করিয়া তুলিবার কৌশল তাঁহারা জানিতেন না। এ চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, তখন এই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের কি অবস্থা দাঁড়াইল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। বিপ্লবের সময় যেমন একে একে সকলবিধ দলের যোগ্যতা পরীক্ষা হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ সকলবিধ দল, সকলবিধ মন্ত্রি-সভার যোগ্যতা পরীক্ষা হইল, এবং সকলেই অকৃতকার্য্য হইল। বিপ্লব-

ঝটিকার পরে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, এখনও দেশের এবং রাজসভার প্রায় সেইরূপ অবস্থা। এখনও সেই একই উপায় অবলম্বিত হইল; ক্রম্‌ওয়েল বিপ্লব-পক্ষের কল্যাণার্থ যাহা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় চাল্‌র্স্‌ রাজশক্তির কল্যাণার্থ তাহাই করিলেন।

দ্বিতীয় চাল্‌র্সের পর তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তখন আবার অখণ্ডাধিকারতত্ত্ব ছাড়া আর এক সমস্যা জুটিল,—ধর্ম্মসমস্যা। দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ যথেচ্ছতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে পোপ-তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠাদান করিতে চাহিয়াছিলেন। বিপ্লবের প্রথম যুগের মত এখনও আবার শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে একযোগে ধর্ম্মযুদ্ধ ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রাম বাধিয়া গেল। অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—তৃতীয় উইলিয়ামের যদি অস্তিত্ব না থাকিত, তিনি যদি তাঁহার ওলন্দাজ সৈন্য লইয়া আসিয়া এ বিবাদ নিরস্ত না করিতেন, তাহা হইলে কি হইত? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহা হইলেও একই পরিণাম ঘটিত। ক্ষুদ্র একটি দল ব্যতীত সমগ্র ইংলণ্ড তখন জেম্‌সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিল, এবং যে আকারেই হউক, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিপ্লব নিশ্চয়ই সাধিত হইত। কিন্তু ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ব্যতীত আরও অনেক মহত্তর কারণ এ ব্যাপারের পশ্চাতে ছিল। ইহা শুধু ইংরেজ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ নহে, ইউরোপীয় ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ। এইখানেই ইংরেজ বিপ্লবের সহিত ইউরোপীয় সভ্যতার সাধারণ স্রোতের সম্মিলন ঘটিল।

ইংলণ্ডে যখন যথেচ্ছতন্ত্র শাসনশক্তির সহিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ধর্ম্মস্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতেছিল, ইউরোপের মহাদেশখণ্ডেও তখন সেইরূপ এক সংঘর্ষ চলিতেছিল। উভয় ক্ষেত্রে অবশ্য স্থান, পাত্র ও আকৃতি লইয়া পার্থক্য ছিল, কিন্তু মূলে এক কারণ হইতেই উভয়

সংঘর্ষের উদ্ভব। চতুর্দ্দশ লুই-প্রবর্ত্তিত নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্র তখন বিশ্বব্যাপী রাজতন্ত্রে পরিণত হইতে চাহিতেছে; অন্ততঃ এরূপ আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল; এবং বাস্তবিকপক্ষে ইউরোপ এ আশঙ্কা অনুভব করিয়াছিল। এ চেষ্টায় বাধা দিবার জন্য ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিকদল মিলিয়া একটি যূথ গঠন করিল, এবং যূথের নেতা হইলেন উইলিয়াম (প্রিন্স্ অব্ অরেঞ্জ)। তিনিই তখন ইউরোপে রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্যবাদী ও ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্যবাদী দলের নেতা। উইলিয়ামের নেতৃত্বে হলাণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট গণতন্ত্র চতুর্দ্দশ লুই-পরিচালিত নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিকূলতার ভার গ্রহণ করিল। রাষ্ট্রসমূহের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা নহে, বাহ্য স্বাধীনতা লইয়াই অবশ্য এ সংঘর্ষের সূচনা। চতুর্দ্দশ লুই ও তাঁহার প্রতিপক্ষীয়গণ ভাবেন নাই যে, ইংলণ্ডে যে সংঘর্ষ চলিতেছে, তাঁহাদের সংঘর্ষ তাহারই রূপান্তর। ইহা দলের সহিত দলের সংগ্রাম নহে, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের সংগ্রাম। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন বা বিপ্লব দ্বারা এ সংঘর্ষ চলে নাই, যুদ্ধবিগ্রহ ও পররাষ্ট্রনীতিকৌশলের সাহায্যে এ সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু মূলে উভয়ত্র একই সমস্যার সমাধান চলিতেছিল।

অতএব যখন দ্বিতীয় জেম্স্ ইংলণ্ডে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যথেচ্ছতন্ত্রের বিরোধ নূতন করিয়া বাধাইলেন, তখন ইউরোপে এই বিরোধ বৃহদাকারে দেখা দিয়াছিল; তখন টেম্সের তীরে এক সঙ্গেই এই দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ শাসননীতির সংঘর্ষ বাধিল। উইলিয়ামের দল এত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল যে, অনেক রাজা বিশেষভাবে স্বাধীনতার পক্ষপাতী না হইয়াও প্রকাশ্য কিংবা গুপ্তভাবে এ দলে যোগ দিতে লাগিলেন। জার্ম্মান সম্রাট্ এবং পোপ্ একাদশ ইনোসেণ্ট চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে উইলিয়ামের সহিত যোগ দিলেন। উইলিয়াম যে ইংলণ্ডে আসিলেন, সে কেবল

ইংলণ্ডের উপকারার্থে নহে, চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে টানিয়া লইবার জন্য। এই নূতন রাজ্য পাইয়া তিনি এমন একটা নূতন শক্তিলাভ করিলেন, যাহা তাঁহার অভাব ছিল, এবং যে শক্তি লুই এতদিন ধরিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। যতদিন দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ ও দ্বিতীয় জেম্‌স্ রাজত্ব করিতেছিলেন, ততদিন ইংলণ্ড লুইর করতলগত ছিল; তিনি ইহার পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেন এবং বরাবর হলাণ্ডের বিরুদ্ধে ইহার শক্তি প্রয়োগ করিতেন। ইংলণ্ড এখন যথেচ্ছতন্ত্রদলের হস্ত হইতে অপহৃত হইল এবং স্বাধীনতাপক্ষের প্রধান সহায় ও অবলম্বন হইল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্রবিপ্লবের ইহাই ইউরোপীয় তাৎপর্য্য। অবশ্য ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত ও প্রভাব পরবর্ত্তী শতাব্দীর ইউরোপীয় চিত্তে বিশেষভাবে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু উপরোক্তরূপেই ইংলণ্ড ইউরোপীয় ইতিহাসের ঘটনাস্রোতে স্থান পাইল।

এখন দেখিলেন, ইংরাজ-বিপ্লবের যথার্থ তাৎপর্য্য ও মূলগত প্রকৃতি এই যে, ইহা রাষ্ট্রক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে যথেচ্ছতন্ত্র শাসনের উচ্ছেদ-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ বিপ্লবের সর্ব্বাবস্থায়, কি আভ্যন্তরীণ বিকাশে, কি ইউরোপের সহিত বহিঃসম্পর্কে, সর্ব্বত্রই এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইউরোপের মহাদেশখণ্ডে নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তার যে মহাসংগ্রাম পরবর্ত্তী যুগে বাধিয়াছিল, এখন কেবল সেই বৃহদ্ব্যাপারের, অন্ততঃ তাহার কারণ ও সূচনার আলোচনা অবশিষ্ট রহিল। ইহাই আগামী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গত অধ্যায়ে আমরা ইংরেজী বিপ্লবের যথার্থ প্রকৃতি ও রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে আদিম ইউরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একদিকে নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্র, অন্য দিকে স্বাধীন চিন্তা, এই যে দুই বৃহৎ শক্তির উদ্ভব হইয়াছিল, আমরা দেখিয়াছি, ইংরেজী বিদ্রোহ এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির প্রথম সংঘর্ষ। ইংলণ্ডেই এই দুই শক্তির মধ্যে প্রথম বিবাদ বাধিয়াছিল। ইহা হইতে অনেকে সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থা ও ইউরোপের মহাদেশখণ্ডের সামাজিক অবস্থার মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। কেহ কেহ বলেন, যেখানে অবস্থা-বৈষম্য এত অধিক, সেখানে কোন প্রকার তুলনা সম্ভব নহে। তাঁহারা বলেন, ইংলণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থানে যে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, ইংরেজ জাতির নৈতিক জীবনেও সেই সংস্পর্শরাহিত্য দেখা যায়।

ইহা সত্য যে, ইংরেজী সভ্যতা ও ইউরোপের মহাদেশখণ্ডের সভ্যতার মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ ছিল, এবং সে প্রভেদের হিসাব লইতে আমরা বাধ্য। আপনারা ইতিমধ্যেই এ পার্থক্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। ইংলণ্ডে সমাজের বিভিন্ন তত্ত্ব ও অঙ্গ একসঙ্গে পাশাপাশি বিকশিত হইয়াছিল; অন্ততঃ ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডেই এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। যখন আমি প্রাচীন জগৎ ও এশিয়ার সভ্যতার তুলনায় ইউরোপীয় সভ্যতার বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তখন আমি দেখাইয়াছি যে,

ইউরোপীয় সভ্যতা বৈচিত্র্যপূর্ণ, সম্পদ্‌বহুল ও জটিল, এ সভ্যতা কখনও কোন বিশেষ তত্ত্বের একাধিপত্য স্বীকার করে নাই; ইহার মধ্যে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ ও উপাদান রূপান্তরিত হইয়াছে, পরস্পরের সহিত্ সম্মিলিত হইয়াছে, পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়াছে, এবং অনবরত পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া একত্র অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার এই সাধারণ লক্ষণ বিশেষ করিয়া ইংরেজী সভ্যতার মধ্যে দেখা দিয়াছে। ইংলণ্ডেই এই বিশেষত্ব সুস্পষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিকশিত হইয়াছে। এখানে সাধারণ সমাজ ও ধর্ম্মসমাজ, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রবর্ত্তী প্রতিষ্ঠান, আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশ, সমস্তই এলোমেলোভাবে একত্র সমানবেগে না হউক, অন্ততঃ কাছাকাছি থাকিয়া বৃদ্ধি ও উন্নতিলাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, টিউডরদিগের আমলে নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্রের উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রনীতি ও জনশক্তির উদ্ভব ও শক্তিসঞ্চয় ঘটিতে থাকিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মহাবিপ্লব ভাঙ্গিয়া পড়িল; সে বিপ্লব এককালে ধর্ম্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব। এ সময়ে ভূস্বামিতন্ত্রী অভিজাতবর্গ শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন সত্য; কিন্তু এ বিপ্লবের মধ্যে গৌরবময় স্থান অধিকার করিবার মত অবস্থা তাঁহাদের বরাবর ছিল। ইংরেজী ইতিহাসের সমগ্র ধারার মধ্যেও এই এক ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়; কোন প্রাচীন উপাদান এখানে একেবারে বিনষ্ট হয় নাই; কোন নূতন উপাদান এখানে সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হইতে পারে নাই; কোন বিশেষ তত্ত্ব এখানে একাধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই। এখানে সর্ব্বদাই বিভিন্ন শক্তির এককালীন বিকাশ হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পর বিরোধী অধিকার ও স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।

মহাদেশখণ্ডে সভ্যতার উন্নতিধারা এত জটিলও নহে, এমন সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণও নহে। ধর্ম্ম-সমাজ, সাধারণ-সমাজ, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র,—সমাজের এই সমস্ত বিচিত্র অঙ্গ এককালে বিকশিত হয় নাই, একে একে বিকশিত হইয়াছে। প্রত্যেক তত্ত্ব, প্রত্যেক পদ্ধতিরই যেন এক একটা পালা আসিয়াছে। কোন শতাব্দী বা একান্তভাবে না হউক, মুখ্যতঃ ভূস্বামিতন্ত্রের যুগ; কোন শতাব্দী বা রাজতন্ত্রের যুগ; আবার কোন শতাব্দী বা গণতন্ত্রের যুগ।

ইংরেজী মধ্যযুগের সহিত ফরাসী মধ্যযুগের তুলনা করুন; একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের কি অবস্থা ছিল দেখুন, আবার ইংলণ্ডের কি অবস্থা ছিল দেখুন। আপনারা দেখিবেন, এ সময়ে ফ্রান্সে ভূস্বামিতন্ত্রের একরূপ একাধিপত্য, রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রায় কোন বাস্তবসত্তা ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ডের দিকে দৃক্‌পাত করুন; সেখানে অবশ্য ভূস্বামিতন্ত্রেরই মুখ্যপ্রভাব; তথাপি রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র তখন শক্তিশালী ও প্রবল ছিল।

ফ্রান্সে যেমন চতুর্দ্দশ লুইর আমলে, ইংলণ্ডে সেইরূপ এলিজাবেথের আমলে রাজতন্ত্র বিজয়লাভ করিল; কিন্তু এলিজাবেথকে কত দিকে সতর্ক হইতে হইয়াছিল; এক দিকে অভিজাতবর্গের তাড়নায়, অন্য দিকে জনসাধারণের তুষ্টিকল্পে রাজক্ষমতা কত দিক্ হইতে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডেও প্রত্যেক তত্ত্ব ও প্রত্যেক পদ্ধতির এক একটা বিশেষ সমৃদ্ধি-যুগ আসিয়াছে; কিন্তু মহাদেশখণ্ডে যেরূপ সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ইহা ঘটিয়াছে, ইংলণ্ডে সেরূপ ঘটে নাই। এখানে বিজেতৃ-শক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া প্রত্যেককে যথাযোগ্য অধিকার দিতে হইয়াছে।

এই বিভিন্নতার দরুন উভয় দেশের ইতিহাসে তৎসম্পর্কিত

কতকগুলি সুবিধা ও অসুবিধা দেখা দিয়াছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের এককালীন বিকাশহেতু ইংলণ্ড অন্যান্য দেশ অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র একটা স্বাধীন সুনিয়ন্ত্রিত শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে এবং সামাজিক জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিয়াছে। শাসনতন্ত্রের যথার্থ ধর্ম্মই এই যে, সে সকল প্রকার স্বার্থ ও শক্তির যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিবে, সকলের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিবে, সকলকে পরস্পর সাহচর্য্যে অবস্থান ও উন্নতি করিতে প্রণোদিত করিবে। নানা কারণের একত্র সমবায়ে ইংরেজী সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই দাঁড়াইয়াছিল; সুতরাং সেখানে একটা সর্ব্বজনগ্রাহ্য সুনিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্র গঠন করা তত দুরূহ ব্যাপার হয় নাই। আবার স্বাধীনতারও সারতত্ত্ব এই যে, সমস্ত বিভিন্ন স্বার্থ, অধিকার, শক্তি ও সামাজিক উপাদান এককালে প্রকাশমান ও সক্রিয় হইবে। সুতরাং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ড এই স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুত ছিল। এই সমস্ত কারণেই জাতীয় সুবুদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ধারণা করিবার ক্ষমতা ইংলণ্ডে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র বিকশিত হইল। কেমন করিয়া সমস্ত তথ্যের গুরুত্ব বিচার করিতে হয়, এবং এই গুরুত্ব অনুসারে কিরূপে প্রত্যেক তথ্যের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে হয়, এই জ্ঞানেরই নাম রাষ্ট্রীয় সুবুদ্ধি; ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থার প্রয়োজনে ও সভ্যতার গতির স্বাভাবিক ফলস্বরূপ ইংলণ্ড এ জ্ঞান পূর্ব্ব হইতেই আয়ত্ত করিয়াছিল।

অন্য দিকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রত্যেক তত্ত্ব, প্রত্যেক পদ্ধতি, স্ব স্ব যুগে একাধিপত্য লাভ করিয়া বৃহত্তর আকারে ও অধিকতর জাঁকজমকসহকারে বিকাশলাভ করিয়াছে। কি রাজতন্ত্র, কি ভূস্বামি-তন্ত্র, মহাদেশখণ্ডের রঙ্গমঞ্চে ইহারা অধিকতর সাহস, দর্প ও স্বাধীনতার

সহিত পদার্পণ করিয়াছে। এখানে যে সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে, ব্যাপ্তি ও সম্পূর্ণতা হিসাবে তাহারা শ্রেষ্ঠতর ; ইহার ফলে এখানে রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বুদ্ধির নহে, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব ও মতবাদের উচ্চতর বিকাশ হইয়াছে। প্রত্যেক পদ্ধতি এক একটি বিশেষ যুগে একরূপ একান্তভাবে লোকচক্ষুর সম্মুখে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিরাজ করিয়াছে ; সুতরাং লোকে প্রত্যেককে সমগ্রভাবে ধারণা করিবার অবসর পাইয়াছে ; প্রত্যেক পদ্ধতির মূলতত্ত্বের সন্ধান লইয়া তাহার চরম পরিণতি পর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছে—এককথায় প্রত্যেক পদ্ধতির সম্পূর্ণ তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছে। ইংরেজ-চরিত্র মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে দুইটি লক্ষণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে—একদিকে বিষয়বুদ্ধি ও কার্য্যকরী ক্ষমতা ; অন্য দিকে ব্যাপক তত্ত্ববুদ্ধির একান্ত অভাব। সর্ব্বক্ষেত্রে, বিশেষতঃ রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞানে, বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনা, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বিচার ইংলণ্ড অপেক্ষা মহাদেশখণ্ডেই অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। অন্ততঃ এ সকল দেশের চিন্তা-প্রণালীতে অধিকতর বল ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই যে, উভয় দেশে সভ্যতার বিকাশে যে পার্থক্য দেখা গিয়াছে, তাহারই ফলে এইরূপ ঘটিয়াছে।

যাহাই হউক, সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে আমরা যাহাই ভাবি না কেন, এটা একটা অবিসম্বাদিত বাস্তব তথ্য, এই তথ্য লইয়াই মহাদেশখণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের গভীরতম প্রভেদ। কিন্তু বিভিন্ন তত্ত্ব ও বিভিন্ন সামাজিক উপাদান ইংলণ্ডে এককালীন বিকাশলাভ করিয়াছে এবং মহাদেশখণ্ডে একে একে বিকশিত হইয়াছে বলিয়া এ সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, মূলে উভয় পক্ষের গন্তব্য পথ ও চরম লক্ষ্য এক ছিল না। সমগ্র ভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইংলণ্ড ও মহাদেশখণ্ড সভ্যতার একই স্তরপরম্পরা

অতিক্রম করিয়াছে ; উভয়ত্র ঘটনাবলী একই ধারা অনুসরণ করিয়াছে, এবং একই কারণসমষ্টির ফলে একই পরিণাম ঘটিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সভ্যতার যে চিত্র আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি, তাহা হইতে এ কথার যাথার্থ্য অপনারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ; এখন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোচনা করিতে গিয়াও এই সত্যের পরিচয় পাইবেন। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্রের বিকাশ, এ দুই ব্যাপার ইংলণ্ডে এককালে ঘটিয়াছিল, কিন্তু মহাদেশখণ্ডে এ দুই ব্যাপারের মধ্যে একটা সুদীর্ঘ কাল ব্যবধান ছিল। কিন্তু তথাপি কালক্রমে দুই ব্যাপারই সম্পন্ন হইল ; এবং এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি যথাক্রমে গৌরবের সহিত আধিপত্য করিয়া, অবশেষে ইংলণ্ডের ন্যায় এখানেও মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইউরোপীয় সমাজসমূহ সাধারণ ভাবে একই পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে ; এবং পরস্পরের মধ্যে যদিও অনেক বাস্তবিক প্রভেদ ছিল, তথাপি সাদৃশ্যই ছিল গভীরতর। আধুনিক কালের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেই এ বিষয়ে আপনাদের কোন সন্দেহ থাকিবে না।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, ফ্রান্স ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রণীরূপে চলিয়াছে। এই গ্রন্থের সূচনাতেই আমি এ কথার উল্লেখ করিয়াছি এবং ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন এই ব্যাপার সুস্পষ্টতর প্রতীয়মান হইবে।

নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্রনীতি ফ্রান্সে চতুর্দ্দশ লুইর আমলে বিকশিত হইবার পূর্ব্বে স্পেনে পঞ্চম চার্ল্‌স্ ও দ্বিতীয় ফিলিপের আমলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সেইরূপ স্বাধীন চিন্তানীতি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে বিকশিত হইবার পূর্ব্বে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে

আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এ দুই তত্ত্ব স্পেন বা ইংলণ্ড হইতে বাহির হইয়া জগৎজয় করিতে আসে নাই। উহারা যে যে দেশে উদ্ভূত, সেই সেই দেশেই একপ্রকার আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা যাহাতে জগতে বিস্তার ও আধিপত্য লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য আবশ্যক ছিল যে, তাহারা একবার ফ্রান্সের মধ্য দিয়া যাইবে ; বিশুদ্ধ রাজতন্ত্রই হউক বা স্বাধীন চিন্তাই হউক, ইউরোপীয় সংজ্ঞা লাভ করিতে হইলে অগ্রে তাহাদিগকে ফরাসী হইতে হইবে। ফরাসী সভ্যতার এই সংক্রমণকারী প্রতিভা, ফ্রান্সের এই সম্মেলনকুশলতা সর্ব্ব যুগেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য যুগে ইহা যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেরূপ আর কোন যুগে নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব আলোচনা করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, স্বাধীন ইংলণ্ড অপেক্ষা স্বাধীনতা বিষয়ে দার্শনিক ফ্রান্সেরই ইউরোপে অধিক প্রতিপত্তি হইয়াছিল। আরও দেখিবেন যে, অন্য যে কোন দেশের সভ্যতা অপেক্ষা ফরাসীসভ্যতা অধিকতর সংক্রামক ও সক্রিয় ছিল। এ যুগে ফ্রান্সের সভ্যতা ও অন্যান্য দেশের সভ্যতার মধ্যে অবশ্য অনেক প্রভেদ ছিল। কিন্তু প্রত্যেক দেশের সমগ্র ইতিহাস আলোচনা আপাততঃ আমার উদ্দেশ্য নহে। ফরাসীসভ্যতাকেই ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি-স্বরূপ ধরিয়া লইয়া, সেই সভ্যতার ইতিহাসের দিকে আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপখণ্ডে ফ্রান্সের প্রভাব বিভিন্নরূপে দেখা দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী শাসনতন্ত্রই ইউ-রোপের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রণীস্বরূপ অগ্রসর হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাসনতন্ত্র নহে, ফরাসী জাতির প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করে। প্রথমে চতুর্দ্দশ লুই ও

তাঁহার রাজসভা, এবং পরে ফরাসীজাতি ও ফরাসী লোকমত মানবচিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে অন্যান্য দেশের জনবর্গ স্বাধীনভাবে ফরাসী জাতি অপেক্ষা অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে ও বৃহৎ ঘটনাবলীর ইতিহাসে স্থান অধিকার করিয়াছে। ত্রিংশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জার্ম্মানজাতি এবং ইংরেজী বিপ্লবে ইংরাজ জাতি নিজ নিজ ভাগ্য গঠনে যে পরিমাণ সহায়তা করিয়াছিল, ফরাসী জাতি সে সময়ে ফ্রান্সের ভাগ্যগঠনে সে পরিমাণ উদ্যম দেখাইতে পারে নাই। সেইরূপ আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এমন অনেক শাসনতন্ত্র ছিল, যাহারা পরাক্রমে, মানসম্ভ্রমে ও ভীষণতায় তদানীন্তন ফরাসী শাসনতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, দ্বিতীয় ক্যাথারিন ও মারিয়া টেরেসার প্রভাবপ্রতিপত্তি পঞ্চদশ লুই অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক ছিল। তথাপি এই উভয় যুগেই ফ্রান্সই ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রণীস্বরূপ ছিল। প্রথমে শাসনতন্ত্রের গুণে, শাসকবৃন্দের রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়াসের ফলে, এবং পরে জাতির গুণে, জাতীয় চিত্তের বিশেষ বিকাশের ফলে,—ফ্রান্স এই নেতৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ সময়ে ফরাসী ও ইউরোপীয় সভ্যতার ধারা কোন্ কোন্ মুখ্য প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে সপ্তদশ শতাব্দীর জন্য ফরাসী শাসনতন্ত্রের, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর জন্য ফরাসী সমাজের ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক।

যখন আমরা চতুর্দ্দশ লুইর শাসন আলোচনায় নিযুক্ত হই, এবং ইউরোপে তাঁহার পরাক্রম ও প্রভাবের কারণ বুঝিতে চেষ্টা করি, তখন তাঁহার যশঃ, তাঁহার বিজয়কীর্ত্তি, তাঁহার বৈভব গরিমা ও তাঁহার কালের সাহিত্য-গৌরব—এ সমস্ত ভিন্ন অন্য কিছুই চিন্তাপথে উদিত হয় না। বাহ্য কারণাবলীর মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে এবং তদ্দ্বারাই

আমরা তদানীন্তন ফরাসী শাসনতন্ত্রের ইউরোপীয় প্রাধান্য বুঝিতে চাই। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, এ প্রাধান্যের গভীরতর ও দৃঢ়তর ভিত্তি ছিল। আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিব না যে, চতুর্দ্দশ লুই ও তাঁহার শাসনতন্ত্র কেবলমাত্র বিজয়কীর্ত্তি, আনন্দ উৎসব ও সাহিত্য-প্রতিভার সহায়তায় প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ান যখন কন্‌সাল্‌রূপে ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন দেশের কি অবস্থা ছিল এবং কন্‌সাল্‌-শাসনের ফলে দেশের অবস্থা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বাহিরে বিদেশীকর্ত্তৃক দেশ আক্রমণের ভয়, এবং ফরাসী সেনার পদে পদে পরাজয়; দেশের ভিতরে শাসনশক্তি ও জনশক্তি, উভয়েরই সম্পূর্ণ বিলোপ; রাজস্বও ছিল না, শান্তিশৃঙ্খলাও ছিল না; এক কথায় সমাজ তখন ধূলিলুণ্ঠিত, হীনতাগ্রস্ত ও অব্যবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। কন্‌সাল্‌-শাসনের সূচনাকালে ফ্রান্সের এই অবস্থা ছিল। কিন্তু এই নূতন শাসনতন্ত্রের বিরাট্ উদ্যমের ফলে অল্পকালমধ্যেই দেশের স্বাধীনতারক্ষার সুব্যবস্থা হইল, জাতীয় সম্ভ্রম পুনরুজ্জীবিত হইল, শাসনপ্রণালী পুনঃসংস্কৃত হইল, বিধিবিধান পুনর্গঠিত হইল—এক কথায় শাসনতন্ত্রের হস্তে সমাজ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিল।

চতুর্দ্দশ লুইর শাসনেও প্রথমে কতকটা এতদনুরূপ ফল ফলিয়াছিল; উভয় শাসনের মধ্যে কালভেদ, প্রণালীভেদ ও রীতিভেদ অনুসারে বিস্তর পার্থক্য ছিল সত্য, কিন্তু উভয়ের কার্য্য অনেকটা একরূপ।

কার্ডিনাল রিশেলিয়র শাসনের পরে এবং চতুর্দ্দশ লুইর নাবালক অবস্থায় ফ্রান্স কি অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল, স্মরণ করুন। স্পেনীয় সৈন্য তখন সর্ব্বদাই সীমান্তপ্রদেশে এবং কখনও বা ফ্রান্সের অভ্যন্তরে আক্রমণ করিতেছে; সদাসর্ব্বদাই তখন আক্রমণের আশঙ্কা;

অন্তবিরোধ চরমসীমায় উঠিয়াছে, অন্তর্বিগ্রহের সূচনা হইয়াছে, এবং দেশের শাসনতন্ত্র স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র হীনবল ও প্রতিপত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। কন্‌সাল্‌-শাসন প্রবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, এ সময়েও প্রায় তদনুরূপ অবস্থা। চতুর্দ্দশ লুইর শাসনে ফ্রান্স এই দুরবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিল। নেপোলিয়ন মারেঙ্গোযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যেরূপে দেশকে নিরাপদ্ করিলেন এবং জতীয় গৌরব পুনরুদ্ধার করিলেন, চতুর্দ্দশ লুইও তাঁহার প্রথম যুদ্ধগুলিতে জয়লাভ করিয়া সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হইলেন। আমি এখন যুদ্ধবিগ্রহ, বাহ্য সম্বন্ধ, শাসনকার্য্য ও বিধিপ্রণয়ন, এই সমস্ত মুখ্য বিষয় ধরিয়া এ শাসনের বিচার করিব; এবং আমার মনে হয়, আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, এই তুলনার একটা যথার্থ ভিত্তি আছে।

প্রথমে চতুর্দ্দশ লুইর যুদ্ধবিগ্রহের কথা বলা যাউক। ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম যে সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে, তাহার মূলে ছিল যাযাবর জাতি-সমূহের দেশান্তর গ্রহণ। প্রয়োজন বা খেয়াল বা অন্য কোন কারণের বশবর্ত্তী হইয়া একটা সমগ্র দেশের অধিবাসী কখনও বা বৃহৎ, কখনও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া তখন দেশ হইতে দেশান্তর যাত্রা করিয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রুসেডযুদ্ধের অবসান পর্য্যন্ত ইউরোপীয় যুদ্ধবিগ্রহের ইহাই ছিল সাধারণ প্রকৃতি।

ঐ সময় হইতে আর এক প্রকার যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা হইল। এ যুদ্ধ দূরবিদেশে পরিচালিত হইত; শাসনতন্ত্রই এ সকল যুদ্ধের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক; জনসাধারণের ইহাতে কোন হাত ছিল না; দেশাধিপগণ স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত লইয়া দূরদেশে নব নব রাজ্যের সন্ধানে বা বীরত্ব দেখাইবার জন্য বহির্গত হইতেন। তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কেহ বা জার্ম্মানী, কেহ বা ইটালী, কেহ বা আফ্রিকার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন,

এবং অধিকাংশ স্থলে ব্যক্তিগত খেয়াল মিটান ছাড়া তাঁহাদের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিত না। পঞ্চদশ শতাব্দীর এবং ষোড়শ শতাব্দীরও কতক অংশের প্রায় সমস্ত যুদ্ধই এইরূপ। অষ্টম চার্ল্‌স্ গিয়া নেপল্‌স্ রাজ্য অধিকার করিবেন, ইহাতে ফ্রান্সের কি স্বার্থ থাকিতে পারে? স্পষ্টই দেখা যায়, এ যুদ্ধ কোন রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনের তাড়নায় ঘটে নাই। রাজার মনে হইল, নেপল্‌স্ রাজ্যে তাঁহার একটা ব্যক্তিগত অধিকার আছে; এবং এই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য লইয়া, ব্যক্তিগত কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি এমন একটি দূরদেশ জয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, যাহা তাঁহার স্বরাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইবার পক্ষে একেবারেই উপযোগী ছিল না। বরং এ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া তিনি বাহিরে প্রতিপত্তি হারাইলেন ও অন্তরে শান্তি হারাইলেন। পঞ্চম চার্লসের আফ্রিকা-অভিযানও এই ধরণের যুদ্ধ। দ্বাদশ চার্লসের রুশ-অভিযানই এই শ্রেণীর শেষ যুদ্ধ। চতুর্দ্দশ লুইর যুদ্ধ কিন্তু এ ধরণের নহে; তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহ একটা সুব্যবস্থিত কেন্দ্রস্থ শাসনশক্তিদ্বারা প্রবর্ত্তিত এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূখণ্ড জয়পূর্ব্বক রাজ্যের সীমাবিস্তার বা রাষ্ট্রের দৃঢ়ীকরণ উদ্দেশ্যে পরিচালিত; এককথায় এগুলি রাষ্ট্রনৈতিক বিগ্রহ।

এ সকল বিগ্রহ ন্যায়সম্মতও হইতে পারে, অন্যায়ও হইতে পারে; ইহাদের দরুন ফ্রান্সকে হয় ত বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে; এ সকল যুদ্ধে যে দুর্নীতি ও আতিশর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার বিরুদ্ধে সহস্র যুক্তি অবতারণা করা যাইতে পারে; কিন্তু তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা এ সকল যুদ্ধের মধ্যে একটা যৌক্তিকতা ছিল। এখন আর কেবল খেয়াল মিটাইবার জন্য বা বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য কেহ যুদ্ধ করে না; এখন সমস্ত যুদ্ধের মূলে একটা বাস্তবিক প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের প্রেরণা দেখিতে পাওয়া যায়। হয় ত রাষ্ট্রসীমার

আর কিঞ্চিৎ বিস্তার করিলে একটা স্বাভাবিব সীমান্তরেখা পাওয়া যায়, সেটুকু বিস্তার করিয়া লইতে হইবে; হয় ত বা রাষ্ট্রসীমার বাহিরে সমভাষাভাষী একটা জনসমাজ আছে, সেটিকে শাসনভুক্ত করিয়া লইতে হইবে অথবা হয় ত প্রতিবেশীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী বিশেষ কোন একটি স্থান দখল করিতে হইবে, এইরূপ একটা বাস্তব উদ্দেশ্য লইয়া এখন যুদ্ধ হয়। অবশ্য এ সব যুদ্ধে ব্যক্তিগত দুরাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু চতুর্দ্দশ লুইর যুদ্ধগুলি, বিশেষতঃ প্রথম যুদ্ধগুলি একের পর এক পরীক্ষা করিয়া দেখুন; দেখিবেন, সবগুলিরই মূলে রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রেরণা; সমস্ত যুদ্ধের মূল কথা ফ্রান্সের স্বার্থসিদ্ধি করিতে হইবে, ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে, ফ্রান্সকে নিরাপদ্ করিতে হইবে।

এ সব যুদ্ধের পরিণামফল লক্ষ্য করিলেই এ কথার প্রমাণ পাইবেন। চতুর্দ্দশ লুইর যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ফ্রান্স যে আকার ধারণ করিয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত তাহাই আছে। ফ্রঁাষ্ কোঁতে, ফ্লাণ্ডার্স ও আল্সাস্ এখনও পর্য্যন্ত ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। চতুর্দ্দশ লুই যে যে ভূখণ্ড জয় করিয়াছেন, সর্ব্বত্র তাঁহার সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের যুদ্ধোদ্যমে যে অর্থহীন খামখেয়ালীর পরিচয় পাওয়া যাইত, চতুর্দ্দশ লুইর যুদ্ধোদ্যমে তাহার লেশমাত্র নাই। তাঁহার সমস্ত চেষ্টার পশ্চাতে সব সময়ে একটা কৌশলী নীতির সন্ধান পাওয়া যায়।

চতুর্দ্দশ লুইর যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়িয়া যদি তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা করি, তাহা হইলে সেখানেও দেখিব, একরূপ পরিণাম। আমি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পররাষ্ট্রনীতির জন্মকাল নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কেমন করিয়া তখন রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত ও স্থায়ী আকার ধারণ করিল এবং পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রীয়

ব্যাপারে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল। তথাপি বাস্তবিক-পক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহার কোন পদ্ধতি দাঁড়ায় নাই; তখনও পর্য্যন্ত কোন দীর্ঘকালস্থায়ী মৈত্রীবন্ধন ঘটে নাই অথবা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ধরিয়া সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে স্থায়ী সম্মিলন ঘটে নাই। ধর্ম্মবিপ্লবের সময় রাষ্ট্রসমূহের বহিঃসম্পর্ক প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের খাতিরে নিয়ন্ত্রিত হইত; ইউরোপ তখন প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক দলে বিভক্ত। সপ্তদশ শতাব্দীতেই ওয়েষ্টফালিয়ার সন্ধির পর এবং চতুর্দ্দশ লুইর শাসনপ্রভাবে ইউরোপীয় পররাষ্ট্রনীতি রূপান্তর গ্রহণ করিল। তখন হইতে ইহা ধর্ম্মনীতির একান্ত প্রভাব হইতে মুক্তি পাইল। এখন অন্যান্য কারণে মৈত্রীবন্ধন ও দলবন্ধন ঘটিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহা নিয়মপদ্ধতি সহকারে চিরস্থায়ী নীতি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হইতে লাগিল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে যে শক্তি-সাম্য-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, এই যুগেই তাহার উদ্ভব। ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কাহাকেও অতিরিক্ত মাত্রায় শক্তিমান্ হইতে দেওয়া চলিবে না, এই নীতি এবং ইহার আনুষঙ্গিক বিচার-যুক্তি চতুর্দ্দশ লুইর শাসনেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিল। এ বিষয়ে তখন সাধারণ ধারণা কিরূপ ছিল, চতুর্দ্দশ লুইর রাজনীতির মুখ্য তত্ত্ব কি ছিল, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আমার বিশ্বাস, নিম্নলিখিতরূপ ফল পাওয়া যাইবে:—

একদিকে চতুর্দ্দশ লুইর নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্র বিশ্বব্যাপী রাজতন্ত্রে পরিণত হইতে চেষ্টা করিতেছে, অন্য দিকে প্রিন্স্ অব্ অরেঞ্জ তৃতীয় উইলিয়ামের নেতৃত্বে প্রজাগণ অধিকার-স্বাতন্ত্র্য ও ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য এবং রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ—এই উভয় পক্ষে যে মহাসংঘর্ষ বাধিয়াছিল, তাহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই দুই

দলের পতাকানিম্নে ইউরোপের সমস্ত শক্তিবৃন্দ পরস্পর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। এ যুগের ইহাই প্রধান ঘটনা। কিন্তু এ ঘটনার সম্যক্ তাৎপর্য্য ও গুরুত্ব তখন কেহ ধারণা করিতে পারে নাই। এমন কি, যাহারা এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তাহাদের মনেও ইহার পরিষ্কার ধারণা হয় নাই। হলাণ্ড ও তাহার সহায়ক রাষ্ট্রসমূহ চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইল—নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও জনসাধারণের স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠা, কিন্তু তখন এ সংগ্রামের এই ব্যাপক তাৎপর্য্য প্রকাশ্যভাবে বিবৃত হয় নাই। অনেকে বলেন, চতুর্দ্দশ লুইর পররাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্ব ছিল নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্রের বিস্তৃতি ও প্রসার বৃদ্ধি। কিন্তু আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। তিনি বৃদ্ধবয়সের পূর্ব্বে তাঁহার রাষ্ট্রনীতির মধ্যে এ তত্ত্বটিকে মুখ্য স্থান দেন নাই। স্পেনের বিরুদ্ধে, জার্ম্মান সম্রাটের বিরুদ্ধে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি যে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র তিনি এক লক্ষ্য অনুসরণ করিয়াছিলেন,—সে লক্ষ্য ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধি, ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের দমন, এক কথায় স্বরাষ্ট্রের বলবৃদ্ধি ও কল্যাণসাধন। তিনি যথেচ্ছতন্ত্র শাসনপদ্ধতির বিস্তৃতি অপেক্ষা ফ্রান্সের শ্রীবৃদ্ধিকল্পেই অধিকতর উদ্যম করিয়াছেন। ইহার অনেক প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে এখানে একটি প্রমাণ উল্লেখ করিব। চতুর্দ্দশ লুইর স্মৃতিকাহিনীর মধ্যে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের বিবরণীতে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন,—

"অদ্য প্রাতে সিড্নী নামক একটি ইংরেজ ভদ্রলোকের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তাঁহার মত, ইংলণ্ডে গণতন্ত্রবাদী দলের পুনরুজ্জীবন সম্ভব। সেই উদ্দেশ্যে তিনি আমার নিকট হইতে চারি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। আমি বলিলাম, দুই লক্ষের অধিক দিতে

পারিব না। সুইজারলাণ্ড হইতে লড্‌লো নামক আর একজন ইংরেজ ভদ্রলোককে আহ্বান করিবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন, এবং তাঁহার সহিত এই সংকল্প সম্বন্ধে কথা কহিতে বলিলেন।”

লডলোর স্মৃতিকাহিনীতে ঐ সময়ের কাছাকাছি এই কথাগুলি পাওয়া যায়ঃ—“আমি ফরাসী শাসনতন্ত্র কর্ত্তৃক আমার দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য পারিসে নিমন্ত্রিত হই; কিন্তু আমি ফরাসী শাসনতন্ত্রকে বিশ্বাস করি না।”

ফলে লড্‌লো সুইজর্‌লাণ্ডেই থাকিয়া গেলেন।

আপনারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন, ইংলণ্ডের রাজশক্তি খর্ব্ব করাই এ সময়ে চতুর্দ্দশ লুইর উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ যাহাতে ইংলণ্ডে অতিপরাক্রান্ত না হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে অন্তর্ব্বিরোধ ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এমন কি. সেখানে গণতন্ত্রী দলের পুনরুজ্জীবন করিতে চাহিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ফরাসীরাজদূত বারিয়োঁর দৌত্যকালে, বারংবার ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। যখনই চার্ল্‌স্ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন এবং জননেতৃপক্ষ পরাভূত হইবার মত হইয়াছে, ফরাসীরাজদূত তখনই বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দকে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। ইংরেজরাজ ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী, অতএব তাহাকে হীনবল করিতে হইবে; এবং তজ্জন্য যদি যথেচ্ছতন্ত্র শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া গণতন্ত্রিপক্ষ সমর্থন করিতে হয়, তাহাও স্বীকার্য্য। চতুর্দ্দশ লুইর পররাষ্ট্রঘটিত আচরণ মনোযোগের সহিত বিচার করিলে এই ব্যাপারই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সঙ্গে সঙ্গে এ যুগের ফরাসী রাজদূত ও পররাষ্ট্রসচিবগণের দক্ষতা ও নীতিকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন। দ্য তর্শি (de Torcy), দাবো (d' Avaux) এবং দ্য বোঁরেপোর (de Bonrepos) নাম শিক্ষিত

ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচিত। চতুর্দ্দশ লুইর এই সমস্ত মন্ত্রণাদাতার সহিত স্পেনীয়, পোর্ত্তুগীজ ও জার্ম্মান রাজদূতগণের তুলনা করিলে দেখিবেন, কি লিপিকৌশলে, কি আচরণ-কৌশলে ফরাসী সচিবগণই শ্রেষ্ঠ। কেবলমাত্র আন্তরিক উদ্যম ও বিষয় ব্যাপারে একান্ত মনোযোগ হিসাবে নহে, স্বাধীনচিত্ততা হিসাবেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যথেচ্ছতন্ত্র রাজার সভাসদ্ হইয়াও তাঁহারা বহির্জ্জগতের বিচিত্র ব্যাপার, বিভিন্ন দলের প্রকৃতি ও প্রভাব, স্বাতন্ত্র্যসাধন ও জনবিপ্লবের প্রকৃষ্ট উপায়, এ সমস্ত বিষয়ে যেরূপ বিচারসহকারে চিন্তা করিতে পারিতেন, এ সময়ের অধিকাংশ ইংরেজ মন্ত্রী তাহা পারিতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীতে এক ওলন্দাজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির মধ্যে ফরাসী দৌত্যকৌশলের সমকক্ষ ছিল না। স্বাতন্ত্র্যবাদী দলের প্রসিদ্ধ নেতা জন্ ডিউইট্ এবং উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জের মন্ত্রিগণই কেবল এই যথেচ্ছতন্ত্র রাজার ভৃত্যবর্গের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ ছিল।

তাহা হইলেই দেখিতেছেন, চতুর্দ্দশ লুইর যুদ্ধবিগ্রহই বিচার করুন বা পররাষ্ট্রনীতিই বিচার করুন, সর্ব্বত্র একই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। যে শাসনতন্ত্র এরূপ দক্ষতার সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও দৌত্যসম্পর্ক চালাইতে পারিয়াছিল, সে যে ইউরোপে উচ্চ পদবী অধিকার করিবে এবং শুধু ভয় নহে, বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেক করিবে, তাহা সহজেই ধারণা করা যায়।

এখন ফ্রান্সের অভ্যন্তরে চতুর্দ্দশ লুইর শাসনপ্রণালী ও বিধিব্যবস্থা আলোচনা করা যাউক। তাঁহার শাসনতন্ত্র কেন যে এত পরাক্রম ও গৌরবদীপ্তি লাভ করিয়াছিল, এখানে তাহার অনেক নূতন কারণ দেখিতে পাইব।

শাসনব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায়, তাহা সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে কেন্দ্রবর্ত্তী শাসনশক্তির ইচ্ছাসঙ্কল্প অবিলম্বে ও সুনিশ্চিত-

রূপে সমাজের সর্ব্বাংশে চালনা করিয়া দিবার, এবং সমাজের লোকবল ও অর্থবল কেন্দ্রশক্তির হস্তে আহরণ করিয়া আনার জন্য যত কিছু উপায় অবলম্বিত হয়, সেই উপায়সমষ্টিকেই মোটামুটি শাসনব্যবস্থা বলা চলে। শাসনব্যবস্থার ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষণ। সুতরাং যখন সমাজে ঐক্য ও শৃঙ্খলাস্থাপন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তখন দেখি, শাসনব্যবস্থাই এ উদ্দেশ্য সাধন করিবার অর্থাৎ সমাজের অসংলগ্ন বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলিকে একত্র আহরণ ও সংযোজন করিবার প্রধান উপায়। বাস্তবিক পক্ষে চতুর্দ্দশ লুইর শাসনব্যবস্থা এই কার্য্যই সম্পন্ন করিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কি ফ্রান্সে, কি ইউরোপের অন্যান্য দেশে, কেন্দ্রশক্তির প্রভাব সমাজের সর্ব্বাংশে চালিত করা এবং সমাজের বিক্ষিপ্ত শক্তি আহরণ করিয়া কেন্দ্রশক্তির হস্তে সংহত করিয়া তোলার মত দুরূহ ব্যাপার আর কিছুই ছিল না। চতুর্দ্দশ লুই এই লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করিয়াছিলেন, এবং কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন; অন্ততঃ এতটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনতন্ত্রসমূহের তুলনা হয় না। আমি এখানে ইহার বিশদ বিবরণ দিতে পারিব না; শুদ্ধ একবার সর্ব্ববিধ সরকারী কার্য্যবিভাগ, রাজকর, পথঘাট, শিল্পবাণিজ্য, সামরিক ব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থার সর্ব্ববিভাগের সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানের কথা মনে মনে ভাবুন; দেখিবেন, প্রায় প্রত্যেকটিই চতুর্দ্দশ লুইর আমলে প্রবর্ত্তিত বা পুষ্ট বা সংস্কৃত হইয়াছে। কোল্‌বেয়ার, লুভোয়া প্রভৃতি তৎকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শাসনব্যবস্থার মধ্যেই স্ব স্ব প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই শাসনব্যবস্থার গুণেই তাঁহার শাসনতন্ত্র এমন একটা ব্যাপকতা, দৃঢ়তা ও সঙ্গতি লাভ করিয়াছিল, যাহা তখন ইউরোপের কোন শাসনতন্ত্রেই দেখা যায় নাই।

তাঁহার রাজত্বকালে যে সমস্ত বিধিবিধান প্রণীত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব্বের ন্যায় এ বিষয়েও কন্‌সাল-শাসনের সহিত লুই-শাসনের তুলনা করিব। নেপোলিয়ন যখন কন্‌সালরূপে ফ্রান্স শাসন করিতে লাগিলেন, তখন রাষ্ট্রের সমস্ত বিধি-বিধান সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য এক বিরাট্ প্রয়াস হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ লুইর আমলেও ঠিক সেইরূপ একটা চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি যে সমস্ত বড় বড় বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন,—যথা ফৌজদারী বিধান, বিচার কার্য্যবিধি, বাণিজ্যবিধান, জলবিধি, অরণ্যবিধি—সেগুলি সমস্তই প্রকৃত পক্ষে এক একটি বিধিসংহিতা এবং বর্ত্তমান কালে যেরূপে সংহিতা প্রণীত হয়, সেইরূপে পূর্ব্বে মন্ত্রিসভায় আলোচিত হইয়া এগুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনেক সময়ে লামোয়াঞিয়ো এই সকল আলো-চনা-সভার সভাপতি থাকিতেন। এ সময়ে পুসর্ত্ত প্রভৃতি অনেক লোক কেবলমাত্র এই বিধিপ্রণয়ন ব্যাপারে ও এই সকল আলোচনায় যোগ-দান করিয়াই যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। চতুর্দ্দশ লুইর বিধিবিধান তত্ত্বতঃ বিচার করিলে অবশ্য অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়; সে সমস্ত দোষ এখন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যথার্থ ন্যায়ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয় নাই, রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য ও বিধিবিধান দৃঢ়ভাবে নিয়মিত করিবার জন্যই এ সংস্কারের প্রবর্ত্তন। তথাপি তাহাই তখন বিশেষ উন্নতির পরিচায়ক; এবং ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই যে, চতুর্দ্দশ লুই-প্রবর্ত্তিত বিধিবিধান পূর্ব্ববর্ত্তী আইন কানুনের তুলনায় এত শ্রেষ্ঠ ছিল যে, তদ্দারা ফ্রান্সের সভ্যতা বিশেষ উন্নতি লাভ করিল।

এখন দেখিলেন, যে দিক্ হইতেই এ শাসনতন্ত্রের বিচার করি না কেন, ইহার পরাক্রম ও প্রভাবের মূল আবিষ্কার করিতে অধিক

বিলম্ব হয় না। ইউরোপের সমক্ষে এই সর্ব্বপ্রথম এমন একটি শাসনশক্তি দেখা দিল, যে নিজের অবস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, যাহাকে অনবরত গৃহশত্রুর সহিত বিরোধ করিতে হয় নাই, যাহাকে রাষ্ট্র বা প্রজা সম্পর্কে কোন অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই— যে কেবলমাত্র শাসনব্যবস্থার মধ্যেই তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সমস্ত ইউরোপীয় শাসনতন্ত্রকেই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া শান্তি ও অবসর হারাইতে হইয়াছে, অথবা গৃহশত্রু ও দলাদলির আক্রমণে কেবল আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। চতুর্দ্দশ লুইর শাসনতন্ত্রই প্রথম শাসনতন্ত্র, যাহা কেবলমাত্র শাসনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছে; যাহার মধ্যে দৃঢ়তাও ছিল, উন্নতিশীলতাও ছিল; যাহা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিঃশঙ্ক ছিল বলিয়া নব নব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে ভয় পায় নাই। বাস্তবিকপক্ষে এরূপ উন্নতিশীল সংস্কারপ্রবণ শাসনতন্ত্র অল্পই দেখা গিয়াছে। স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের সহিত তুলনা করুন; তাঁহার রাজক্ষমতা লুইর ক্ষমতা অপেক্ষাও অপ্রতিহত ছিল; অথচ তাঁহার শাসনতন্ত্র এরূপ নিয়মিত সত্তাও লাভ করে নাই, এরূপ নিরুদ্বেগ শান্তিও ভোগ করিতে পায় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনে যথেচ্ছতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন কি উপায়ে? দেশের সমস্ত উদ্যম সবলে দমন করিয়া, দেশকে কোন প্রকার উন্নতির অবকাশ না দিয়া, এক কথায় স্পেনকে সম্পূর্ণরূপে স্থাবর করিয়া দিয়া। চতুর্দ্দশ লুইর শাসন কিন্তু সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও নবীনতার পক্ষে উদ্যম দেখাইয়াছে, সাহিত্য শিল্প, ধনসমৃদ্ধি, সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির আনুকূল্য করিয়াছে—এক কথায় সভ্যতার উন্নতিসাধনে যত্ন করিয়াছে। ইউরোপে তাহার প্রাধান্য লাভের ইহাই যথার্থ কারণ; সে এতদূর প্রাধান্য লাভ

করিয়াছিল যে, সমস্ত সপ্তদশ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের রাজাপ্রজা সকলেই ইহাকে আদর্শ শাসনতন্ত্রস্বরূপ দেখিত।

এখন দেখিতে হয়, এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত গৌরব-সমুজ্জ্বল শাসনতন্ত্রের অধঃপতন হইল কিরূপে? ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে এমনভাবে লীলা করিয়া, পরবর্ত্তী শতাব্দীতেই ইহা এত হীনবল, সংহতিহীন ও মর্য্যাদাহীন হইয়া পড়িল কিরূপে? বাস্তবিক পক্ষে ইহাই ঘটিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী শাসনতন্ত্র ইউরোপীয় সভ্যতার শীর্ষদেশে অবস্থিত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার অন্তর্দ্ধান। তখন ফরাসীসমাজ শাসনতন্ত্রের সম্পর্ক না রাখিয়া, এবং অনেক সময় শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, ইউরোপের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল।

এইখানেই যথেচ্ছতন্ত্রশক্তির অসংশোধ্য ত্রুটি ও অপরিহার্য্য পরিণামের পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্দ্দশ লুইর শাসনতন্ত্রের দোষত্রুটির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না; তিনি অনেক দোষ করিয়াছিলেন; স্পেনীয় উত্তরাধিকার-ঘটিত বিগ্রহ, নাঁতে অনুশাসনের প্রত্যাহার, অপরিমিত ব্যয়বাহুল্য অথবা অন্যান্য যে সমস্ত মারাত্মক অনুষ্ঠানে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল, সে সব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহি না। তাঁহার শাসনতন্ত্রের যে সমস্ত সদ্‌গুণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সমস্তই স্বীকার করিয়া লইব। এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, আর কোন যথেচ্ছতন্ত্র শক্তি স্বকীয় যুগে ও দেশে এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই বা স্বদেশের ও ইউরোপের সভ্যতার এত শ্রীবৃদ্ধি করে নাই। কিন্তু একেশ্বরতন্ত্র ভিন্ন ইহার অন্য কোন ভিত্তি বা শাসননীতি ছিল না বলিয়াই ইহার অচিরেই শক্তিক্ষয় ঘটিল। চতুর্দ্দশ লুইর আমলে ফ্রান্সের মুখ্য অভাব ছিল—কতকগুলি স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করিতে পারে ও আবশ্যক

হইলে রাজশক্তিকে বাধা দিতে পারে। তথাকথিত প্রাচীন ফরাসী প্রতিষ্ঠানগুলির তখন অস্তিত্ব ছিল না; চতুর্দ্দশ লুইর হস্তে তাহারা চরম নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের স্থানপূরণ করিবার জন্য তিনি কোন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িতে চেষ্টা করেন নাই: সেরূপ করিলে তাহারা তাঁহার অধিকার সঙ্কোচ করিত, তিনি স্বাধিকার সঙ্কোচ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সে সময়ে কেবল কেন্দ্রবর্ত্তী রাজশক্তির ইচ্ছাই সুপ্রকট হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দশ লুইর শাসনতন্ত্র একটা মহাপরাক্রান্ত বিরাট্ ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু জাতীয় জীবনে ইহার মূল ছিল না। স্বাধীন প্রতিষ্ঠান থাকিলে শুধু যে দেশ সুশাসিত হয়, তাহা নহে, শাসনতন্ত্রের স্থায়িত্বও সাধিত হয়। প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন পদ্ধতিরই স্থায়িত্ব ঘটে না। যেখানে যেখানে দেখিবেন, যথেচ্ছতন্ত্র শক্তি স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, সেইখানেই দেখিবেন, কোথাও বা বর্ণবিভাগ, কোথাও বা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান, এইরূপ কোন সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান শাসনতন্ত্রের সহায়তা করিয়াছে। চতুর্দ্দশ লুইর আমলে শাসনশক্তির অনুকূলও কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না, জনস্বাতন্ত্র্যের অনুকূলও কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এ সময়ে ফ্রান্সে রাজশক্তির অবৈধ আচরণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার মতও কোন ব্যবস্থা ছিল না, আবার কালধর্ম্মের অপরিহার্য্য প্রকোপ হইতে রাজশক্তিকে রক্ষা করিবার মতও কোন ব্যবস্থা ছিল না। এইরূপে দেখিতে পাই, শাসনতন্ত্র নিজের শক্তি ক্ষয়ের পথ নিজেই প্রস্তুত করিতেছে। চতুর্দ্দশ লুইর রাজত্বের শেষভাগে শুধু যে তিনি নিজেই জরাগ্রস্ত ও হীনবল হইয়া পড়িতেছেন, তাহা নহে; সমগ্র একেশ্বরতন্ত্রই তখন জরাগ্রস্ত হইতেছে। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে রাজা যেরূপ জরাবসন্ন, নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্রও সেইরূপ জরাবসন্ন। আরও আশঙ্কার কারণ হইল এই যে, চতুর্দ্দশ লুই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের

সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যবোধেরও বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যবোধ জাগে না। আমারও একটা নিজস্ব শক্তি আছে, এ কথা যে অনুভব করে, সেই কেবল শাসনশক্তির অনুকূল বা বিরুদ্ধাচরণ করিতে সমর্থ। স্বাধীনতালোপের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের সাহস ও উদ্যম বিলুপ্ত হয়, আবার চরিত্রমর্য্যাদা না থাকিলে অধিকার রক্ষার সামর্থ্য জন্মে না।

ফ্রান্স ও ফ্রান্সের শাসনশক্তিকে চতুর্দ্দশ লুই এই অবস্থায় রাখিয়া গেলেন। একদিকে সমাজের সর্ব্বত্র সম্পদ্শক্তি, সাহিত্য ও চিন্তার বিকাশ; অন্য দিকে একটা স্থাবর সংস্কারোপায়বিহীন শাসনতন্ত্র, যাহা জাতীয় জীবনস্রোতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ। অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী গৌরবলীলার পর সে এখন অচল ও হীনবীর্য্য এবং প্রতিষ্ঠাতার জীবনকালের মধ্যেই বিলুপ্তপ্রায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সের এইরূপ অবস্থা, এবং এই অবস্থার ফলে পরবর্ত্তী যুগের গতিপ্রকৃতি স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিল।

এ কথা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান ব্যাপার স্বাধীন চিন্তার বিকাশ। সে সময়ে চিন্তারাজ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, এ স্থলে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভবপর নহে। তথাপি এই চিত্তবিপ্লবের কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম কথা এই যে, এ সময়ে শাসনতন্ত্রের প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল; মানুষের চিন্তাকল্পনাই এ সময়ে প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। ডিউক শোয়াজলের মন্ত্রিত্বে পররাষ্ট্রসম্পর্কিত কতকগুলি ব্যাপার এবং আমেরিকান্ যুদ্ধ প্রভৃতি কয়েক বিষয়ে লোকমতানুবর্ত্তন—এ ভিন্ন এ যুগের ফরাসী শাসনতন্ত্রের কোনরূপ উদ্যম উৎসাহ বা সজীবতা দেখা

যায় নাই। চতুর্দ্দশ লুইর উদ্যমসম্পন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষ শাসনতন্ত্র সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে ও সর্ব্বব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে; তৎস্থলে এখন যে শাসনতন্ত্র উঠিল, সে নিজকে এতই দুর্ব্বল ও বিড়ম্বিত বোধ করিত যে, সে কেবল আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, অন্তরালে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহা কিছু উদ্যম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সমস্তই এখন রাজাকে ছাড়িয়া জনবর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। ফরাসী জাতিই এখন নিজের মতামত ও চিন্তাকল্পনা-দ্বারা সমস্ত ব্যাপারে যোগ দিতে ও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এককথায় যথার্থ কর্ত্তৃত্বাধিকার পরিচালন করিতে লাগিয়াছে।

এ যুগের চিত্তবিপ্লবের দ্বিতীয় লক্ষণ স্বাধীনচিন্তার ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা। এ পর্য্যন্ত এবং বিশেষ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে একটা সীমাবদ্ধ খণ্ড ক্ষেত্রের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার প্রয়োগ হইয়াছিল। তখন কখনও ধর্ম্ম, কখনও রাষ্ট্রনীতি, কখনও বা ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি, এই উভয় ক্ষেত্রে ইহা প্রসারলাভ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে ব্যাপক-ভাবে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সাহস করে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিন্তু স্বাধীনচিন্তা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করিয়াছে; ধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, বিশুদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা, মানব ও সমাজ, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক জগৎ—সমস্তই এখন আলোচনার বিষয়, সন্দেহের বিষয়, বৈজ্ঞানিক সংহতির বিষয় হইয়া উঠিল। প্রাচীন বিজ্ঞানসমূহ অধোনিক্ষিপ্ত হইল ও নব নব বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতে লাগিল। এ আন্দোলনের প্রেরণামূল এক হইলেও চতুর্দ্দিকে ইহার বিস্তৃতি ঘটিল।

এ আন্দোলনের একটি বিশেষত্ব ছিল, যাহা জগতের ইতিহাসে আর কুত্রাপি দেখা যায় না; কেবলমাত্র চিন্তাক্ষেত্রেই ইহার প্রসার আবদ্ধ

ছিল। এ পর্য্যন্ত মানবসমাজে যে সমস্ত বিপ্লব ঘটিয়াছে, সকলগুলির মধ্যেই চিন্তার সহিত চেষ্টার সংমিশ্রণ দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লব চিন্তা ও আলোচনা লইয়াই আরম্ভ হয়, কিন্তু অবিলম্বেই তাহা বাহ্য ঘটনায় পর্য্যবসিত হয়। তত্ত্ববাদ-ঘটিত দলাদলিতে যাঁহারা নেতা ছিলেন, তাঁহারাই অচিরে রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলির নেতা হইলেন। মানুষের চিন্তাকল্পনার সহিত বাস্তব জীবনের সংমিশ্রণ ঘটিল। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজী বিপ্লবেও ইহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে দেখিবেন, মানুষের চিন্তা সর্ব্ববিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত, মানুষের বাস্তবজীবন-সম্পর্কিত এমন সকল ব্যাপার লইয়া সে আলোচনা করিতেছে যে, সহজেই মনে হয়, বাস্তব ঘটনাক্ষেত্রে শীঘ্রই ইহার ফল ফলিবে। অথচ এই সমস্ত আলোচনার প্রবর্ত্তক ও নেতৃবৃন্দ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র রহিলেন। তাঁহারা যেন দর্শকমাত্র; তাঁহারা কেবল পর্য্যবেক্ষণ, বিচার ও মতপ্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন. কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলেন না। বাস্তব শাসন ও চিত্তশাসনের এত পার্থক্য আর কখনও দেখা যায় নাই। বাস্তবকর্ত্তৃশক্তি ও আধ্যাত্মিক কর্ত্তৃশক্তির পার্থক্যসাধন ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কখনও সম্পূর্ণরূপে সংঘটিত হয় নাই। পরবর্ত্তী কালের ঘটনাস্রোতে এ ব্যাপারের গুরুতর তাৎপর্য্য ও প্রভাব লক্ষিত হইবে। ইহার ফলে এ সময়ের চিন্তাকল্পনার মধ্যে একটা উদ্দাম আতিশয্য ও অনভিজ্ঞতা লক্ষিত হয়। ইতিপূর্ব্বে দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যা কখনও জগৎশাসন করিবার জন্য এত প্রবল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে নাই; আবার বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে এত অজ্ঞতাও সে কখনও দেখায় নাই। ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, এই নবীন চিন্তাকে একদিন কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া বাহ্যঘটনাস্রোতে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে;

দীর্ঘবিচ্ছেদের পর চিন্তা ও কর্ম্মের এই সংযোগ সহজে সম্পন্ন হইল না, ইহা ভীষণ সংঘাতের আকার ধারণ করিল।

এ সময়ে মানুষের চিন্তায় যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি আছে? এ পর্য্যন্ত সে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে; চারিদিকের বাস্তব ঘটনার চাপে তাহাকে সংযম ও সতর্কতার সহিত চলিতে হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন কোন বাস্তব ব্যাপার ছিল না, যাহা মানবচিত্তে ভয় বা সম্মান উদ্রেক করিতে পারিত; সমগ্র সমাজব্যবস্থা তখন তাহার নিকট ঘৃণা অথবা অবজ্ঞার পাত্র। সুতরাং সে স্থির করিল, তাহাকে সর্ব্ববিষয়ে সংস্কারের ভার লইতে হইবে; সে যেন এক নব সৃষ্টির প্রবর্ত্তক। প্রতিষ্ঠান, মতামত, রীতিনীতি, সমাজব্যবস্থা, মানব-প্রকৃতি, সমস্তই যেন সংস্কার করিয়া তুলিতে হইবে; এবং সংস্কারকার্য্যের ভার লইবে মানুষের বিচারবুদ্ধি। এতটা দুঃসাহস মানুষের মন ইতিপূর্ব্বে কখনও কল্পনায় আনিতে পারে নাই।

চতুর্দ্দশ লুইর শাসনতন্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার সমক্ষে এই এক নূতন শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। এই দুই অসমান শক্তির সংঘাত যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা সহজেই দেখিতে পাইতে-ছেন। রাজতন্ত্রের সহিত স্বাধীন চিন্তার যে বিরোধ ইংরেজী বিপ্লবের মধ্যে দেখা গিয়াছে, ফ্রান্সেও সে বিরোধের উপক্রম হইল। অবশ্য উভয় বিপ্লবের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর এবং উভয়ের পরিণামও বিভিন্ন; কিন্তু মূলে উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থাসাদৃশ্য আছে এবং উভয় ঘটনার মূল তাৎপর্য্য একই।

এ সংঘর্ষের অনন্ত পরিণামপরম্পরা বিবৃত করিতে চাহি না। এখন আমাকে উপসংহার করিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে কেবলমাত্র এই মহা-

বিপ্লবের গভীরতম তাৎপর্য্যের দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। নিরবচ্ছিন্ন যথেচ্ছতন্ত্রশক্তি যে কোন আকারে, যে কোন নামে, যে কোন লক্ষ্য সাধনের জন্যই আবির্ভূত হউক না, তাহা মানবসমাজের পক্ষে বিপজ্জনক ও অকল্যাণকর—এই তত্ত্বই ফরাসী-বিপ্লবের প্রধান শিক্ষা। আপনারা দেখিয়াছেন, কেবলমাত্র এই কারণেই চতুর্দ্দশ লুইর শাসনতন্ত্র বিনাশপ্রাপ্ত হইল। যে শক্তি ইহার স্থান গ্রহণ করিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর যাহা যথার্থ কর্ত্তৃশক্তি, মানুষের সেই চিত্ত-শক্তিরও সেই দশা ঘটিল। মানবচিত্ত নিরবচ্ছিন্ন কর্ত্তৃত্বলাভ করিল; সেও আত্মক্ষমতায় অতিমাত্র আস্থা স্থাপন করিল। ইহার উন্নতিমুখী গতির সৌন্দর্য্য, উৎকর্ষ ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। আমার দৃঢ় ধারণা যে, অষ্টাদশ শতাব্দী ইতিহাসের মহত্তম যুগের মধ্যে পরিগণনীয়; আমার মনে হয়, এ যুগে মানবজাতির যেরূপ ব্যাপক কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এরূপ আর কোন যুগে হয় নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, এ যুগে মানুষের চিত্ত নিরবচ্ছিন্ন শক্তির অধিকারী হইয়া শক্তিমদে বিকৃত ও পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সে তখন সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত প্রতিষ্ঠান ও প্রাচীন মতামত অন্যায়পূর্ব্বক অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়াছিল। এবং এই বিদ্বেষের ফলে সে ভ্রান্তি ও যথেচ্ছাচারে নিপতিত হইল। এ শতাব্দীর শেষভাগে বিজয়ী মানবচিত্তের কর্ত্তৃত্বে যে ভ্রান্তি ও অত্যাচারের ভাগ মিশ্রিত ছিল, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে, এবং তাহা অস্বীকার না করিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করাই কর্ত্তব্য। শক্তিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানবচিত্তে যে আতিশয্য দেখা দিয়াছিল, এই সমস্ত ভ্রান্তি ও অত্যাচার প্রধানতঃ তাহারই ফল।

শক্তি আধ্যাত্মিকই হউক বা ঐহিকই হউক, শাসনতন্ত্রের হস্তেই ন্যস্ত থাকুক বা জনসঙ্ঘ দ্বারাই পরিচালিত হউক, তত্ত্বদর্শী দার্শনিকের হস্তেই

থাকুক বা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন রাজমন্ত্রীর হস্তেই থাকুক, যে কোন উদ্দেশ্য সাধনেই ইহা প্রযুক্ত হউক না কেন—সর্ব্বপ্রকার শক্তির মধ্যেই একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও অত্যাচারের বীজ নিহিত আছে এবং তজ্জন্য ইহাকে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা আবশ্যক—ইহাই আমাদের কালের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। সকল প্রকার বিচিত্র অধিকার, বিভিন্ন স্বার্থ ও বিভিন্ন মতামতের একত্র স্বাধীনতা ব্যতীত, এককালে সকল প্রকার শক্তিকেই স্বচ্ছন্দ বিকাশ ও বৈধলীলার অবকাশ না দিলে কোন শক্তিকেই সংযত ও বৈধসীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যাইবে না। এবং ইহা না হইলেও সমাজে যথার্থ স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যথেচ্ছতন্ত্র রাজশক্তির সহিত যথেচ্ছতন্ত্র চিত্তশক্তির যে মহাসংঘর্ষ বাধিয়াছিল, আমাদের পক্ষে ইহাই তাহার প্রধান শিক্ষা।

এখন আমি আমার সঙ্কল্পিত পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের একটা স্থূল চিত্র আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি অতি দ্রুতবেগে এই বিস্তৃত ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়াছি; অনেক মূল্যবান্ তথ্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি নাই, আমার সকল উক্তির প্রমাণও অবতারণা করিতে পারি নাই। অনেক জিনিষ বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি, অনেক সময়ে বিনা প্রমাণে আমার উক্তি মানিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছি। তথাপি আমি আশা করি, আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই; আশা করি, আধুনিক ইউরোপীয় সমাজের বিকাশকাহিনীর প্রধান প্রধান সঙ্কটস্থল স্থূলভাবে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

সম্পূর্ণ